বাংলা

কী লিখবেন কেন লিখবেন



আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি

আপনি বঙ্গভাষার লেখক। কিন্তু যে বাংলা আপনি লেখেন, তা কি পুরোপুরি নির্ভুল ? কোথায় 'অনুপস্থিতিতে' লিখতে হবে আর কোথায় 'অবর্তমানে', তা কি আপনি জানেন ? কিংবা কোথায় 'উদ্দেশে' আর কোথায় 'উদ্দেশ্যে' ? না জানলেও ভাবনার কিছু নেই। কেননা, শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে কোনও সমস্যা দেখা দিলে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা যার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেন, সেই ব্যবহার-বিধির সাহায্য এবারে আপনিও পাচ্ছেন।

এ বই শুধু সাংবাদিকদের জন্য নয়, বাংলা ভাষায় যাঁরা লেখালিখি করেন, তাঁদের সবার জন্য। আদ্যন্ত ঝরঝরে সরস বাংলায় লেখা। যাতে পড়বামাত্র বোঝা যায় যে, কী লিখতে বলা হচ্ছে ও কেন লিখতে বলা হচ্ছে। এ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে এমন সব ভুলত্রুটির দৃষ্টান্ত, যা আমরা আকছার ঘটতে দেখি, অথচ যৎসামান্য সতর্ক ও যত্নশীল হলেই যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

এখানে আছে ভাষা ব্যবহার, বাক্য গঠন ও শব্দ নির্বাচন সম্পর্কে নানা জরুরি পরামর্শ। আছে তর্জমা, প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ বিভাজন, কপি লেখা, সংবাদ বাছাই করা ও শিরোনাম রচনার আদর্শ রীতি নিয়ে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশও। আছে কালনির্ণয়, বর্ষপঞ্জি, বিভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা, পরিমাপ, সংখ্যার সমস্যা, প্রতিবর্ণীকরণ, প্রুফ সংশোধন, হরফের আকার ও বৈচিত্র্য, স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নাম ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা।

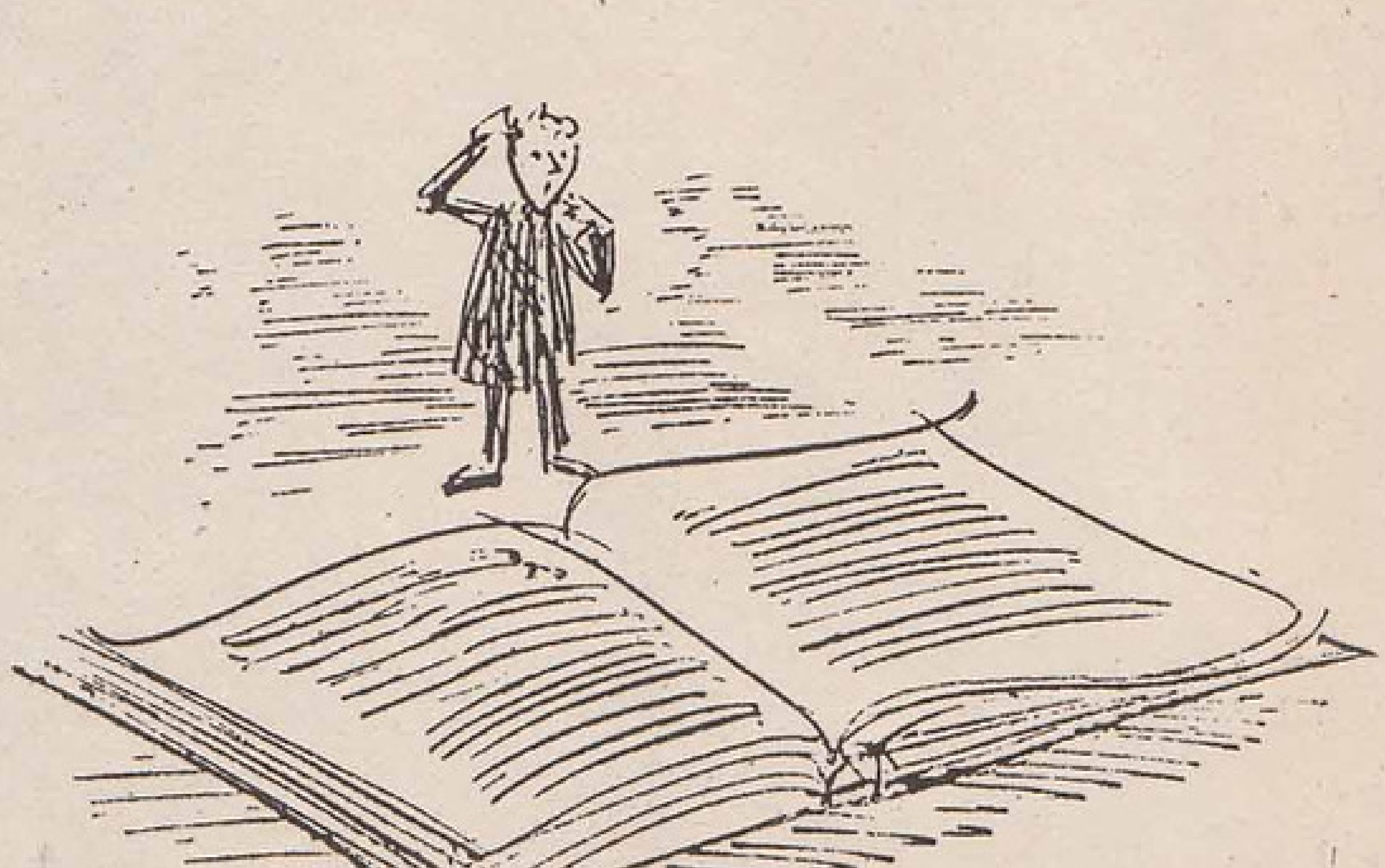
আর আছে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রস্তাবিত বানান-বিধি, ইতিমধ্যেই যা গুণিজনদের অনুমোদন ও সমর্থন পেয়েছে। উপরন্তু সমস্ত তথ্যই এখানে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে খুব সহজেই আপনার তাবৎ প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যান।

'কী লিখবেন, কেন লিখবেন' একেবারে অন্য ধরনের কোষগ্রন্থ। এমন বই বাংলা ভাষায় এর আগে আর বার হয়নি। নির্ভুল বাংলা যাঁরা লিখতে চান, এ বই তাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হবার যোগ্য।

ISBN 81-7215-055-5

সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে আনন্দবাজার পত্রিকার মস্ত গুণ তার নির্ভরযোগ্যতা। তার জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে নির্ভুল সংবাদ, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং—যার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়—স্বচ্ছ সাবলীল বাংলা। উপরন্তু, অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এই পত্রিকা নিবিড় যোগসম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে।

রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকা যে-সব ব্যবহার-বিধি মান্য করবার পক্ষপাতী, তা এই প্রথম একত্র করা হল। এবং সর্বজনের সুবিধার্থে একসূত্রে গেঁথে প্রকাশ করা হল গ্রন্থাকারে।



বাংলা

কী লিখবেন

কেন লিখবেন

আনন্দবাজার পত্রিকা
ব্যবহার বিধি

বাংলা

কী লিখবেন

কেন লিখবেন

আনন্দবাজার পত্রিকা
ব্যবহার বিধি

বাংলা

কী লিখবেন কেন লিখবেন

আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

গ্রন্থস্বত্ব : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ থেকে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ২৭৩০০
দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ আগস্ট ১৯৯৬ মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

সম্পাদনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য
অলঙ্করণ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ISBN 81-7215-055-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪০·০০

সূচিপত্র

ভূমিকা

খবর বাছাই করা, খবর লেখা, তর্জমা, শিরোনাম রচনা ইত্যাদি কাজ কীভাবে করলে ভাল হয়, তা-ই নিয়েই এই গ্রন্থ। কিন্তু শুধু যে তা-ই নিয়ে, তা নয়। সংবাদপত্র ও সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নানা বিষয়ও এখানে আলোচিত হয়েছে। এসেছে ভাষা-ব্যবহার, বাক্যগঠন, শব্দনির্বাচন, প্রতিবর্ণীকরণ, বিরামচিহ্ন ও উদ্ধৃতিচিহ্নের প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং আরও অজস্র প্রসঙ্গ। উপরন্তু, খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে এমন বহু তথ্য এখানে সন্নিবেশিত হল, যা শুধুই সাংবাদিক কিংবা সাহিত্যিক নয়, সকলেরই কাজে লাগবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ভাষার প্রধান কাজ একের ভাবনাকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভাষাকে কীভাবে ব্যবহার করলে সে-কাজ সহজে সম্পন্ন হতে পারে, অন্যান্য নানা বিষয়ের মধ্যে এটাও ছিল আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। এ ব্যাপারে আমরা কোন পন্থার পক্ষপাতী, এই গ্রন্থে যথাস্থানে তা বিবৃত হয়েছে।

একই বাংলা শব্দের একাধিক বানান যে বাঞ্ছনীয় নয়, এ-কথা—আরও অনেকের মতো—আমরাও বিশ্বাস করি। বানানে সমতাবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে তাই কিছুকাল পূর্বে 'বানান-বিধি' নামে একটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম। এ-ব্যাপারে উৎসাহী গুণিজনদের কাছে তা পাঠানোও হয়।

পুস্তিকাটি পাঠ করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. পবিত্র সরকার, ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী, ড. ভবতোষ দত্ত, ড. অজিতকুমার ঘোষ, ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. বিজিতকুমার দত্ত, শ্রীসুভাষ ভট্টাচার্য, শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়, শ্রীকার্তিক মজুমদার ও শ্রীরমেন্দ্র ভট্টাচার্য আপনাপন অভিমত আমাদের জানিয়েছেন। তাঁদের অনুমোদন, সমর্থন ও পরামর্শের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রস্তাবিত বানান-বিধি এই গ্রন্থের সূচনায় দেওয়া হল। উপরন্তু, যার বানান নিয়ে বিভ্রম ঘটে, এমন বহু শব্দকে এখানে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দিয়ে জানানো হল যে, সেগুলির কোন বানান আমাদের অভিপ্রেত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছে, একেই আমাদের পরিশ্রমের সবচেয়ে বড় পুরস্কার বলে গণ্য করি।

নাম-বিশেষ্য 'চিন'-এর বানান নিয়ে কেউ-কেউ আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'চীন' সংস্কৃত শব্দ। যুক্তি হিসাবে তাঁরা দেখিয়ে দিচ্ছেন 'চীনাংশুক' শব্দটিকে, এবং বলছেন যে, এই কারণেই এ-ক্ষেত্রে বানানের পরিবর্তন ঘটানো উচিত হবে না।

আমাদের বক্তব্য : সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও 'চীন' মূলত সংস্কৃত শব্দ নয়। মূল শব্দটি বহিরাগত। অধ্যাপক থান য়ুন-শান বলছেন, তাঁর দেশের "'চীন' নামটির উৎপত্তি 'চিন' থেকে। চৌ বংশের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ১১২২—২৪৯) 'চিন' একটি করদ রাজ্য ছিল...। প্রথমে এই রাজ্যটিও অন্যান্য করদ রাজ্যের মতোই দুর্বল ছিল...কিন্তু ক্রমে এই রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে আশেপাশের রাজ্যগুলিকে জয় করে সমগ্র দেশকে একতাবদ্ধ করল। এই রাজ্যের রাজবংশের নামও দেশের নাম অনুযায়ী হল 'চিন'।" ('আধুনিক চীন', পৃ ৪)

'চীন' তা হলে 'চিন'-এরই প্রতিবর্ণীকৃত সংস্করণ মাত্র, তাকে সংস্কৃত শব্দ বলে গণ্য করা চলে না। 'চীনাংশুক'ও বস্তুত একটি বিদেশি শব্দের সঙ্গে একটি সংস্কৃত শব্দের ('অংশুক') মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-রকম মিশ্রণ বাংলা ভাষাতেও অনেক ঘটেছে। দৃষ্টান্ত : 'ইংলণ্ডেশ্বরী'।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে অবশ্য কিছু অসংগতি থেকে গিয়েছিল। শ্রীশঙ্খ ঘোষকে ধন্যবাদ, সেগুলির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সংস্করণে অসংগতিগুলি মেটানো হল। তা ছাড়া, গ্রন্থখানিকে ত্রুটিহীন করবার জন্য ইতস্তত আরও কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ও নূতন কিছু শব্দও এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে।

বানান-বিধি

আনন্দবাজার পত্রিকা যে বানান-বিধি অনুসরণের পক্ষপাতী, তা নিম্নে প্রদত্ত হল। যে-সব তৎসম শব্দের বানানে প্রায়ই ভুল ঘটে (কিংবা ঘটা কিছু বিচিত্র নয়), এবং অ-তৎসম অন্যান্য শ্রেণীর যে-সব শব্দের বানানে বিধিবহির্ভূত নানা বিচ্যুতি ঘটতে দেখা যায়, তার একটি তালিকাও আমরা প্রস্তুত করেছি। তালিকাবদ্ধ শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো আছে। দেখলেই বোঝা যাবে, কোন শব্দের কোন বানান লেখা বিধিসম্মত হবে, এবং কোন বানান তা হবে না।

প্রায় প্রতিটি বর্ণের শব্দ-তালিকার শেষে দেওয়া হয়েছে সেই বর্ণ দিয়ে যার শুরু এমন একটি ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত। এই রূপগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় ক্রিয়াপদের শেষে (বা সূচনায়) কোথায় ও-বর্ণ বসবে, আর কোথায় ও-কারযুক্ত বর্ণ।

(১) তৎসম শব্দ

যে-সব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত রূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাদেরই আমরা তৎসম শব্দ বলে থাকি। তিরিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় যেমন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের তেমনই তৎসম শব্দের বানানেও কয়েকটি পরিবর্তন সাধনের সুপারিশ করা হয়। যথা

(ক) 'রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।' (দৃষ্টান্ত : 'অর্জ্জন' নয়, 'অর্জন' ; 'কার্য্য' নয়, 'কার্য' ; 'পূর্ব্ব' নয়, 'পূর্ব' ; 'বর্জ্জন' নয়, 'বর্জন'।)

(খ) শব্দের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ বর্জনীয়।[১] (দৃষ্টান্ত : 'অন্ততঃ' নয়, 'অন্তত' ; 'অহরহঃ' নয়, 'অহরহ' ; 'ইতস্ততঃ' নয়, 'ইতস্তত' ;

১. বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও অন্ত-বিসর্গের কথাটা কিন্তু মনে রাখা দরকার। নইলে সন্ধির সময়ে বিভ্রাট ঘটবার আশঙ্কা। আমরা 'দিবস' অর্থে 'অহঃ' না লিখে 'অহ' লিখি (যথা 'পুণ্যাহ')। কিন্তু 'প্রতিদিবস' বা 'প্রতিনিয়ত' অর্থে 'অহ+অহ=অহাহ' লিখতে পারি না, লিখতে হয় 'অহরহ'। অর্থাৎ দ্বিতীয় 'অহঃ' থেকে বিসর্গ বর্জন করলেও প্রথমটির অন্তে অবস্থিত বিসর্গের কথা ভোলা চলে না, তাকে হিসাবের মধ্যে রেখে সন্ধি করতে হয়। ঠিক তেমনই 'মনঃ' না লিখে 'মন' এবং 'সদ্যঃ' না লিখে 'সদ্য' লিখি বটে, কিন্তু 'মনকামনা' এবং 'সদ্যজাত' না লিখে আমাদের লিখতে হয় 'মনস্কামনা' এবং 'সদ্যোজাত'। সেও ওই বিসর্গের কারণেই।

'ক্রমশঃ' নয়, 'ক্রমশ' ; 'সদ্যঃ' নয়, 'সদ্য' ।)

তৎসম শব্দের বানানের ব্যাপারে এই সুপারিশ আমরা মান্য করব । তা ছাড়া

(গ) যেমন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে, তেমনই তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও বর্জন করব শব্দের অন্তে অবস্থিত হস্‌চিহ্ন ।[২] (দৃষ্টান্ত : 'দিক্' নয়, 'দিক' ; 'ধনবান্' নয়, 'ধনবান' ; 'বাক্' নয়, 'বাক' ; 'বুদ্ধিমান্' নয়, 'বুদ্ধিমান' ।)

(ঘ) তৎসম শব্দের বানানে যে-সব ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুই স্বরই শুদ্ধ বলে গণ্য হয়, সে-সব ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বর বর্জন করে একমাত্র হ্রস্ব স্বরই আমরা গ্রহণ করব । অর্থাৎ সে-সব ক্ষেত্রে 'ঈ' স্থলে 'ই' এবং 'ঈ-কার' স্থলে 'ই-কার', সেই সঙ্গে 'ঊ' স্থলে 'উ' এবং 'ঊ-কার' স্থলে 'উ-কার' ব্যবহার করব আমরা । (দৃষ্টান্ত : 'ভঙ্গী' নয়, 'ভঙ্গি' ; 'সূচী' নয়, 'সূচি' ; 'ঊর্বর' নয়, 'উর্বর' ; 'ঊষা' নয়, 'উষা' । ফলত 'প্রত্যূষ' নয়, 'প্রত্যুষ' ; 'প্রাগূষা' নয়, 'প্রাগুষা' ।)

(২) **অন্যান্য শব্দ**

বাংলা ভাষায় যেমন তৎসম শব্দ আছে, তেমনই আছে আরও পাঁচ শ্রেণীর শব্দ । এগুলি হল তদ্ভব, অর্ধতৎসম, স্থানীয়, দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত ও বিদেশি শব্দ । শেষোক্ত এই পাঁচ শ্রেণীর শব্দকে আমরা—সাধারণভাবে—অতৎসম শব্দ বলতে পারি । অতৎসম শব্দগুলির ক্ষেত্রে যে-চারটি সাধারণ নিয়ম আমরা পালন করব, তা এই যে, এদের কোনওটির বানানেই আমরা

(ক) দীর্ঘস্বর 'ঈ/ঊ' অথবা তাদের প্রতীক-চিহ্ন 'ঈ-কার/ঊ-কার' ব্যবহার করব না ।[৩]

(খ) 'ঋ' বর্ণ অথবা তার প্রতীক-চিহ্ন 'ঋ-কার' ব্যবহার করব না । (দৃষ্টান্ত : 'কৃমিয়া' নয়, 'ক্রিমিয়া' ; 'বৃটেন' নয়, 'ব্রিটেন' ।)

(গ) 'মূর্ধন্য ণ' ব্যবহার করব না । (এমন কী, 'র', 'র-ফলা', 'রেফ'

২. বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও, অন্তে অবস্থিত বিসর্গের মতোই, অন্তে অবস্থিত হস্‌চিহ্নের কথাটাও মনে রাখা দরকার । নইলে 'দিগ্বলয়' না লিখে ভুল করে লিখব 'দিকবলয়' ; বাগ্দেবী বা 'বাগ্‌দেবী' না লিখে ভুল করে লিখব 'বাকদেবী' ; 'বুদ্ধিমত্তা' না লিখে ভুল করে লিখব 'বুদ্ধিমানতা' ।

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও, ব্যতিক্রম হিসাবে, "স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে" ঈ-কার দেবার কথা বলা হয়েছিল । আমরা সে-ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম না রাখার পক্ষপাতী । অর্থাৎ, যেমন আমরা 'দিদি' লিখি, তেমনই 'মাসি' 'পিসি' তো লিখবই, একই সঙ্গে লিখব 'পঞ্জাবি', 'কেরানি', 'হিন্দি', 'সরকারি' ইত্যাদি । তা ছাড়া আমরা 'গ্রিস' 'গ্রিন' 'চিন' ইত্যাদি বানানের পক্ষপাতী ।

অথবা 'মূর্ধন্য ষ'-এর পরে এলেও 'মূর্ধন্য ণ'-এর পরিবর্তে আমরা 'দন্ত্য ন' ব্যবহার করব। দৃষ্টান্ত : 'দরুণ' নয়, 'দরুন' ; 'ট্রেণ' নয়, 'ট্রেন' ; 'চার্ণক' নয়, 'চার্নক' ; 'কিষেণচাঁদ' নয়, 'কিষেনচাঁদ'।)

(ঘ) 'ৎ' বর্ণটি ব্যবহার করব না।

(৩) পূর্বোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অতৎসম শব্দের মধ্যে যেগুলি বিদেশি শব্দ, তাদের বানানে আরও যে-দুটি বর্ণ আমরা বর্জন করব, তা হল 'অন্তঃস্থ য'[৪] ও 'মূর্ধন্য ষ'।

(৪) অন্য চার শ্রেণীর অতৎসম (অর্থাৎ তদ্ভব, অর্ধতৎসম, স্থানীয়, এবং দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত) শব্দের বানানে 'অন্তঃস্থ য' ও 'মূর্ধন্য ষ'কে সর্বৈব বর্জন করা এখনই সম্ভব নয়। (দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আমাদের উচ্চারণ যা-ই হোক, 'যখন' 'কেষ্ট' ও 'বিষ্টু'ই আমরা লিখব, 'জখন' 'কেশটো' ও 'বিশটু' লিখব না।)

(৫) কিন্তু এই চার শ্রেণীর কয়েকটি শব্দের বানানে 'অন্তঃস্থ য'-এর পাশাপাশি 'বর্গীয় জ'ও যে দিব্য চলছে, সেটাও লক্ষণীয়। (দৃষ্টান্ত : 'যুঁই' ও 'জুঁই', 'যোগাড়' ও 'জোগাড়', 'যাদু' ও 'জাদু', 'যাঁতা' ও 'জাঁতা'।)
এই সব ক্ষেত্রে একমাত্র 'বর্গীয় জ'ই আমাদের গ্রাহ্য হবে।

(৬) ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সময় যে সাধারণ নিয়ম আমরা পালন করব, তা এই যে, বাক্যে যাকে 'তুমি' বা যাদের 'তোমরা' বলা হচ্ছে, তার বা তাদের বেলায় মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও' অথবা 'ও-কার' বসবে। ক্ষেত্র তিনটি হল (ক) নিত্য-বর্তমান, (খ) বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞা (বা অনুরোধ) এবং (গ) ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞা (বা অনুরোধ)। অন্য কোথাও ক্রিয়াপদের শেষে 'ও' বর্ণ অথবা 'ও-কার' বসবে না।

(৭) নিত্য-বর্তমান
এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও-কার' যোগের দৃষ্টান্ত : 'তোমরা যা **করো**, তা ভাল কাজ।'

(৮) বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও' বর্ণ যোগের দৃষ্টান্ত : '**খাও**', '**গাও**', '**চাও**', '**দাও**', '**নাও**'। (একটা কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল। সেটা এই যে, নিত্য-বর্তমানের ক্ষেত্রেও এই সব ক্রিয়াপদ এই একই রূপে ব্যবহৃত হয়ে

---

৪. প্রশ্ন হচ্ছে 'যিশু' না লিখে 'জিশু' লেখা যাবে কি না। ইংরেজিতে লেখে Jesus. তার প্রতিবর্ণীকরণে ('যেসাস' না লিখে) স্বচ্ছন্দে আমরা 'জেসাস' লিখি। সুতরাং 'জিশু' লিখলে কারও আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

থাকে। দৃষ্টান্ত : তুমি যে গান **গাও**, তা আমি জানি।)

(৯) বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও-কার' যোগের দৃষ্টান্ত : 'মন দিয়ে কাজ **করো**।'

(১০) ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে যেমন 'ও-কার' বসবে, তেমনই বসবে ক্রিয়াপদের প্রথমেও। দৃষ্টান্ত : 'এখন যদি কাজটা করবার সময় না পাও, তবে পরে কখনও **কোরো**।'

(১১) ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে কয়েকটি ক্রিয়াপদের রূপ অবশ্য পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পালটাবে না। যথা :

(ক) 'ওঠা', 'ছোটা', 'জোটা' ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রে শেষ বর্ণটি 'ও-কার'যুক্ত হবে বটে, কিন্তু প্রথম বর্ণ 'ও' অথবা প্রথম বর্ণের 'ও-কার' হয়ে যাবে যথাক্রমে 'উ' অথবা 'উ-কার'। দৃষ্টান্ত : **'উঠো', 'ছুটো', 'জুটো'**।

(খ) 'খাওয়া', 'গাওয়া', 'চাওয়া' ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রে শেষ বর্ণটি 'ও-কার'যুক্ত হবে বটে, কিন্তু প্রথম বর্ণের 'আ-কার' হয়ে যাবে 'এ-কার'। সেইসঙ্গে লুপ্ত হবে দ্বিতীয় বর্ণ 'ও'। দৃষ্টান্ত : **'খেয়ো', 'গেয়ো', 'চেয়ো'**।[৫] ('খেও', 'গেও' কিংবা 'চেও' নয়।)

(গ) 'দেওয়া', 'নেওয়া'। নিত্য-বর্তমানে ও বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে এদের রূপ : 'দাও', 'নাও'। ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) বেলায় এদের শেষ বর্ণটি 'ও-কার'যুক্ত হবে এবং প্রথম বর্ণের 'এ-কার' হয়ে যাবে 'ই-কার'। সেই সঙ্গে লুপ্ত হবে দ্বিতীয় বর্ণ 'ও'। ফলত এদের চেহারা সে-ক্ষেত্রে হবে : **'দিয়ো', 'নিয়ো'**। ('দিও' কিংবা 'নিও' নয়।)

(ঘ) 'লেখা', 'শেখা' ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রেও শেষ বর্ণ 'ও-কার'যুক্ত হবে, এবং প্রথম বর্ণের 'এ-কার' হয়ে যাবে 'ই-কার'। অর্থাৎ এদের চেহারা দাঁড়াবে : **'লিখো', 'শিখো'**।

(১২) ক্রিয়াপদের অতীত-রূপে এবং (কোনও অনুজ্ঞা/অনুরোধের ব্যাপার না

৫. শব্দের অন্তে 'ও' বর্ণ থাকলে সাধারণত 'ক্লোজড্‌ সিলেব্‌ল' সূচিত হয়। (যথা : 'খাও', 'গাও', 'চাও', 'বানাও', 'হটাও'।) যেখানে 'ওপ্‌ন সিলেব্‌ল'-এর ব্যবস্থা রাখাই অভিপ্রেত, এই কারণে সেখানে 'ও'র বদলে 'য়ো' লেখাই সংগত বলে মনে হয়। (যথা : 'খেয়ো', 'গেয়ো', 'চেয়ো', 'বানিয়ো', 'হটিয়ো'।)

থাকলে) ভবিষ্যৎ-রূপে আমরা 'ও-কার' যোগ করব না। (দৃষ্টান্ত : 'কোরেছিলো' কিংবা 'কোরেছিল' কিংবা 'করেছিলো' নয়, **'করেছিল'**। তেমনই, 'কোরবো' কিংবা 'কোরব' কিংবা 'করবো' নয়, **'করব'**।)

(১৩) 'কি' ও 'কী'র দ্যোতনা পৃথক, প্রয়োগক্ষেত্রও পৃথক। দুই বানানই অতএব আমরা রক্ষা করব। দুই বানানের কোনটি কোথায় করণীয়, সেটা অবশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া চাই।[৬]

(১৪) আমরা 'কোনো' 'আরো' 'আজো' না লিখে 'কোনও' 'আরও' 'আজও' লিখব। সেই রকম 'এখনো' 'কখনো' 'তখনো' না লিখে 'এখনও' 'কখনও' 'তখনও' লিখব।

(১৫) 'এছাড়া' 'তাছাড়া' 'তাহলে' 'যাহলে' না লিখে আলাদা করে লিখব 'এ ছাড়া' 'তা ছাড়া' 'তা হলে' 'যা হলে'।[৭]

(১৬) 'চলেনা' 'বলেনা' 'চলিনা' 'বলিনা' না লিখে আলাদা করে লিখব 'চলে না' 'বলে না' 'চলি না' 'বলি না'।[৮] কিন্তু

(১৭) 'নাই'-এর সংক্ষেপিত রূপ 'নি'কে আলাদা করে লিখব না। তাকে জুড়ে দেব পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে। অর্থাৎ 'চলি নি' 'বলি নি' না লিখে লিখব 'চলিনি' 'বলিনি'।[৯]

---

৬. খুব সহজেই সেটা বোঝা যায়। 'কি' ও 'কী', দুটিই প্রশ্নবোধক শব্দ। যা মনে রাখা দরকার, তা এই যে, প্রশ্নের উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বললেই যেখানে কাজ চলে যায় (অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান), সেখানে বানান হবে 'কি'; আর যেখানে 'হ্যাঁ' কি 'না' বললে উত্তরদানের কাজ চলে না (অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা পান না তাঁর প্রশ্নের উত্তর), সেখানে 'কী' বানান হবে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। "Will you eat?" এই যে প্রশ্ন, শুধু 'হ্যাঁ' কি 'না' বললেই এর উত্তর দেওয়ার কাজটা দিব্য চলে যায়, আর-কিছু বলবার দরকার হয় না। সুতরাং এর বাংলা হবে 'তুমি **কি** খাবে?' কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করেন, "What will you eat?" তা হলে দেখা যাবে, 'হ্যাঁ' কি 'না' বললে এই প্রশ্নের কোনও উত্তরই হয় না। সুতরাং এর বাংলা হবে 'তুমি **কী** খাবে?'

শব্দটা যখন ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখনও 'কী' লেখা সংগত। (দৃষ্টান্ত : 'কীভাবে তাকাচ্ছে দ্যাখো'; 'কী নোংরা', 'কী পরিচ্ছন্ন', 'কী কুচ্ছিত', 'কী সুন্দর'।)

৭. 'এ' 'তা' 'যা' 'না' ইত্যাদি পৃথক শব্দ। সুতরাং 'ছাড়া' কিংবা 'হলে'র সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া অনুচিত। অনেকে 'তাছাড়া' লেখেন। এই অভ্যাস অনুমোদন, সমর্থন বা প্রশ্রয় পেলে পরে কখনও তাঁরাই হয়তো **'মাছাড়া** শিশুর চলে না' লিখতে প্রলুব্ধ হবেন।

৮,৯. 'না' একটি পৃথক শব্দ। সুতরাং 'না'কে আলাদা করে লেখাই সংগত। 'করেনা' 'চলেনা' 'বলেনা' না লিখে লেখা উচিত 'করে না' 'চলে না' 'বলে না'। 'নি' কিন্তু একটি পৃথক শব্দ নয়, সে একান্তভাবেই পরাশ্রিত। বস্তুত, এই কারণে 'তুমি খেয়েছ কি না' এই প্রশ্নের উত্তরে কারও পক্ষে শুধু 'নি' বলা চলে না। বলতে হয় 'খাইনি'। এই পরনির্ভরতার কারণেই 'নি'কে তার পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া উচিত। 'করি নি' 'চলি নি' 'বলি নি' না লিখে লেখা উচিত 'করিনি' 'চলিনি' 'বলিনি'।

(১৮) আনান/আনানো ; করান/করানো ; বলান/বলানো

যে তিন জোড়া শব্দ এখানে দেখানো হল, তাদের প্রতিটির ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দের শেষ বর্ণে 'ও-কার' নেই, দ্বিতীয় শব্দের শেষ বর্ণে আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বানান যেমন একরকম নয়, অর্থও তেমন আলাদা। 'ও-কার'বিহীন অবস্থায় এই শব্দগুলি (এবং এই রকম আরও অনেক শব্দ) ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; আর 'ও-কার'যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ হিসাবে।

'আনান' ; 'করান' ; 'বলান'। ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে 'আনিয়ে নেন', 'আনিয়েছিলেন' বা 'আনিয়ে নিন' ; 'করিয়ে নেন', 'করিয়েছিলেন' বা 'করিয়ে নিন' ; এবং 'বলিয়ে নেন', 'বলিয়েছিলেন' বা 'বলিয়ে নিন'।

'আনানো' ; 'করানো' ; 'বলানো'। বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে 'আনিয়ে নেওয়া' ; 'করিয়ে নেওয়া' ; 'বলিয়ে নেওয়া'। নানা সময়ে বিশেষণ হিসাবেও এই শব্দগুলি (এবং এই রকমের আরও অনেক শব্দ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন, যথাক্রমে, এদের অর্থ দাঁড়ায় : 'আনিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন' (আনানো জিনিস) ; 'করিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন' (করানো কাজ) ; 'বলিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন' (বলানো কথা)।

সংক্ষেপে বলি, যখন ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এই ধরনের শব্দের শেষ বর্ণে তখন 'ও-কার' হয় না, কেউ তা দেনও না। কিন্তু বিশেষ্য বা বিশেষণ হিসাবে যখন ব্যবহৃত হয়, ক্রিয়াপদের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা করবার জন্য এই ধরনের শব্দের শেষ বর্ণে তখন আমরা 'ও-কার' যোগ করব।

(১৯) দাঁড়িয়েছিল/দাঁড়িয়ে ছিল ; বসেছিল/বসে ছিল ; শুয়েছিল/শুয়ে ছিল

কেন যে কোথাও 'দাঁড়িয়েছিল' 'বসেছিল' 'শুয়েছিল' লেখা হয়, আবার কোথাও বা আলাদা করে লেখা হয় 'দাঁড়িয়ে ছিল' 'বসে ছিল' 'শুয়ে ছিল', তা বোঝা কঠিন নয়।

'দাঁড়িয়েছিল' 'বসেছিল' বা 'শুয়েছিল' লিখলে নিত্য অতীত বা সাধারণ অতীতকালের কথা বোঝানো হয়। (এই শব্দ তিনটি হল ইংরেজির stood, sat ও lay.)

অন্য দিকে, আলাদা করে 'দাঁড়িয়ে ছিল' 'বসে ছিল' বা 'শুয়ে ছিল' লিখলে বোঝানো হয় ঘটমান অতীতকালের কথা। (ইংরেজিতে এরা (i) was standing, had been standing, remained standing, (ii)

was sitting, had been sitting, remained sitting, (iii) was lying, had been lying, remained lying.)

(২০) তাই/তা-ই

অর্থ যখন 'সুতরাং' বা 'সেই জন্য' বা 'সেই হেতু' বা 'সেই কারণে' বা 'অতএব', তখন আমরা **'তাই'** লিখব। (দৃষ্টান্ত : 'মেঘ নেই, তাই বৃষ্টির আশাও নেই।') অন্য দিকে, শব্দটা যখন 'তাহাই'-এর সংক্ষেপিত রূপ, তখন আমরা **'তা-ই'** লিখব। (দৃষ্টান্ত : 'যা পাওয়া শক্ত, তা-ই সে চেয়ে বসে।')

(২১) কিনা/কি না

(ক) 'কিনা' অনেক ক্ষেত্রেই কথার মাত্রা বা লব্জ। (দৃষ্টান্ত : 'বোঝো *ব্যাপার, বামন হয়ে কিনা চাঁদ ধরতে চায় !'*)

(খ) 'যেহেতু' অর্থেও 'কিনা'র ব্যবহার আছে। (দৃষ্টান্ত : 'তিনি কিনা বড্ডই ভালমানুষ, তাই সাতে-পাঁচে থাকেন না।')

এই দুই প্রকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা **'কিনা'** লিখব।

(গ) অর্থ যখন 'কিংবা নয়', 'কিংবা না', 'কিংবা নাই', তখন বুঝতে হবে যে, 'কি' আসলে 'কিংবা'র সংক্ষেপিত রূপ। (দৃষ্টান্ত : 'মানুষটি ভাল কি না, তা বোঝা শক্ত।' বিশ্লিষ্ট অবস্থায় এই বাক্যের রূপ হবে : 'মানুষটি ভাল কিংবা ভাল নয়, তা বোঝা শক্ত।' অর্থাৎ 'কি না' এখানে 'কিংবা নয়'। ঠিক তেমনই 'তুমি যাবে কি না, তা জানাওনি'—এই বাক্যের বিশ্লিষ্ট রূপ : 'তুমি যাবে কিংবা যাবে না, তা জানাওনি।' অর্থাৎ 'কি না' এখানে 'কিংবা না'। তৃতীয় দৃষ্টান্ত : 'তুমি খেয়েছ কি না, তা বলোনি।' বিশ্লিষ্ট অবস্থায় এই বাক্যের রূপ হবে : 'তুমি খেয়েছ কিংবা খাওনি (খাও নাই) তা বলোনি।' অর্থাৎ 'কি না' এখানে 'কিংবা নাই'।)

এই সব ক্ষেত্রে আমরা আলাদা করে লিখব **'কি না'**।[১০]

(২২) **ডাব্‌ল প্লুরাল**

কোনও কোনও ভাষায় সংখ্যা অনুযায়ী বিশেষ্যপদের বচন পালটে যায়। (সেই সঙ্গে পালটায় ক্রিয়াপদও।) দৃষ্টান্ত হিসাবে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার নাম করা যেতে পারে। সংখ্যাটা ১ হলে প্রথমায় যা 'নরঃ', ২ হলে তা 'নরৌ', আবার ২-এর বেশি হলে তা-ই 'নরাঃ' হয়ে

১০. এই প্রসঙ্গে 'হয়তো' এবং 'হয় তো'র কথাটাও বলা ভাল। 'সম্ভবত' অর্থে আমরা 'হয়তো' লিখব। (দৃষ্টান্ত : 'বিকেল নাগাদ বৃষ্টি হয়তো থেমে যাবে।') 'হয় তো'র অর্থ সে-ক্ষেত্রে '(যদি) হয়, তবে'। (দৃষ্টান্ত : 'সে [যদি] রাজি হয় তো আমরাও রাজি।')

যায়। ইংরেজিতে দ্বিবচনের ঝামেলা নেই, আছে শুধুই একবচন ও বহুবচন। সিঙ্গুলার ও প্লুরাল। সংখ্যাটা ১ হলে 'man', ১-এর বেশি হলেই 'men'।

বাংলায় কিন্তু সংখ্যা যা-ই হোক, সেই অনুযায়ী বিশেষ্যপদের বচন পালটাবার দরকার হয় না। সেটা রীতিও নয়। তাই ১-এর ক্ষেত্রে যা 'মানুষ', সংখ্যাটা ১-এর বেশি হলেও তা 'মানুষ'ই থেকে যায়, 'দুটি মানুষেরা' বা 'তিনটি মানুষেরা' লিখবার দরকার হয় না বাংলা ভাষায়। এ-ভাষায় যেমন 'একটি মানুষ', তেমনই 'দুটি মানুষ' 'তিনটি মানুষ' বা 'অনেক মানুষ' লেখাই রীতি।

এই রীতি মান্য করা উচিত। কখনও লেখা উচিত নয় 'সংসদের বহু (বা অনেক) সদস্যরাই বিলটির বিরোধী', বা 'অন্যান্য (বা বিভিন্ন) বিষয়গুলিতে বক্তারা একমত হন', বা 'সব (বা সমস্ত) নদীগুলিতেই জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে', বা 'কতিপয় (বা কিছু/কয়েকজন/কয়েকটি) লোকেরা হাঙ্গামা বাধায়'।

(২৩) এক/বেলা/খেলা/চেলা/গেছে

এই পাঁচটি শব্দের (এবং এই রকম আরও অনেক তৎসম/অতৎসম শব্দের) গোড়ায় রয়েছে 'অ্যা' ধ্বনি। বলা বাহুল্য, উচ্চারণ আমরা যে যা-ই করি না কেন, তৎসম শব্দের বানান পালটাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমরা 'এক' ও 'বেলা'ই লিখব, মুখে যদিও বলব 'অ্যাক' ও (দিনের অংশ বোঝাতে হলে) 'ব্যালা'। 'খেলা' 'চেলা' 'গেছে' 'হেলা' 'ফেলা' ইত্যাদি বানানও এত বেশি প্রচলিত যে, এদের পরিবর্তন করা উচিত হবে না।

(২৪) **স্যাঁতস্যাঁত, ল্যাগব্যাগ, ক্যাটক্যাট, প্যাচপ্যাচ**

এই সব শব্দ (এবং এই ধরনের অন্যান্য শব্দ) থেকে যখন আমরা বিশেষণ বানাই, তখন এদের প্রথম 'অ্যা' ধ্বনির কোনও বিকার ঘটে না, কিন্তু দ্বিতীয় 'অ্যা' ধ্বনি 'এ' হয়ে যায় (সেই সঙ্গে শেষ বর্ণটিও হয়ে যায় 'এ-কার'যুক্ত)। অর্থাৎ আমরা লিখি ও বলি 'স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া', 'ল্যাগবেগে শরীর', 'ক্যাটকেঁটে রং', 'প্যাচপেচে কাদা'। বিশেষণের এই যে রূপ, এটাই আমাদের গ্রাহ্য হবে। আমরা 'স্যাঁতস্যাঁতে' 'ল্যাগব্যাগে' 'ক্যাটক্যাটে' বা 'প্যাচপ্যাচে' লিখব না।

(২৫) **জন্য/জন্যে ; দেওয়া/দেয়া ; নিকাশ/নিকেশ ; নেওয়া/নেয়া ; মধ্য দিয়ে/মধ্যে দিয়ে ; সন্ধ্যা/সন্ধে ; হিসাব/হিসেব ;**

অনেক শব্দেরই দুই রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। দুই রূপের

কোনওটাই ত্যাজ্য নয়, তবে কোথায় কোন রূপ গ্রাহ্য, সে-বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। আমরা যে-নিয়ম পালন করব, তা এই :

আমরা লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার পার্থক্য মেনে চলব। প্রতিবেদনে, অন্যান্য সংবাদে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে, অন্যান্য নিবন্ধে ও আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে আমরা গ্রহণ করব এই সব শব্দের (ও এই ধরনের অন্যান্য শব্দের) লেখ্য রূপটিকেই ('জন্য', 'দেওয়া', 'নিকাশ', 'নেওয়া', 'মধ্য দিয়ে', 'সন্ধ্যা', 'হিসাব')। কথ্য রূপগুলি ('জন্যে', 'দেয়া', 'নিকেশ', 'নেয়া', 'মধ্যে দিয়ে', 'সন্ধে', 'হিসেব') একমাত্র সংলাপে কি প্রবাদবাক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, অন্যত্র নয়। কারও মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে বা অংশত উদ্ধৃত করার প্রয়োজনে যদি এই সব শব্দের (বা এই ধরনের অন্যান্য শব্দের) কথ্য রূপ ব্যবহার করতে হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করব।

(২৬) সংস্কৃত 'ঈয়' (স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈয়া') প্রত্যয়ের বিকল্প নেই। সুতরাং যেমন 'জাতীয়' 'দেশীয়' বা 'ভারতীয়' লিখি, অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনই 'ঈ-কার' চাই। (দৃষ্টান্ত : 'এশীয়' 'অস্ট্রেলীয়' 'ইউরোপীয়'। তবে, 'ইউরোপ' থেকে যে-ভাবে 'ইউরোপীয়' শব্দটিকে পাওয়া যায়, 'অস্ট্রেলিয়া' 'এশিয়া' ইত্যাদি শব্দ থেকে সে-ভাবে 'অস্ট্রেলীয়' 'এশীয়' ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায় না। তা না-ই যাক, এ-সব শব্দের এই রূপই চলিত ও গ্রাহ্য।)

(২৭) বাংলায় অবশ্য 'ইয়া' প্রত্যয় রয়েছে। তাই স্বচ্ছন্দে আমরা 'অসমিয়া' 'ওড়িয়া' 'পাহাড়িয়া' ইত্যাদি লিখে থাকি। ভবিষ্যতেও এ সব শব্দ আমরা 'ই-কার' যোগেই লিখব, 'ঈ-কার' ব্যবহার করব না।

(২৮) **প্রতিবর্ণীকরণ বা লিপ্যন্তর**

(ক) বাংলা লিপিতে যখন ইংরেজি শব্দ লেখা হবে, তখন প্রতিবর্ণীকরণে আমরা মূলের উচ্চারণ যথাসম্ভব রক্ষা করতে যত্নবান হব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় (সম্ভবত ইংরেজি শব্দের কথা মনে রেখেই) বলা হয়েছিল, "বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স sh স্থানে শ হইবে।" এখানে 'মূল উচ্চারণ অনুসারে' বাক্যাংশটি প্রণিধানযোগ্য। কেননা, মূল উচ্চারণ অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে s স্থানে স হয় না, শ হয় (দৃষ্টান্ত : sugar, sure)। sh অবশ্য সর্বত্রই শ। আবার ss স্থানে অনেক ক্ষেত্রে স হয় বটে, কিন্তু

কয়েকটি ক্ষেত্রে হয় না। (দৃষ্টান্ত : pressure। এখানে ss স্থানে শ হবে।) ch নিয়েও বিভ্রম ঘটে। কেননা, ch কখনও ক (দৃষ্টান্ত : chameleon, chemical), কখনও চ (দৃষ্টান্ত : chance, much), কখনও শ (দৃষ্টান্ত : chivalry, machine)।

ইংরেজি শব্দকে বাংলায় লিপ্যন্তরিত করবার সময়ে আর-একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। আমরা 'এটর্নি' 'এডভোকেট' 'এফিডেভিট' 'এভিনিউ' ইত্যাদি বানান লিখব না। শুধু তা-ই নয়, আমরা মনে রাখব যে, 'এ্যাডভোকেট' 'এ্যাটর্নি', 'এ্যাফিডেভিট' 'এ্যাভিনিউ' ইত্যাদি বানানও লেখা চলে না, কেননা 'এ' বর্ণের সঙ্গে 'য-ফলা আ-কার' লাগানোটা নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার। বস্তুত ('অ্যা' ধ্বনির প্রতীক হিসাবে পৃথক কোনও স্বরবর্ণ এবং কার-এর ব্যবস্থা যত দিন পর্যন্ত না হচ্ছে) এই সব বিদেশি শব্দের গোড়ার দিকের 'অ্যা' ধ্বনিকে ধরবার জন্য যে 'য-ফলা আ-কার' লাগানো দরকার, একমাত্র 'অ'-এর সঙ্গেই তা লাগানো সম্ভব। সুতরাং আমরা 'অ্যাটর্নি' 'অ্যাডভোকেট' 'অ্যাফিডেভিট' 'অ্যাভিনিউ' ইত্যাদি বানান লিখব।[১১]

যে-সব ইংরেজি শব্দ কিছুটা বিকৃত চেহারায় আমাদের শব্দভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, সেগুলিকে অবশ্য সেই চেহারাতেই রক্ষা করা ভাল। যথা 'ইঞ্চি' 'গেলাশ' 'টেবিল' ইত্যাদি।

(খ) ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যতটা যোগ-সম্পর্ক রয়েছে, অ-ভারতীয় অন্যান্য অনেক ভাষার সঙ্গেই তা নেই। (যথা রুশ, জার্মন, ফরাসি, পোর্তুগিজ, স্পেনীয়, ইতালীয়, চিনা, জাপানি ইত্যাদি।) ফলে, বিভিন্ন দেশের স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের প্রতিবর্ণীকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতি এই হবে যে, ইংরেজি ভাষায় সে-সব নামের যে-উচ্চারণ আমরা পাই, বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণের সময়েও সেই উচ্চারণই আমরা অনুসরণ করব।

(গ) অ-বাংলা উত্তর-ভারতীয় স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের প্রতিবর্ণীকরণ

১১. প্রতিবর্ণীকরণের প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমরা যাবতীয় 'land'কে বাংলা লিপিতে 'ল্যান্ড' লিখে থাকি। যথা 'আইসল্যান্ড', 'আয়ারল্যান্ড', 'গোর্খাল্যান্ড', 'গ্রিনল্যান্ড', 'নাগাল্যান্ড', 'স্কটল্যান্ড', 'হল্যান্ড'। ব্যতিক্রম একমাত্র England, যা কিনা বাংলা লিপিতে অনেক সময় 'ইংলন্ড' রূপে দেখা দেয়। এ-ক্ষেত্রেও আমরা 'ইংল্যান্ড'ই লিখব।

হওয়া উচিত নাগরি লিপিতে সে-সব নাম যে-ভাবে লিখিত হয়, সেই অনুযায়ী। এই নীতি অনুযায়ী প্রতিবর্ণীকরণের কাজ যে এখনই সর্বত্র সম্ভব হবে, তা নয়। ব্যক্তি-নাম নিয়ে অসুবিধার আশঙ্কা নেই। তবে স্থান-নাম নিয়ে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। অন্তত সে-ক্ষেত্রে তাই 'ধীরে চলো' নীতিই বাঞ্ছনীয় ; অর্থাৎ একই সঙ্গে না করে এ-কাজ পর্যায়ক্রমে করা ভাল।

(ঘ) দক্ষিণ-ভারতীয় স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের প্রতিবর্ণীকরণের সময় অল্পবিস্তর অসুবিধা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ; সে-ক্ষেত্রে সমস্যার নিরাকরণের জন্য দক্ষিণ-ভারতীয় সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ সংগত হবে।

(২৯) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নানা আরবি ও ফারসি শব্দের বানানে কোথাও আমরা 'শ' ব্যবহার করি, কোথাও 'স'। এই দুটি উষ্মবর্ণের কোনটি কোথায় ব্যবহার করা উচিত, তা নির্ণয় করবার ব্যাপারে আমরা নির্ভরযোগ্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করব।

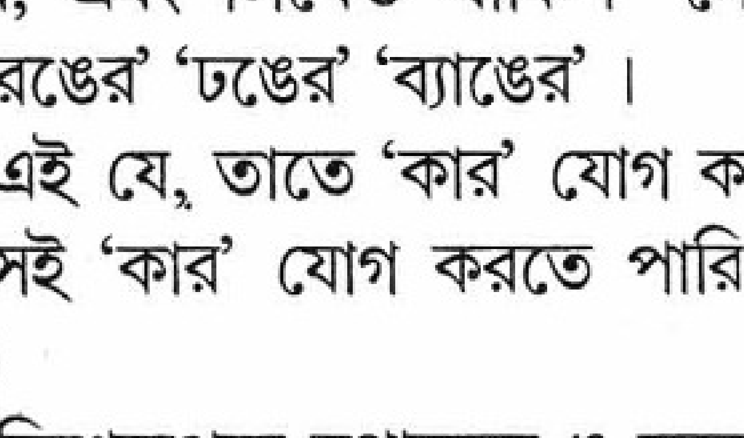
(৩০) **'ঙ' ও 'ং'**

অনেকে 'দার্জিলিঙ' লেখেন, 'কালিম্পঙ' লেখেন। 'দার্জিলিং' ও 'কালিম্পং' লেখেন না। যুক্তি এই হতে পারে যে, 'দার্জিলিংয়ের' ও 'কালিম্পংয়ের' তুলনায় 'দার্জিলিঙের' ও 'কালিম্পঙের' লিখতে জায়গা লাগে কম। কিন্তু তা হলে তাঁরা 'ঘিসিং' ও 'ক্যানিং' লেখেন কেন ? সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি-যোগের দরকার তো হয় এদের (এবং এই ধরনের আরও নানা শব্দের) ক্ষেত্রেও। তখন কেন জায়গার প্রশ্ন ওঠে না ?

অন্য দিকে বিবেচ্য, 'দার্জিলিং' ও 'কালিম্পং' লিখলেই যে ষষ্ঠী বিভক্তি-যোগে 'দার্জিলিঙের' ও 'কালিম্পঙের' লেখা যাবে না, তাও নয়। বস্তুত, আমরা 'রঙ' 'ঢঙ' বা 'ব্যাঙ' না লিখে 'রং' 'ঢং' বা 'ব্যাং' তো লিখতেই পারি, এবং লিখেও থাকি। সে-ক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করলে লিখি 'রঙের' 'ঢঙের' 'ব্যাঙের'।

অনুস্বরের অসুবিধা এই যে, তাতে 'কার' যোগ করা যায় না। 'ঙ' বর্ণে সে-ক্ষেত্রে অনায়াসেই 'কার' যোগ করতে পারি। (দৃষ্টান্ত : 'বাঙাল', 'রঙিন', 'আঙুল'।)

মনে হয়, অতৎসম বিশেষ্যপদে যথাসম্ভব ঙ স্থলে ং লেখাই বাঞ্ছনীয়। বিভক্তির প্রয়োজনে 'কার' যোগ করতে হলে আমরা ং স্থলে ঙ বসাব।



অ

অচিন্তনীয় । অর্থ : 'চিন্তার অতীত', 'চিন্তা করে যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়' । একই অর্থে **'অচিন্ত্য'** শব্দটি ব্যবহার করা যায় । **'অচিন্তনীয়'** শব্দে যে য-ফলা নেই, সেটা মনে রাখুন ।

অচিন্ত্যকুমার । **'অচিন্তকুমার'** লিখবেন না, য-ফলা চাই ।

অচ্ছুত । অর্থ : 'অস্পৃশ্য', 'ছুঁতে নেই, এমন' । **'অচ্ছুৎ'** লিখবেন না ।

অচ্যুত । অর্থ : 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু', 'স্থির' । **'অচ্যুৎ'** লিখবেন না ।

অণিমা । অর্থ : 'অণুত্ব' । **'অনিমা'** লিখবেন না, 'মূর্ধন্য ণ'-এর কথাটা মনে রাখুন ।

অণু । মলিকিউল ; এই অর্থে **'অনু'** লিখবেন না ।

অত্যন্ত । অনেকে **'অত্যান্ত'** বলেন । লেখেনও । ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান । আ-কার নেই, মনে রাখুন ।

অদ্ভুত । এ-ক্ষেত্রে ঊ-কার হবে না, মনে রাখুন । 'কিম্ভূত', 'ভূত', 'সম্ভূত' । কিন্তু **'অদ্ভুত'** ।

অধস্তন । অর্থ : 'নিম্নপদস্থ' । শব্দটিকে বিশ্লিষ্ট করলে এই চেহারা দাঁড়াবে : **অধঃ+তন** । সন্ধির নিয়মে বিসর্গ উঠে গিয়ে এ-ক্ষেত্রে 'স' হচ্ছে, এবং সেই 'স' গিয়ে বসছে পরবর্তী বর্ণ 'ত'-এর মাথায় । কাগজে মাঝে-মাঝে **'অধঃস্তন'** বানান বার হয় । এই ভুল বানানে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'নিম্নস্থ স্তন' । বিচ্ছিরি ভুল ।

অধ্যবসায় । অর্থ : 'পরিশ্রম', 'প্রযত্ন' । কাগজে মাঝে-মাঝে **'অধ্যাবসায়'** বানান বার হতে দেখি । ভুল বানান । সতর্ক থাকুন ।

অধ্যয়ন । **'অধ্যায়ন'** লিখবেন না ।

অধ্যাপক । কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করেন, তাঁদের সকলেই কিছু অধ্যাপক নন । কেউ-কেউ অধ্যাপক । ('প্রোফেসর' দেখুন ।)

অনবধান । বিশেষ্যপদ । অর্থ : 'অমনোযোগ', 'অসতর্কতা' । শব্দটির সঙ্গে 'তা' যোগ করবার দরকার নেই, **'অনবধানতা'** লিখবেন না । (তুলনীয় : 'কৃচ্ছ্র', 'সখ্য' ।)

অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ । নিবন্ধকে তো বটেই, যে-প্রতিবেদন খুবই ক্ষুদ্র আকারের নয়, অর্থাৎ নিতান্তই পাঁচ-সাত পঙ্‌ক্তিতে যা শেষ হয়ে যায় না, তাকেও সাধারণত আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বা প্যারাগ্রাফে ভাগ করে নিই । কোনও রচনাকে এই যে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করে নেওয়া, এরও অবশ্য একটা নিয়ম আছে । খেয়ালখুশিমতো এই বিভাজনের কাজটা করা যায় না ।

অ

অনুচ্ছেদগুলির প্রতিটিই যে আমাদের রচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সূত্রে গাঁথা, তাতে সন্দেহ নেই ; সেই বিচারে তাদের একটিও স্বাধীন কিংবা স্বতন্ত্র নয়। গোটা রচনার তারা এক-একটি অংশ মাত্র, তা থেকে আলাদা কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা কেউই এককভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা ধরে না। আবার অন্য দিক থেকে যখন বিচার করি, তখন দেখতে পাই যে, আমাদের বক্তব্যের এক-একটা ছোট অংশের তারা যেন ক্ষুদ্র অথচ সার্বিক এক-একটি প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি। সেদিক থেকে প্রতিটি অনুচ্ছেদ স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে।

এটা যদি বুঝি, একটি রচনাকে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে নেওয়ার নিয়মটাও তা হলে বুঝতে পারব। অনুচ্ছেদগুলি যেহেতু আমাদের গোটা বক্তব্যেরই এক-একটি অংশের ধারক, তাই সেই বক্তব্যের একটি অংশ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের রচনারও একটি অনুচ্ছেদ শেষ হয়ে যায়, এবং বক্তব্যের পরবর্তী অংশটিকে ধারণ করবার জন্য শুরু হয় তার পরবর্তী অনুচ্ছেদ।

কোনও দীর্ঘ রচনা যদি না বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত হয়, লেখকের বক্তব্যের বিভিন্ন অংশও তা হলে পাঠকের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। ফলে সেই অংশগুলিকে ধারানুক্রমিকভাবে অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, যে-সব লেখা ব্যাখ্যা- বা বিশ্লেষণ-ধর্মী, সেখানে বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের ভিতর দিয়েই লেখক তৈরি করে তোলেন তাঁর যুক্তির সোপানমালা। সেই সোপানগুলিকে এক-এক করে অতিক্রম করবার কাজটাও তখন পাঠকের পক্ষে খানিকটা শক্ত হয়ে ওঠে।

অনুচ্ছেদ-বিভাজন। নিবন্ধ অথবা প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদে আমাদের বক্তব্যের সূচনা অথবা প্রস্তাবনা। অতঃপর সেই বক্তব্য যে-ভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বা বিন্যস্ত হবে, তারই সূত্রে গড়ে উঠবে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলি। বক্তব্যের সকল অংশ সমান হয় না, ফলত তাদের জন্য দরকারও হয় না সমান বিস্তারিত উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা কিংবা বিশ্লেষণ। অনুচ্ছেদগুলিরও কোনওটা তাই দৈর্ঘ্যে একটু বড় হয়, কোনওটা একটু ছোট।

প্যারা-ইনডেন্ট। যখন কোনও নূতন অনুচ্ছেদ শুরু হচ্ছে, তখন বস্তুত শুরু হচ্ছে আমাদের বক্তব্যেরই একটি নূতন অংশ। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সেই কারণেই তার একটা পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়ার রীতি রয়েছে। নূতন অনুচ্ছেদের প্রথম পঙ্‌ক্তির গোড়ায় কিছুটা জায়গা (সাধারণত ১-এম) ছাড় দিয়ে সেটা দেখানো হয়। এই ছাড়কেই বলা হয় প্যারা-ইনডেন্ট।

অ

প্যারা-ইনডেন্ট না থাকলেই যে ওই পার্থক্যের ব্যাপারটা বোঝা যাবে না, এ-কথা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। বোঝা ঠিকই যাবে, যদি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষ পঙ্‌ক্তিটি কলামের পুরো মাপের বা মেজারের না হয়। কিন্তু সেই পঙ্‌ক্তিটি যদি হয় কলামের পুরো মাপের, অর্থাৎ কলামের প্রস্থের দিকের পুরো জায়গাই সে যদি দখল করে নেয়, তা হলে তার পরবর্তী পঙ্‌ক্তি থেকে যে একটি নূতন অনুচ্ছেদ শুরু হল, তা বোঝা যাবে না। দুটি অনুচ্ছেদের পার্থক্য তা হলে ঘুচে যাবে, এবং দুয়ে মিলে দৃশ্যত তৈরি হবে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ। প্যারা-ইনডেন্ট যে রাখা দরকার, এটাই তার মূল কারণ।

'মূল কারণ' বলছি এই জন্য যে, প্যারা-ইনডেন্ট রাখলে তা থেকে একটা বাড়তি সুবিধাও আমরা পেয়ে যাই, এবং খানিকটা সেই কারণেও প্যারা-ইনডেন্ট রাখা দরকার। সুবিধাটা কী ? না প্রতিটি অনুচ্ছেদের গোড়ায় ওই যে ১-এম ছাড়ের জন্য একটু সাদা জায়গা থাকছে, ওরই ফলে আরও কিছুটা কেটে যাচ্ছে বিভিন্ন পৃষ্ঠার ঠাস-জমাট দমবন্ধ ভাবটা। পৃষ্ঠাগুলিকে আরও একটু খোলামেলা দেখাচ্ছে। পাঠকের চোখ এতে আরাম পায়।

মনে রাখুন

(১) যে-রচনা দীর্ঘ, তা যদি না বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত হয়, লেখকের বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ তা হলে পাঠকের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না।
(২) প্যারা-ইনডেন্ট না থাকলে দুটি অনুচ্ছেদের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে মুছে যায়।

অন্তরিক্ষ। অর্থ : 'আকাশ', 'ব্যোম'। 'অন্তরীক্ষ' বানানও সমান শুদ্ধ। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে আমরা ই-কারের পক্ষপাতী। তাই 'অন্তরিক্ষ'ই লিখব। (বানান-বিধির ১ নং ধারার 'ঘ' অনুচ্ছেদ দেখুন।)

অন্তরিন। অর্থ : (কারাগারের বাইরে কোথাও) 'আটক' বা 'আবদ্ধ'। শব্দটা তৎসম নয়, ইংরেজি intern থেকে এসেছে। '**অন্তরীণ**' লিখবেন না।

লিখুন	লিখবেন না
অনুপস্থিতিতে (মানুষটি জীবিত, কিন্তু উপস্থিত নেই, এই অবস্থা বোঝাতে)	অবর্তমানে

অ

লিখুন	লিখবেন না
অনুবাদ (ভাষান্তরকরণ। 'তর্জমা' দেখুন।)	অনূবাদ
অনূদিত	অনুদিত, অনুবাদিত
অন্তঃকলহ	অন্তর্কলহ
অন্তঃসত্ত্বা	অন্তঃসত্তা, অন্তস্বত্বা
অন্তঃস্থ (ভিতরে অবস্থিত অর্থে)	অন্তস্থ
অন্তস্থ (শেষে অবস্থিত অর্থে)	অন্তঃস্থ
অন্যতম (অনেকের মধ্যে একজন বা একটি অর্থে)	অন্যতম একজন, অন্যতম একটি, একজন অন্যতম, একটি অন্যতম
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
অবশ্য	অবশ্যি, অবিশ্যি
অবিমৃশ্য	অবিমৃষ্য
অভ্যন্তরীণ	আভ্যন্তরীণ
অর্ঘ (মূল্য অর্থে)	অর্ঘ্য
অর্ঘ্য (পূজাকর্মে বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে যা নিবেদন করা হয়)	অর্ঘ
অসম (রাজ্যের নাম। 'নাম' দেখুন)	আসাম
অসমিয়া	অসমীয়া, আসামি, আসামী
অ্যাটর্নি	এটর্ণি, এটর্নি, এ্যাটর্ণি, এ্যাটর্নি
অ্যাডভোকেট	এডভোকেট, এ্যাডভোকেট
অ্যান্ড (ইংরেজি and)	এন্ড
অ্যাভিনিউ	এভিনিউ, এ্যাভিনিউ
অ্যাসিস্ট্যান্ট	এসিস্টেন্ট, এসিস্ট্যান্ট, এ্যাসিস্টেন্ট, এ্যাসিস্ট্যান্ট
অহরহ	অহঃরহ, অহরহঃ, অহোরহ
অহোরাত্র	অহরাত্রি, অহোরাত্রি

আ

আইঢাই। শব্দটির বানানে চন্দ্রবিন্দু নেই, এটা মনে রাখুন। অনুনাসিক উচ্চারণে অনেকে **'আঁইঢাঁই'** বা **'আইঢাঁই'** বলেন। তা বলুন, আপনার বানানে কিন্তু চন্দ্রবিন্দু বর্জনীয়।

আকছার। অর্থ : 'প্রায়ই', 'হামেশা'। শব্দটির শেষে 'ছার' আছে, সেটা যেন 'ছাড়' না হয়।

আকর্ষক। অর্থ : 'আকর্ষণকারী'। **'আকর্ষণীয়'** শব্দের অর্থ কিন্তু 'আকর্ষণের যোগ্য'। কোনও দৃশ্য, কারও ব্যক্তিত্ব, কোনও রূপ বা অন্য-কিছু যদি আপনাকে আকর্ষণ করে, তবে তার বিশেষণ হিসাবে **'আকর্ষণীয়'** না লিখে **'আকর্ষক'** লেখাই তাই সংগত।

আকাঙ্ক্ষা। এখানে 'ঙ' বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি যুগ্মবর্ণ—'ক্ষ'। সবটা ভাঙলে দাঁড়ায় ঙ্+ক্+ষ। যাঁরা **'আকাঙ্খা'** লেখেন, তাঁরা ভুল লেখেন।

আজও। কাগজে মাঝে-মাঝে বানান দেখা যায় 'আজো'। কিন্তু উচ্চারণভিত্তিক এই বানানকে মেনে নিলে **'কালও'** শব্দের বানান **'কালো'** না করার যুক্তি থাকে না ; লিখতে হয়, 'সে আজো আসেনি, কালো আসবে না।' মনে রাখুন, বানান সর্বদা উচ্চারণের অনুগামী হয় না, **'আজও'** লেখাই সংগত।

লিখুন	**লিখবেন না**
আঠারো	আঠার, আঠের, আঠেরো
আণবিক	আনবিক
আত্মসাৎ	আত্মস্যাৎ, আত্মস্যাত
আদমশুমারি	আদমসুমারি
আনাড়ি	আনাড়ী
আপস	আপোষ, আপোস
আফসোস	আফশোষ
আবগারি	আবগারী
আভ্যন্তর	আভ্যন্তরীণ
আভ্যন্তরিক	আভ্যন্তরীণ
আমটে	আমতে
(বিশিষ্ট সমাজসেবী। 'নাম' দ্রষ্টব্য)	
আমসত্ত্ব	আমসত্ব, আমস্বত্ব, আমস্বত্ত্ব
আমিন	আমীন

আ

লিখুন	লিখবেন না
আমির	আমীর
আয়ত্ত	আয়ত্ব
আরও	আরো
আলি	আলী
আশকারা	আসকারা, আস্কারা
আশরফি	আশরফী, আসরফি, আসরফী
আঁস্তাকুড়	আস্তাকুঁড়
আহুত (আহুতি হিসাবে প্রদত্ত)	আহূত
আহূত (যা অথবা যাকে আহ্বান করা হয়েছে)	আহুত

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

লিখুন	লিখবেন না
আনছ (আনিতেছ)	আনছো
আনছিল (আনিতেছিল)	আনছিলো
আনত (আনিত)	আনতো
আনব (আনিব)	আনবো
আনল (আনিল)	আনলো
আনাও (আনাইয়া থাকো বা আনাইয়া লও, ক্ষেত্র বিশেষে আনাইয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা-অনুরোধ)	—
আনাচ্ছ (আনাইতেছ)	আনাচ্ছো
আনাচ্ছিল (আনাইতেছিল)	আনাচ্ছিলো
আনাত (আনাইত)	আনাতো

ই

ইউগোস্লাভিয়া। 'জুগোস্লাভিয়া' বা 'যুগোস্লাভিয়া' লিখবেন না।

ইউনানি। কথাটার অর্থ 'গ্রিসদেশীয়'। প্রধানত এক ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি বোঝায়। **'ইউনানী'** লিখবেন না।

ইউনিট। ('হরফ' দেখুন।)

ইংল্যান্ড। যেমন 'আইসল্যান্ড', 'আয়ারল্যান্ড', 'গোর্খাল্যান্ড', 'গ্রিনল্যান্ড', 'নাগাল্যান্ড', 'ফিনল্যান্ড', 'স্কটল্যান্ড' ও 'হল্যান্ড' লেখা হয়, তেমন 'ইংল্যান্ড'। এক কালে **'ইংলন্ড'** লেখা হত, এখনও কেউ-কেউ ওই বানান চালাবার চেষ্টা করেন। না চলাই ভাল। ('নাম' দেখুন।)

ইজ্জত। মান-সম্মান, সম্ভ্রম। অ-তৎসম শব্দ, সুতরাং বানানে খণ্ড-ত ব্যবহার করবেন না। ('বানান-বিধি'র ২নং ধারা দেখুন।)

ইঞ্চি। ইংরেজি inch থেকে এসেছে, এবং এই চেহারায় বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে থেকে গিয়েছে। বাংলা রচনায় তাই **'ইঞ্চ্'** না লিখে **'ইঞ্চি'** লেখাই সংগত।

ইঞ্জিন। ইংরেজি engine থেকে এসেছে। মূল উচ্চারণ **'এঞ্জিন',** কিন্তু বাংলায় **'ইঞ্জিন'**ই চালু। বাংলা রচনায় আমরা অতএব 'ইঞ্জিন'ই লিখব। (যেমন **'এঞ্জিনিয়ার'** না লিখে লিখব **'ইঞ্জিনিয়ার'**।)

লিখুন	লিখবেন না
ইতিমধ্যে (প্রচলিত, সুতরাং গ্রাহ্য)	ইতোমধ্যে
ইতিপূর্বে (প্রচলিত, সুতরাং গ্রাহ্য)	ইতঃপূর্বে, ইতোপূর্বে
ইদ	ঈদ
ইদানীং	ইদানিং
ইঁদারা	ইদারা
ইনটেলেকচুয়াল ('বুদ্ধিজীবী' দেখুন)	—
ইনট্রো ('খবর, সূচনা' দেখুন)	—
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রজিত
ইমারত	ইমারৎ
ইরাকি	ইরাকী
ইরান	ইরাণ
ইরানি	ইরাণি, ইরাণী, ইরানী

ই • ঈ

লিখুন	লিখবেন না
ইশারা	ইসারা
ইষ্ট (মঙ্গল, শুভ, হিত অর্থে)	ইস্ট
ইসলামি	ইসলামী
ইস্টবেঙ্গল	ইষ্টবেঙ্গল
ইস্পাহানি (পদবি, ইস্পাহানের লোক, ইস্পাহান বিষয়ক)	ইস্পাহানী, হিস্পানি, হিস্পানী

●

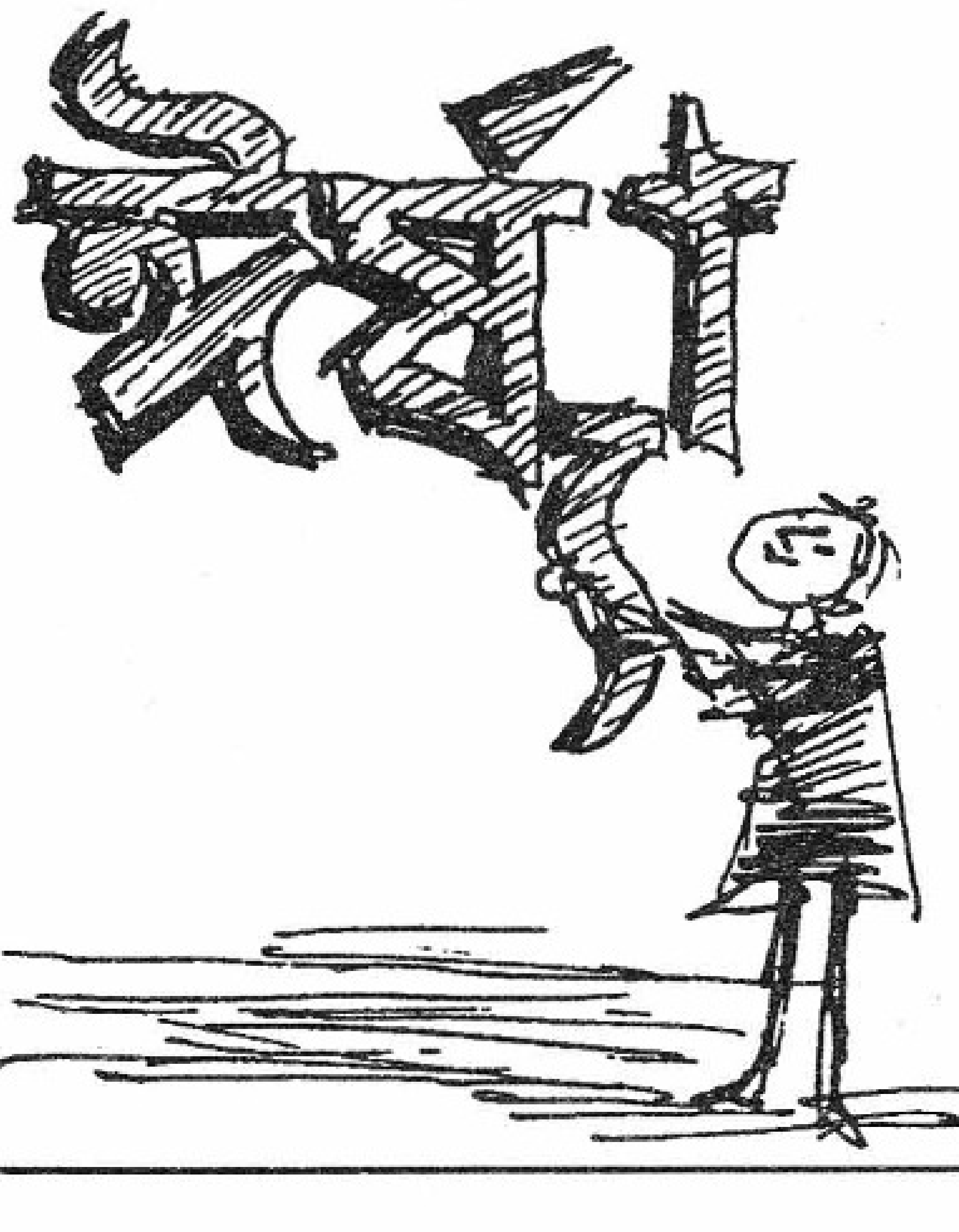
ঈক্ষণ । অর্থ : 'দর্শন করা বা দেখা' । **নিরীক্ষণ** = মন দিয়ে বা যত্নসহকারে দেখা ।

ঈদৃশ । অর্থ : 'এই রকম বা এই প্রকার' । **'ইদৃশ'** লিখবেন না ।

ঈপ্সা । অর্থ : 'পাবার ইচ্ছা' । **'ইপ্সা'** লিখবেন না ।

ঈশ । অর্থ : 'ঈশ্বর' । গোটা জগতের যিনি ঈশ্বর, তিনি 'জগদীশ' । (জগৎ+ঈশ ।)

ঈর্ষা । **'ঈর্ষ্যা'** বানানও সমান শুদ্ধ । তবে, আমরা বাহুল্য বর্জনের পক্ষপাতী, তাই য-ফলা না দিলেও যখন চলে, তখন সেই বানানই আমাদের কাছে গ্রাহ্য ।



উ

উচিত। বানানে খণ্ড-ত লাগালে খুবই অনুচিত কাজ হবে।

উচ্ছৃঙ্খল। সন্ধিটা উৎ+শৃঙ্খল। **'উছৃঙ্খল'** লিখবেন না।

উচ্ছ্বাস। ব-ফলার কথাটা মনে রাখুন। ওটা বাদ না যায়। কাগজে মাঝে-মাঝে **'উচ্ছাস'** দেখা যায় বলেই সতর্ক থাকা দরকার।

উজ্জ্বল। ব-ফলা এ-ক্ষেত্রেও জরুরি। কলকাতার একটি সিনেমা-হলের নামের বানানে ব-ফলা নেই, কাগজে কিন্তু থাকাই চাই।

উৎকর্ষ। বিশেষ্যপদ। অর্থ: 'উৎকৃষ্টতা'। মুশকিল এই যে, শব্দের শেষে 'তা' বা 'ত্ব' না থাকলে বিশেষ্যপদকে অনেকে শনাক্ত করতে পারেন না। তাঁরাই 'উৎকর্ষতা' লেখেন, 'কৃচ্ছ্রতা' লেখেন, 'সখ্যতা' লেখেন। ভুল লেখেন।

উতরাই। অর্থ: 'ঢালু পথ'। অ-তৎসম শব্দ, সুতরাং খণ্ড-ত ব্যবহার করবেন না।

উত্ত্যক্ত। কাগজে মাঝে-মাঝেই **'উত্যক্ত'** লেখা হয়। ভুল। সন্ধিটা যে উৎ+ত্যক্ত, এটা মনে রাখলেই বোঝা যাবে যে, বানানটা **'উত্ত্যক্ত'** না করে উপায় নেই।

উদ্‌গিরণ, উদ্‌গীর্ণ। কোথায় ই-কার ও কোথায় ঈ-কার, খেয়াল করুন, নইলে বানান-ভুল হবে।

উদ্দেশে, উদ্দেশ্যে। ভিন্নার্থক দুটি শব্দ। প্রথমটি য-ফলাবিহীন। অর্থ: 'দিকে' বা 'প্রতি'। যথা, 'কলকাতায় একটা দিন কাটিয়ে রাষ্ট্রপতি গতকাল সকালে দিল্লির **উদ্দেশে** রওনা হয়ে যান।' বা 'যাঁর **উদ্দেশে** এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, এই সেদিনও তিনি শুধু নিন্দিতই হয়েছেন।' দ্বিতীয় শব্দটি য-ফলাযুক্ত। অর্থ: 'অভিপ্রায়ে'। যথা, 'ভোট পাবার **উদ্দেশ্যেই** নেতারা এখন গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।' বা 'আদর্শে যাদের বিন্দুমাত্র মিল নেই, ক্ষমতা দখলের **উদ্দেশ্যে** তারাও অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলায়।'

উদ্‌ধৃত, উদ্ধৃত। সন্ধিটা উৎ+ধৃত। **'উধৃত'** লিখলে ভুল হবে।

উদ্ধৃতি-চিহ্ন বা কোটেশন-মার্ক। গল্প-উপন্যাসের যে-অংশে সংলাপ থাকে, সেখানে উদ্ধৃতি-চিহ্ন বা কোটেশন-মার্ক ব্যবহারের কথা সকলেই জানেন। এ ছাড়া সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে আমরা উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি।

(১) যখন আমাদের কোনও নিবন্ধে, প্রতিবেদনে কি অন্যবিধ লেখায় কারও উক্তি বা বক্তব্য সর্বাংশে বা অংশত উদ্ধার করবার প্রয়োজন ঘটে।

(২) যখন সেই লেখায় আমরা কোনও গ্রন্থ, রচনা বা অন্যবিধ শিল্পকর্মের নামোল্লেখ করি।

(৩) কোনও শব্দ যখন তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, ব্যঙ্গ বা পরিহাসের কারণে, তার একেবারেই বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

(ক) ভদ্রলোক বললেন, "আজকালকার নেতারা শুধু দলের কথা ভাবেন, দেশের কথা একটুও ভাবেন না।"

(খ) আজকালকার নেতাদের সম্পর্কে যে-ভদ্রলোক বললেন যে, তাঁরা "শুধু দলের কথা ভাবেন," সম্ভবত তিনি ভুল বলেননি। দলই আজকাল প্রাধান্য পাচ্ছে ; দেশের কথা যাঁরা ভাবতেন, সেই নেতারা আর নেই।

(ভদ্রলোকের গোটা উক্তিটিকে এখানে উদ্ধার করা হয়নি, শুধু তার একটি অংশকে করা হয়েছে, এবং উক্তির সেই অংশটিকে রাখা হয়েছে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে।)

(গ) "আজকালকার নেতারা" বলতে ভদ্রলোক যে ঠিক কাদের কথা বোঝাতে চাইলেন, তা অবশ্য পরিষ্কার হল না।

(এখানেও উদ্ধার করা হয়েছে ভদ্রলোকের উক্তির একটি ছোট্ট অংশ, এবং শুধু সেই অংশটিকেই উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

(ক) রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পটি আমরা প্রায় সবাই পড়েছি ; যাঁরা পড়েননি, তাঁরা 'গল্পগুচ্ছ'-এ এটি পড়ে নিতে পারেন।

(খ) আমরা জানি, সত্যজিৎ রায় যে তাঁর 'চারুলতা'য় রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকে একটু-আধটু সরে এসেছিলেন, তার কারণ আর কিছুই নয়, মূল গল্প থেকে ওইটুকু সরে না এলে তিনি চলচ্চিত্রের দাবি মেটাতে পারতেন না।

(গ) দা ভিঞ্চির 'মোনা লিসা', মিকেলাঞ্জেলোর 'মোজেস' আর রাফায়েলের 'মাদোনা লা বেল জার্দিনিয়ের'—মানবিক প্রতিভার এই যে সব তুলনাহীন সৃষ্টি, এর কোনওটির আবেদনই দেশকালের সীমানায় আবদ্ধ নয়।

(লক্ষ করুন, প্রথম বাক্যে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প ও একটি গ্রন্থের নাম, দ্বিতীয় বাক্যে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত একটি চলচ্চিত্রের নাম এবং তৃতীয় বাক্যে স্মরণীয় তিনজন শিল্পীর তিনটি শিল্পকর্মের নাম উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।)

তৃতীয় ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

(ক) মানুষটি যদি 'বুদ্ধিমান' না-ই হবে, তো যে-ডালটিতে সে নিজে বসে আছে, তারই গোড়ায় কুড়ুলের কোপ মারবে কেন ?

(খ) এমনই এদের 'দেশপ্রেম' যে, বিদেশি শাসকদের সঙ্গে হাত মেলাতে এদের বিবেকে বাধে না !

(গ) এ-বি-সি-ডি যখন মুখস্থ বলতে পারে, লোকটাকে তখন 'পণ্ডিত' বলতে বাধা নেই !

(লক্ষ করুন, প্রথম বাক্যের 'বুদ্ধিমান', দ্বিতীয় বাক্যের 'দেশপ্রেম' ও তৃতীয় বাক্যের 'পণ্ডিত' শব্দ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সেই কারণেই শব্দ তিনটিকে রাখা হয়েছে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে।)

★

বিশেষ একটি শব্দ বা বাক্যাংশ যে অন্যান্য শব্দ বা বাক্যাংশের তুলনায় একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এটা বোঝাবার জন্যও কেউ-কেউ উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করেন। মাঝে-মাঝে এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হওয়া বিচিত্র নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ঘটনার কথা বলি। বেশি সংখ্যায় যাত্রী আকর্ষণের জন্য এক বিমান-কোম্পানি ঠিক করেছিল যে, সস্ত্রীক যদি কেউ তাদের বিমানে উঠে প্রমোদভ্রমণে যান, তা হলে স্ত্রীর টিকিটের দাম লাগবে অর্ধেক। ভাড়ার এই যে ছাড়, এর বিজ্ঞাপন তৈরি করবার দায়িত্ব যে এজেন্সিকে দেওয়া হয়, তার কপি-রাইটারের মনে হল, স্ত্রীকে সঙ্গে নিলে তবেই দেড়জনের ভাড়ায় দুজনের বিমানভ্রমণ সম্ভব হচ্ছে, সুতরাং উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রেখে স্ত্রীর গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া চাই। ফলে তাঁর কপিটা হল এইরকম :

'স্ত্রী'কে সঙ্গে নিয়ে প্রমোদভ্রমণে গেলে
বিমানভাড়ায় বিশাল ছাড়

স্ত্রী যে এর ফলে মোটেই গুরুত্ব পাবেন না, বরং উদ্ধৃতি-চিহ্নটা এ-ক্ষেত্রে এই সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে যে, সত্যিকারের স্ত্রীর বদলে প্রমোদভ্রমণের সঙ্গিনী হিসাবে অন্য কাউকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে যাবার প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে এই বিজ্ঞাপনে, কপি-রাইটার তা বুঝতে পারেননি। যখন বুঝলেন, বিজ্ঞাপন তখন ছাপা হয়ে গিয়েছে।

★

উক্তি-বিভাজন। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত উক্তিকে যেমন আমরা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় একই উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রাখতে পারি, তেমন আবার দু' খণ্ডে ভাগও করতে পারি সেই উক্তিকে। উক্তির দুই বিচ্ছিন্ন খণ্ডকে তখন আলাদা-আলাদা ভাবে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রাখতে হয়। বাক্যের বিন্যাসও সে-ক্ষেত্রে পালটে যায়। নীচের বাক্য দুটি লক্ষ করুন :

(ক) আজহার বললেন, "বিশ্বাস করুন, ড্র-এর জন্য খেলতে আমার একটুও

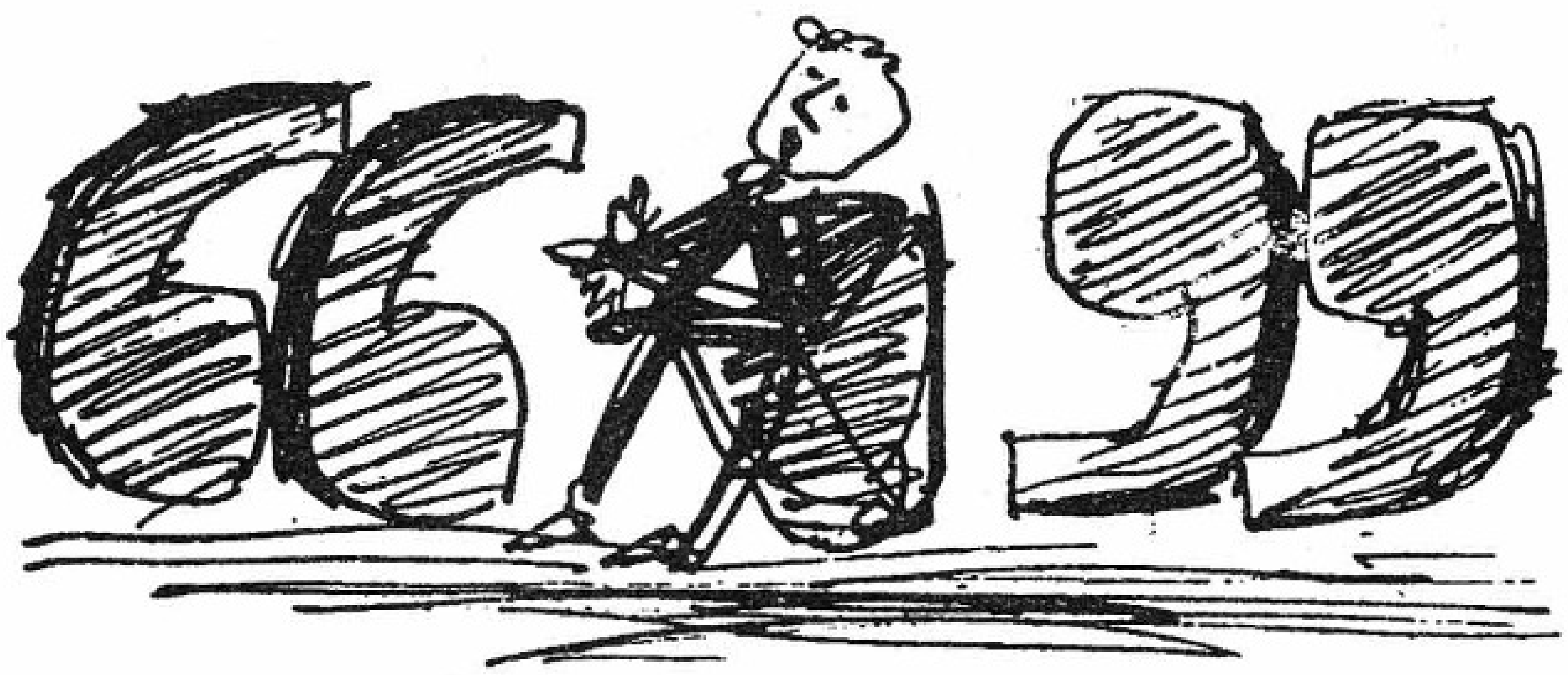
ভাল লাগে না।"

(বাক্যের অন্তর্ভুক্ত উক্তিকে এখানে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় একই উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।)

(খ) "বিশ্বাস করুন," আজহার বললেন, "ড্র-এর জন্য খেলতে আমার একটুও ভাল লাগে না।"

(বাক্যে উদ্ধৃত উক্তি এখানে দুই খণ্ডে বিভক্ত ; পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন সেই খণ্ড দুটিকে এখানে আলাদা-আলাদা ভাবে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রাখবার দরকার হয়েছে। সেইসঙ্গে বাক্যের বিন্যাস কীভাবে পালটে গিয়েছে, সেটা লক্ষণীয়।)

উদ্ধৃতি ও অনুচ্ছেদ। উদ্ধৃত উক্তি অথবা রচনাংশ যখন একটি অনুচ্ছেদেই শেষ হয় না, একাধিক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত হয়, তখন যে-যে অনুচ্ছেদে তার বিস্তার ঘটছে, তার প্রত্যেকটির গোড়াতেই উদ্ধৃতি শুরু হওয়ার চিহ্ন (") দেওয়া চাই, এবং শেষ অনুচ্ছেদের সেইখানে দেওয়া চাই উদ্ধৃতি শেষ হওয়ার চিহ্ন ("), উদ্ধৃত উক্তি অথবা রচনাংশ যেখানে সমাপ্ত হচ্ছে। মধ্যবর্তী কোনও অনুচ্ছেদের শেষেই কিন্তু উদ্ধৃতি শেষ হওয়ার চিহ্ন



জেনেছেন। তাঁদেরই একজন সেদিন আমাকে বললেন, 'তোমরা যদি নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাও, তা হলে দল থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' কিন্তু এ-সব কথায় আমরা ভয় পাচ্ছি না।"

(লক্ষ করুন, মূল উদ্ধৃতিকে এখানে ডবল কোটেশন-মার্কের মধ্যে, এবং তার ভিতরকার উদ্ধৃতিকে এখানে সিঙ্গ্‌ল কোটেশন-মার্কের মধ্যে রাখা হয়েছে।)

ভিতরকার উদ্ধৃতিটি অবশ্য মূল উদ্ধৃতির (ক) একেবারে গোড়াতেই থাকতে পারে, কিংবা তা মূল উদ্ধৃতির (খ) একেবারে শেষেও থাকা সম্ভব। গোড়ায় থাকলে ট্রিপ্‌ল কোটেশন-মার্ক দিয়ে মূল উদ্ধৃতি শুরু করতে হবে, এবং শেষে থাকলে মূল উদ্ধৃতি শেষ করতে হবে ট্রিপ্‌ল কোটেশন-মার্ক দিয়ে।

নীচের দৃষ্টান্ত দুটি লক্ষ করুন :

(ক) আহত অধ্যাপক বললেন, "'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'—রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশকেই আমি ধ্রুব জ্ঞান করি। ডেকেছিলুম তো সকলকেই, কিন্তু কেউ আসেনি। তাই দাঙ্গা থামাতে আমাকে একাই ছুটে যেতে হল।"

(খ) এত ভাল একজন স্ট্রাইকার থাকা সত্ত্বেও গোল পাওয়া যাচ্ছে না কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্লাবের এক ক্রুদ্ধ কর্মকর্তা বললেন, "কথাটা তো ওই স্ট্রাইকারটিকে আমি নিজেই জিজ্ঞেস করেছিলুম। তাতে সে বলল, 'গোল চাইলে টাকা দিতে হয়। আগে আমার বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিন, তারপর গোলের কথা বলবেন।'"

ভিতরকার উদ্ধৃতি মূল উদ্ধৃতির একেবারে গোড়ায় পড়লে কীভাবে ট্রিপ্‌ল কোটেশন-মার্ক দিয়ে উদ্ধৃত অংশটি শুরু করতে হয় (মূল উদ্ধৃতি শুরু হওয়ার জন্য ডবল কোটেশন-মার্ক+ভিতরকার উদ্ধৃতি শুরু হওয়ার জন্য সিঙ্গ্‌ল কোটেশন-মার্ক, সব মিলিয়ে ট্রিপ্‌ল), এবং একেবারে শেষে পড়লে কীভাবে ট্রিপ্‌ল কোটেশন-মার্ক দিয়ে উদ্ধৃত অংশটি শেষ করতে হয় (ভিতরকার উদ্ধৃতি শেষ হওয়ার জন্য সিঙ্গ্‌ল কোটেশন-মার্ক+মূল উদ্ধৃতি শেষ হওয়ার জন্য ডবল কোটেশন-মার্ক, সব মিলিয়ে ট্রিপ্‌ল), দৃষ্টান্ত দুটির উপরে একবার চোখ বুলোলেই তা স্পষ্ট হবে।

ট্রিপ্‌ল কোটেশন-মার্ক দৃষ্টিকটু। অনেক ক্ষেত্রে এটি বিভ্রমেরও সৃষ্টি করে। তাই গল্পে-উপন্যাসে এর ব্যবহার মাঝে-মাঝে জরুরি হলেও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ও অন্যবিধ রচনায় এটিকে যথাসম্ভব পরিহার করাই উচিত।

উদ্ধৃতি-চিহ্ন কখন কোথায় শেষ হবে। লেখালিখির কাজ যাঁরা করেন,

তাঁদের সকলকেই তাঁদের লেখার মধ্যে কখনও-না-কখনও উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু উদ্ধৃতির সমাপ্তিসূচক চিহ্নটা (") কখন কোথায় বসানো উচিত, সবাই যে তা জানেন, এমন মনে হয় না। চিহ্নটা মাঝেমধ্যে ভুল জায়গায় বসে যায়।

উদ্ধৃতি-চিহ্ন কখনও শেষ হওয়া উচিত যতি-চিহ্নের আগে, কখনও বা যতি-চিহ্নের পরে। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, যেখানে যতি-চিহ্ন ও উদ্ধৃতির সমাপ্তিসূচক চিহ্নকে পাশাপাশি রেখে তাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

(ক) ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বললেন, "পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে যাঁকে সভাপতি করা হচ্ছে, তিনি পয়সাওয়ালা লোক, পাঁচ হাজার টাকা ডোনেশন দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। কিন্তু শুধু ডোনেশন দিলেই তো হবে না, বক্তৃতাটাও দেওয়া চাই। তা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বেশ ভাল একটা বক্তৃতা দিতে পারবেন তো ?"

(খ) "পারতেন," সেক্রেটারি বললেন, "যদি কিনা রবীন্দ্রনাথের লেখা খান দুই-তিন বই তাঁর পড়া থাকত।"

(গ) ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন, "সে কী, তাও তাঁর পড়া নেই ? আমি জমির দালালি করি, উদয়াস্ত খাটতে হয়, কিন্তু আমারও তো তাঁর চার-চারখানা বই পড়া হয়ে গেছে। এই ধরুন 'চিরকুমার সভা'...তারপর ওই যে...কী যেন নাম বইখানার ?"

(ঘ) "থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না," সেক্রেটারি বললেন, "একখানার নাম তো করেছেন, ওই যথেষ্ট। তা যাঁকে সভাপতি করে আনা হচ্ছে, কথা বলে যা বুঝলুম, তিনিও রবীন্দ্রনাথের মাত্র একখানা বই-ই পড়েছেন, 'সহজ পাঠ'।"

(ঙ) প্রেসিডেন্ট ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেষ কথাটা কানে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বই বললেন ?"

(চ) "'সহজ পাঠ'। বাস্, আর কিছু পড়েননি।"

(ছ) "তা হোক," প্রেসিডেন্ট বললেন, "তা হলে বরং ওই 'সহজ পাঠ'-এর উপরেই ওঁকে কিছু বলতে বলুন।"

উদ্ধৃতি-চিহ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হল এইজন্য যে, বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রায়ই এর ভুল ব্যবহার চোখে পড়ে। ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতিও প্রচুর দেখতে পাই। তার একটা বড় কারণ অবশ্য অসতর্কতা। আমরা সতর্ক থাকি না বলেই অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় না। অথবা শুরু না হয়েও শেষ হয় ! যে-উদ্ধৃতি ডবল কোটেশন-মার্ক দিয়ে শুরু হয়েছে, তা সিঙ্গল কোটেশন-মার্ক দিয়ে শেষ করার ঘটনাও বিরল নয়। আবার এর উলটোটাও (অর্থাৎ, সিঙ্গল কোটেশন-মার্ক দিয়ে উদ্ধৃতি শুরু করে তারপর ডবল কোটেশন-মার্ক দিয়ে

তাকে শেষ করার ঘটনাও) কম ঘটে না। উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহারের নিয়মগুলি যদি আমরা ঠিকমতো জেনে নিই, এবং সেইসঙ্গে একটু সতর্ক থাকি, এ-সব ভুলত্রুটিও তা হলে বিদায় নেবে।

মনে রাখুন

(১) সাধারণত কারও উক্তি বা বক্তব্য সর্বাংশে বা অংশত উদ্ধার করতে হলে, কোনও গ্রন্থ, রচনা বা অন্যবিধ শিল্পকর্মের নামোল্লেখ করতে হলে, এবং ব্যঙ্গ বা কৌতুকের প্রয়োজনে কোনও শব্দকে তার প্রকৃত অর্থের বদলে একেবারে বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করতে হলে আমরা উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি।

(২) একটি উদ্ধৃতির মধ্যে যখন আর-একটি উদ্ধৃতি ঢুকে পড়ে, তখন একইসঙ্গে দরকার হয় ডবল কোটেশন-মার্ক ও সিঙ্গ্‌ল কোটেশন-মার্ক ব্যবহারের।

(৩) উদ্ধৃত বক্তব্য যখন কোনও অনুচ্ছেদের সীমা ডিঙিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তৃত হয়, পরবর্তী সেই অনুচ্ছেদের গোড়াতেও তখন উদ্ধৃতি-চিহ্ন বসাতে হবে।

লিখুন	লিখবেন না
উদ্‌ভূত, উদ্ভূত	উদ্‌ভুত, উদ্ভুত
উনিশ	ঊনিশ
উপায়ান্তর	উপায়ন্তর
উপ্ত	বপিত
ঊর্ণনাভ	উর্ণনাভ
উর্বশী	ঊর্বশী
উষ্মা	ঊষ্মা

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

উঠছ (উঠিতেছ)	উঠছো
উঠছিল (উঠিতেছিল)	উঠছিলো
উঠত (উঠিত)	উঠতো
উঠব (উঠিব)	উঠবো

উ

লিখুন	লিখবেন না
উঠল (উঠিল)	উঠলো
উঠিয়েছিল (উঠাইয়াছিল)	উঠিয়েছিলো
উঠিয়ো (উত্থাপন/উত্তোলন করিয়ো বা উঠাইয়ো)	উঠিও
উঠেছিল (উঠিয়াছিল)	উঠেছিলো
উঠো (উত্থিত হইয়ো)	উঠ
ওঠাও (উত্থাপন/উত্তোলন করিয়া থাকো; ক্ষেত্র বিশেষে উত্থাপন/উত্তোলন করিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ওঠাচ্ছ (উঠাইতেছ)	ওঠাচ্ছো
ওঠাচ্ছিল (উঠাইতেছিল)	ওঠাচ্ছিলো
ওঠাত (উঠাইত)	ওঠাতো
ওঠান (উঠাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে উঠাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ওঠানো (উঠাইবার কাজ)	ওঠান
ওঠাব (উঠাইব)	ওঠাবো
ওঠাল (উঠাইল)	ওঠালো
ওঠো (উঠিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে উঠিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ওঠ

উ • ঋ • এ

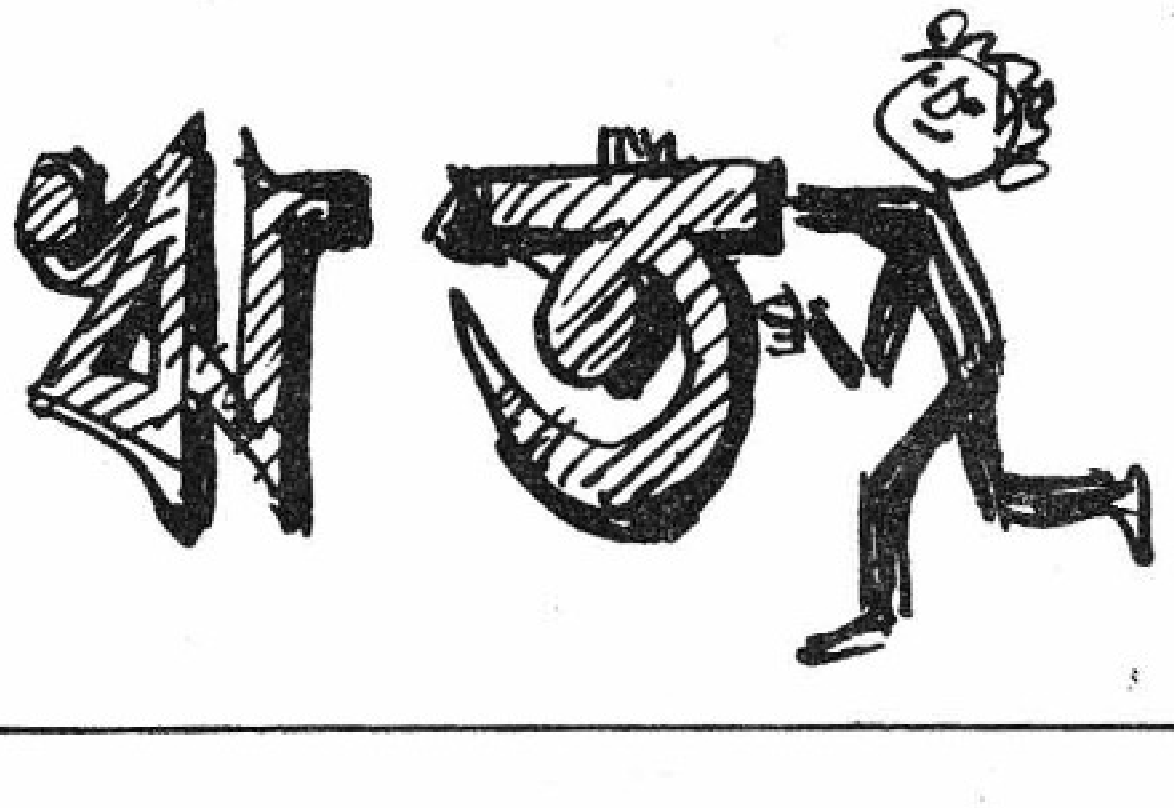
উর্ধ্ব। ব-ফলার কথাটা মনে রাখুন। '**উর্ধ**' লিখবেন না।
উর্ধ্বকমা। 'বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন।
উর্মি। অর্থ : ঢেউ, তরঙ্গ। '**উর্মি**' লিখবেন না।
ঊষর। অর্থ : অনুর্বর। এমন জমি, যাতে চাষ করা কঠিন। '**উষর**' লিখবেন না।

•

ঋজু। অর্থ : 'সোজা', 'সিধা', 'সটান'।
ঋত। অর্থ : 'সত্য'। অন্যান্য অর্থও আছে, তবে বাংলায় সাধারণত 'সত্য'-অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এর থেকেই এসেছে 'অনৃত' শব্দটি, যার অর্থ 'মিথ্যা'। অনৃতভাষী = মিথ্যাবাদী।
ঋত্বিক। অর্থ : 'যজ্ঞের পুরোহিত'। (নানা প্রসঙ্গে এই শব্দটি যেভাবে আজকাল ব্যবহৃত হয়, তাতে কিছুটা শৈথিল্য চোখে পড়ে।)
ঋষভ। অর্থ : 'বৃষ'। 'পুঙ্গব' শব্দেরও এই একই অর্থ। কিন্তু 'নরপুঙ্গব' বলতে যেমন 'নরশ্রেষ্ঠ' বোঝানো হয়, তেমন 'পুরুষর্ষভ' বলতে বোঝায় 'পুরুষশ্রেষ্ঠ'কে। অর্থাৎ সমাসের উত্তরপদে যেমন 'পুঙ্গব' তেমন 'ঋষভ'ও শ্রেষ্ঠত্ববাচক।

•

এ ছাড়া। শব্দ দুটিকে জুড়ে না দিয়ে (**এছাড়া**) আলাদা করে লিখুন। ('বানান-বিধি'র ১৫ নং ধারা দ্রষ্টব্য।)
এ তো। অর্থ : 'ইহা তো'। এ-ক্ষেত্রেও শব্দ দুটিকে জুড়ে না দিয়ে (**এতো**) আলাদা করে লিখুন। নইলে অর্থ দাঁড়াতে পারে : 'এই পরিমাণ'।
একশা। তালব্য শ ব্যবহার করুন। '**একসা**' লিখবেন না।



এ

এখনও। এই বানানই লিখুন, **'এখনো'** লিখবেন না। ('বানান-বিধি'র ১৪ নং ধারা দ্রষ্টব্য।)

এখানকার। কদাচ **'এখানের'** 'লিখবেন না। ('ওখানকার', 'যেখানকার' ও 'সেখানকার' দ্রষ্টব্য।)

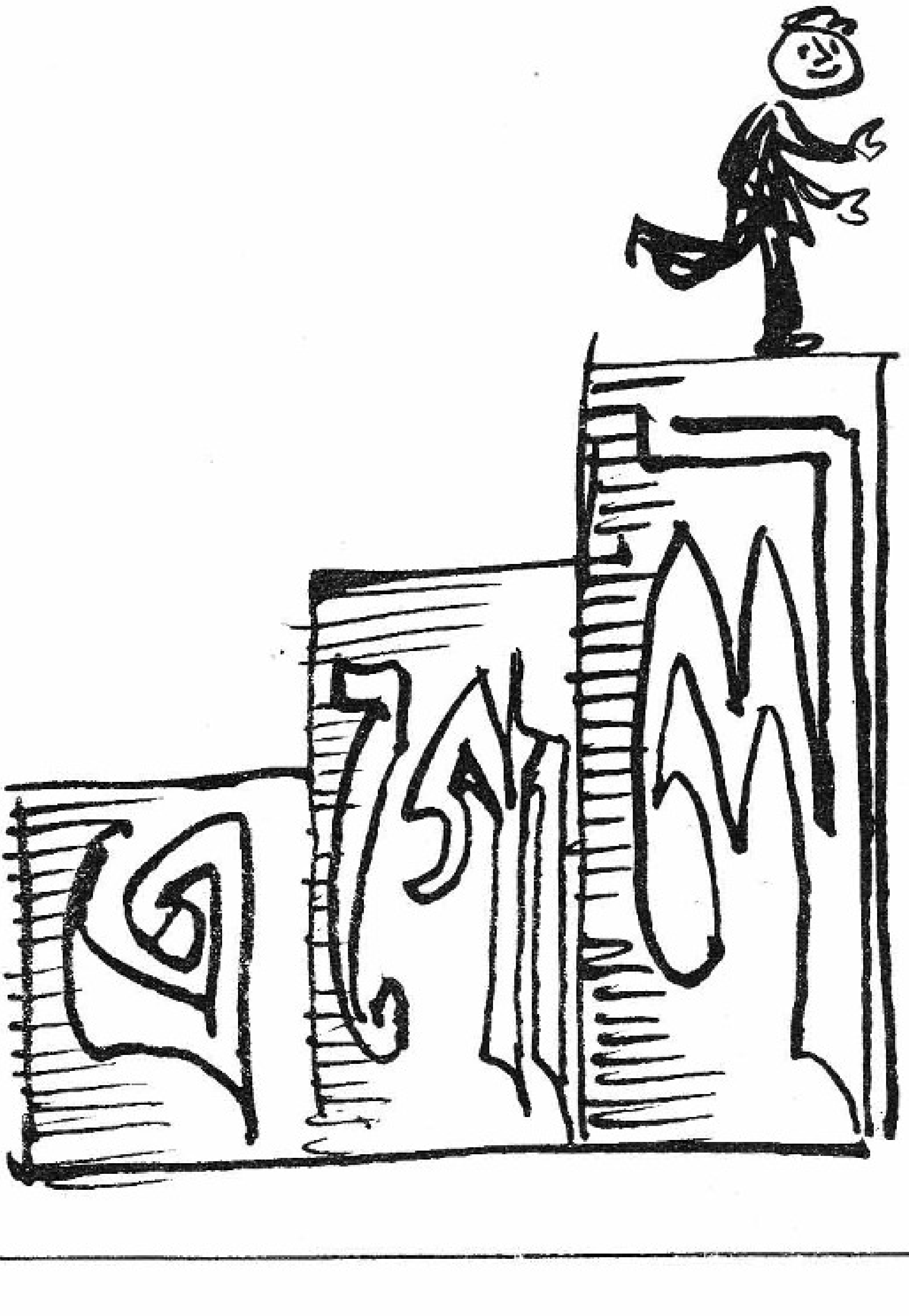
লিখুন	লিখবেন না
এগারো	এগার
এঁটেল	এটেল, এঁঠেল
এতদ্দ্বারা	এতদ্বারা
এম (em) ('হরফ' দেখুন)	—
এম. এসসি.	এম. এস. সি.
এল	আসল, আসলো
এলিপসিস (ত্রিবিন্দুচিহ্ন। 'বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
এলে	আসলে
এঁর	এনার
এশীয়	এশিয়

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

এগিয়ে ছিল (অগ্রবর্তী অবস্থায় ছিল)	এগিয়েছিল
এগিয়েছিল (অগ্রসর হইয়াছিল)	এগিয়েছিলো
এগিয়ো (অগ্রসর হইয়ো)	এগিও
এগোও (অগ্রসর হও, ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রসর হইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
এগোচ্ছ (আগাইতেছ)	এগোচ্ছো
এগোচ্ছিল (আগাইয়া যাইতেছিল)	এগোচ্ছিলো

এ

লিখুন	লিখবেন না
এগোত (অগ্রসর হইত)	এগোতো
এগোন (অগ্রসর হন, ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রসর হইয়াছিলেন । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
এগোনো (অগ্রসর হওয়া)	এগোন
এগোব (অগ্রসর হইব)	এগোবো
এগোল (অগ্রসর হইল)	এগোলো



ঐ • ও

ঐকতান। কখনও **'ঐক্যতান'** লিখবেন না। যেমন 'মতের অভিন্নতা' অর্থে **'ঐক্যমত্য'** না লিখে লিখবেন **'ঐকমত্য'**।

ঐকাগ্র্য। অর্থ : 'একাগ্রতা'। যেমন, 'একাত্মতা' বোঝাতে 'ঐকাত্ম্য' শব্দটি অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঐকান্তিক। অর্থ : 'অতিমাত্রিক', 'সবিশেষ', 'প্রগাঢ়'।

ঐচ্ছিক। সংবাদপত্রে সাধারণত অধীতব্য বা পাঠ্য বিষয়ের বিশেষণ হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটি এসেছে 'ইচ্ছা' থেকে। নানা বিষয়ের ভিতর থেকে একজন ছাত্র বা পরীক্ষার্থী যে-বিষয়টি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বাছাই করে নেন, সেটি তাঁর optional subject বা ঐচ্ছিক বিষয়। এরই বিপরীত দিকে রয়েছে compulsory subject বা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়।

•

ওই। তৎসম শব্দ ছাড়া অন্যত্র **'ঐ'** না লিখে **'ওই'** লেখাই বাঞ্ছনীয়। 'ঐ লোকটি', 'ঐ রকম' না লিখে 'ওই লোকটি', 'ওই রকম' লিখুন।

ওঁচা। অর্থ : 'খেলো', 'বাজে', 'নিকৃষ্ট শ্রেণীর'। যথা, 'ওঁচা মাল', 'ওঁচা লেখা', 'ওঁচা লোক'। বানানে চন্দ্রবিন্দুটির কথা মনে রাখুন।

ওকালতনামা। উকিল্ নিয়োগের দলিল। 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'।

ওকালতি। যখন বিশেষ্যপদ, তখন অর্থ : 'উকিলবৃত্তি'। বিশেষণ হিসাবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যথা, 'ওকালতি বুদ্ধি', 'ওকালতি প্যাঁচ'।

ওখানকার। কদাচ 'ওখানের' লিখবেন না। ('এখানকার', 'যেখানকার' ও 'সেখানকার' দ্রষ্টব্য।)

ওলন্দাজ। কাগজে অনেক সময় **'ওলন্দাজ'** না লিখে 'ডাচ' লেখা হয়। এই অভ্যাস ত্যাগ করুন। সর্বদা 'ওলন্দাজ'ই লিখবেন।

লিখুন	লিখবেন না
ওড়িয়া	উড়িয়া, উড়ে
ওড়িশা	উড়িষ্যা
ওত	ওঁৎ, ওঁত
ওতপ্রোত	ওতঃপ্রোত, ওতপ্রোতঃ
ওতরানো (উতরে যাওয়া)	ওতরান
ওতরাল	ওতরালো
ওঁর	ওনার

ঔ

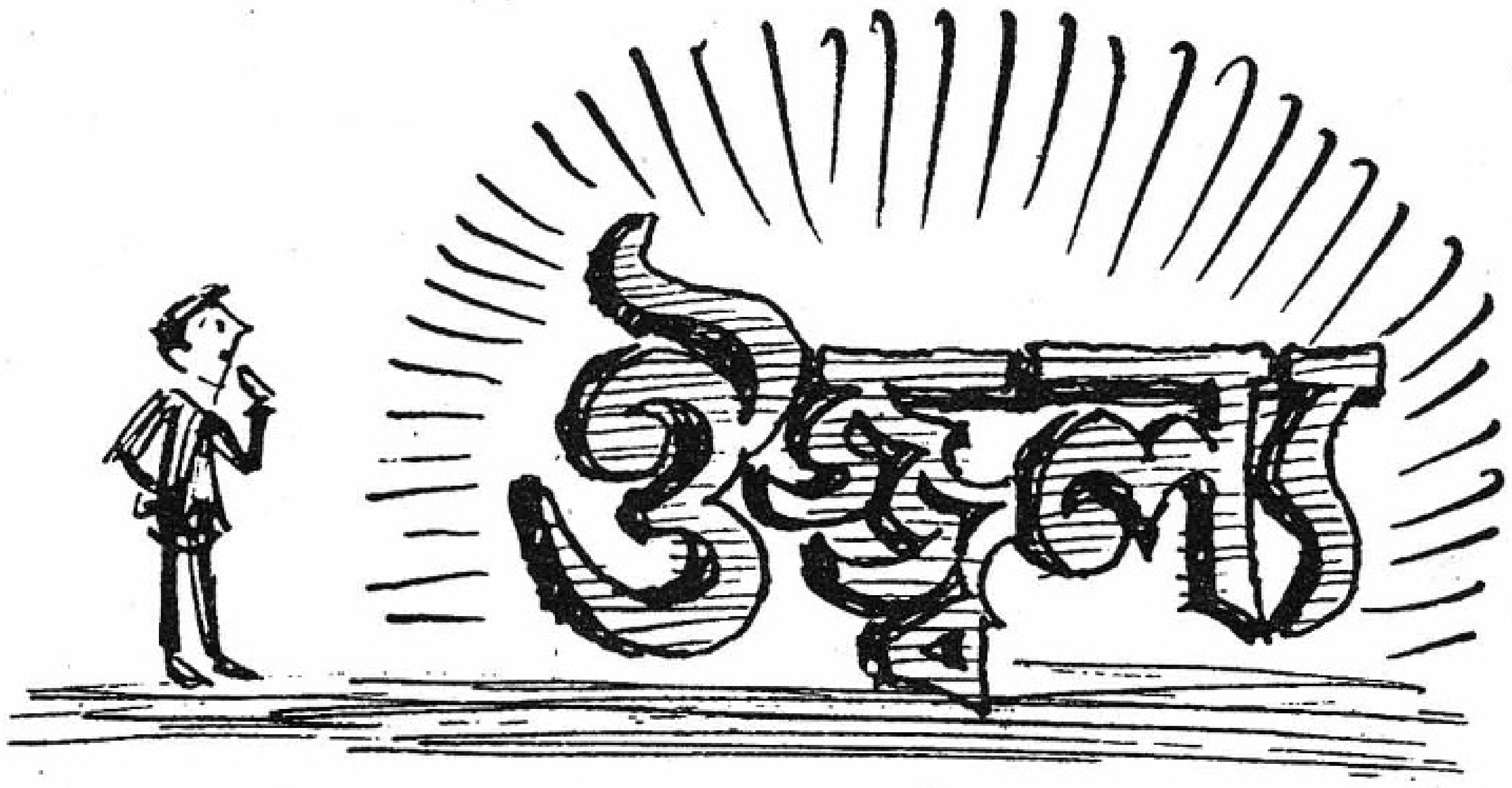
ঔচিত্য । অর্থ : 'উচিতভাব', 'ন্যায্যতা', 'যোগ্যতা' ।

ঔজ্জ্বল্য । অর্থ : 'উজ্জ্বলতা' । বানানে ব-ফলা যেন বর্জিত না হয় ।

ঔৎসুক্য । অর্থ : 'উৎসুক ভাব', 'আগ্রহ', 'কৌতূহল' ।

ঔদরিক । অর্থ : 'পেটুক' । কথাটা 'উদর' থেকে আসছে । যে-মানুষ উদর-পূর্তিতে অত্যধিক আগ্রহী, সে '**ঔদরিক**' । শব্দটির সাধারণ অর্থ : 'উদর-সংক্রান্ত' । যথা, 'ঔদরিক পীড়া' । (এ-ক্ষেত্রে অবশ্য 'উদরাময়' লেখাই ভাল ।)

ঔপনিষদ । অর্থ : 'উপনিষৎ সংক্রান্ত' । বিশেষণ-পদ হিসাবে 'ঔপনিষদ'-এই কাজ চলে যায়, 'ঔপনিষদিক' বা 'ঔপনিষদীয়' লিখবার দরকার হয় না ।



ক

কংগ্রেসি। শব্দটি আদৌ ব্যবহার করতে হলে এই বানান লিখুন ; **'কংগ্রেসী'** লিখবেন না। 'আদৌ ব্যবহার করতে হলে' বলছি এই কারণে যে, 'কংগ্রেসি' বানানেও এই শব্দ ব্যবহার না করাই ভাল। আমরা তো 'বামফ্রন্টি নেতা' বা 'বামফ্রন্টি বিধায়ক' লিখি না, লিখি 'বামফ্রন্ট নেতা' বা 'বামফ্রন্ট বিধায়ক'। 'কংগ্রেস নেতা', 'কংগ্রেস বিধায়ক', 'কংগ্রেস সাংসদ' ইত্যাদি লেখাই অতএব সংগত।

কই। 'কোথায়' ও 'কইমাছ', দুই অর্থেই **'কৈ'** না লিখে **'কই'** লিখুন।

কঙ্কণ। অর্থ : 'কাঁকন', 'বলয়'। 'দন্ত্য ন' ব্যবহার করবেন না।

কটকি। **'কটকী'** লিখবেন না।

কটি। অর্থ : 'কোমর'। **'কটী'** লিখবেন না।

কটূক্তি। 'কটু' ; কিন্তু কটু+উক্তি=কটূক্তি।

কণা। **'কনা'** লিখবেন না।

কনসেশন। ভুল করে অনেক সময়ই লেখা হয় **'কনসেসন'**। এই লিপ্যন্তর কিন্তু মূল উচ্চারণের অনুগামী নয়। মূল উচ্চারণ অবশ্য ভিন্ন ভাষার লিপিতে অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি ধরা যায় না, তবু তাকে লিপ্যন্তরে যথাসম্ভব আভাসিত করা চাই, এ-কথা মনে রাখুন।

কনিষ্ঠ। **'কনিষ্ঠতম'** লিখবেন না।

কপাটি। **'কপাটী'** লিখবেন না।

কপি। সাধারণ অর্থ : 'নকল' বা 'অনুলিপি'। সংবাদপত্রে অবশ্য 'কপি' বলতে সাধারণত সেইসব লেখার কথাই বোঝানো হয়, যা কম্পোজ করবার জন্য ছাপাখানায় পাঠানো হবে বা হয়েছে।

যাঁরা কপি লেখেন, কতকগুলি নিয়ম তাঁদের পালন করা দরকার। এখানে সেগুলি জানানো হল :

(১) কপির প্রথম পৃষ্ঠার উপরে বাঁ কোণে স্বাক্ষর করুন। সেইসঙ্গে লিখুন সম্পাদকীয় দফতরের যে-বিভাগের আপনি কর্মী তার নাম ও তারিখ।

(২) কপির মধ্যে যদি এমন কোনও অংশ থাকে, যা কম্পোজ করবার দরকার নেই (যথা, লেখকের স্বাক্ষর, বিভাগের নাম ও তারিখ), তবে তাকে একটা বৃত্তের মধ্যে রাখুন।

(৩) কপি সংশোধনের জন্য জায়গা রাখা চাই। প্রতি পৃষ্ঠার বাঁ দিকে লম্বালম্বিভাবে এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ছেড়ে দিন।

(৪) একাধিক-পৃষ্ঠাব্যাপী কপির ক্ষেত্রে শেষ পৃষ্ঠার আগে পর্যন্ত, লেখা যে শেষ হয়নি তা বোঝাবার জন্য, প্রতি পৃষ্ঠার নীচে এই চিহ্ন দিন \\

(সেইসঙ্গে লিখুন MTF, অর্থাৎ more to follow)।

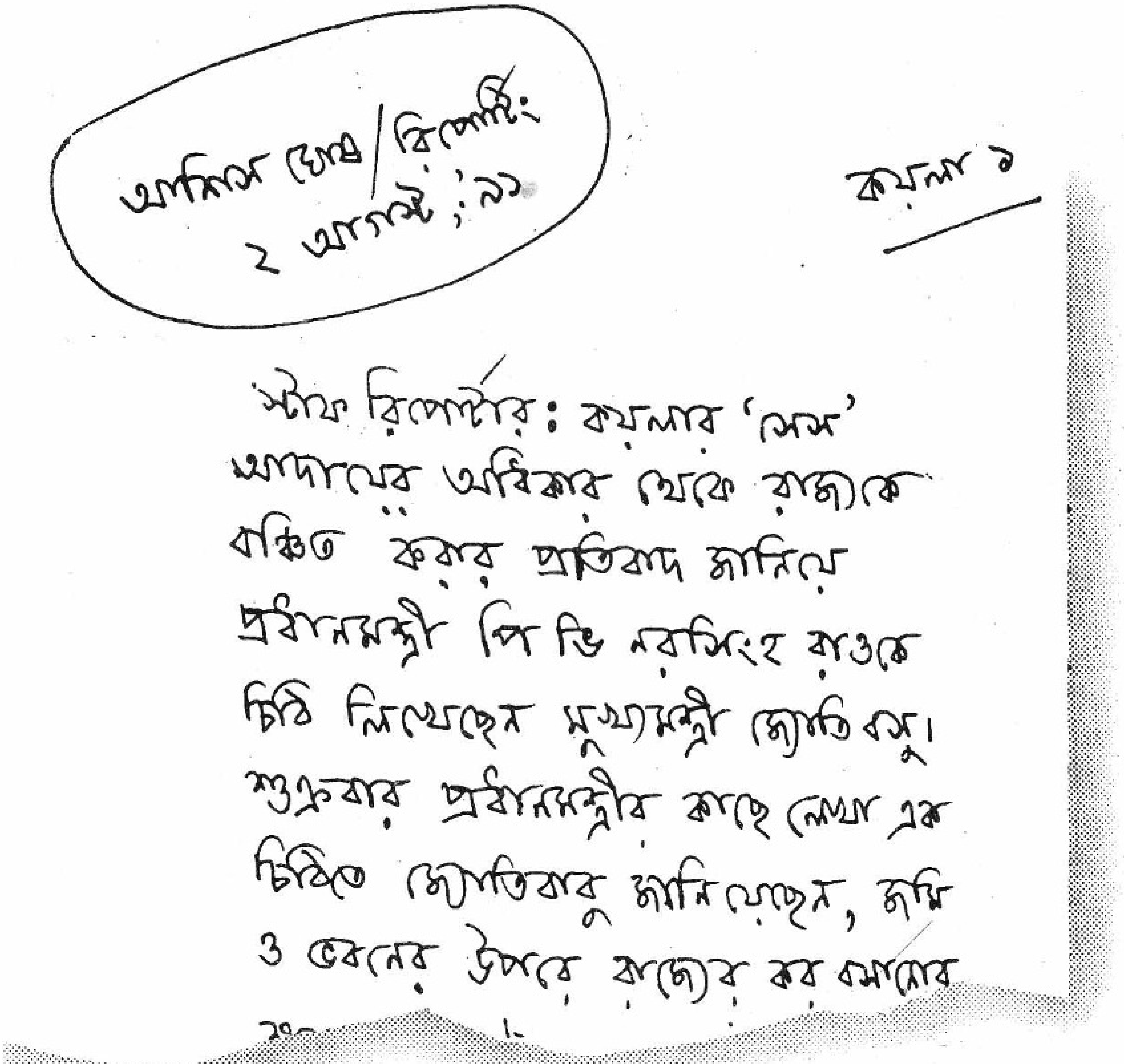
(৫) যে-পৃষ্ঠায় কপি শেষ হল, সেখানে লেখার নীচে এই চিহ্ন দিন # (এটি সমাপ্তিসূচক চিহ্ন)।

(৬) কালো, নীল কিংবা নীল-কালো কালিতে কপি লিখুন।

(৭) হস্তাক্ষর স্পষ্ট হওয়া চাই। বিশেষত, বিদেশি শব্দ ব্যবহারের সময় হস্তাক্ষর আদৌ অস্পষ্ট হওয়া চলবে না।

(৮) কাগজের এক পৃষ্ঠায় কপি লিখুন, অন্য পৃষ্ঠা সাদা থাকবে।

(৯) কপি একাধিক পৃষ্ঠার হলে প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরে ডান কোণে বিষয়ানুযায়ী ক্যাচলাইন দিন। যথা, কয়লা-১, কয়লা-২...


আশিস ঘোষ / রিপোর্টিং:
২ আগস্ট ;৯১

কয়লা ১

স্টাফ রিপোর্টার: কয়লার 'সেস' আদায়ের অধিকার থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা এক চিঠিতে জ্যোতিবাবু জানিয়েছেন, জমি ও ভবনের উপরে রাজ্যের কর বসানোর

ক

লিখুন	লিখবেন না
কচুরি	কচুরী
কবজি, কব্জি	কবজী, কব্জী
কবুলতি	কবুলতী
কমা ('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
কমিউনিজম	কম্যুনিজম
কমিউনিস্ট	কম্যুনিষ্ট, কম্যুনিস্ট
কয়েদি	কয়েদী
করণিক	করনিক
কর্মচারিগণ	কর্মচারীগণ
কর্মচারিবৃন্দ	কর্মচারীবৃন্দ
কর্মচারিসমিতি	কর্মচারীসমিতি
কর্মচারী	কর্মচারি
কশা ('চাবুক' অর্থে)	কষা
কষা (কষায় স্বাদ অর্থে, অথবা সাঁতলানো অর্থে, যথা, কষা মাংস)	কশা
কাউকে	কাওকে, কারুকে, কারোকে
কাঁকন	কাঁকণ
কাকলি	কাকলী
কাকি ('কাকার স্ত্রী' অর্থে)	কাকী
কাঙ্ক্ষিত	কাঙ্খিত
কাচ	কাঁচ
কাছারি	কাছারী
কাটারি	কাটারী
কাফ্রি	কাফ্রী
কাবুলি	কাবুলী
কারও	কারু, কারুর, কারো, কারোর
কারবারি	কারবারী

ক

লিখুন	লিখবেন না
কারিগরি	কারিগরী
কালোবাজারি	কালোবাজারী
কি (কিংবা শব্দের সংক্ষেপিত রূপ হিসাবে, অথবা হ্যাঁ/না বললেই যেখানে প্রশ্নের উত্তর হয়)	কী
কি না ('কিংবা নয়', 'কিংবা না' ও 'কিংবা নাই' অর্থে)	কিনা
কিনা (কথার মাত্রা বা 'যেহেতু' অর্থে)	কি না
কিম্ভূত	কিম্ভুত
কী (হ্যাঁ/না বললে যেখানে প্রশ্নের উত্তর হয় না, এবং ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ হিসাবে)	কি
কুকরি	কুকরী
কুঠি	কুঠী
কুচ্ছিত	কুচ্ছিৎ
কুৎসিত	কুৎসিৎ, কুতসিৎ, কুতসিত
কুত্রাপি	কুত্রাপিও
কুমির	কুমীর
কুস্তিগির	কুস্তিগীর
কূজন	কুজন
কূটনীতি	কুটনীতি
কৃচ্ছ্র	কৃচ্ছ্রতা
কৃতজ্ঞ	সকৃতজ্ঞ
কৃতি (কাজ—সাধারণত প্রশংসনীয় কাজ)	কৃতী
কৃতী (প্রশংসনীয় কাজটা যিনি করেছেন)	কৃতি
কৃশানু	কৃশাণু
কেরানি	কেরাণি, কেরাণী, কেরানী
কেক	কেইক
কৈফিয়ত	কৈফিয়ৎ

ক

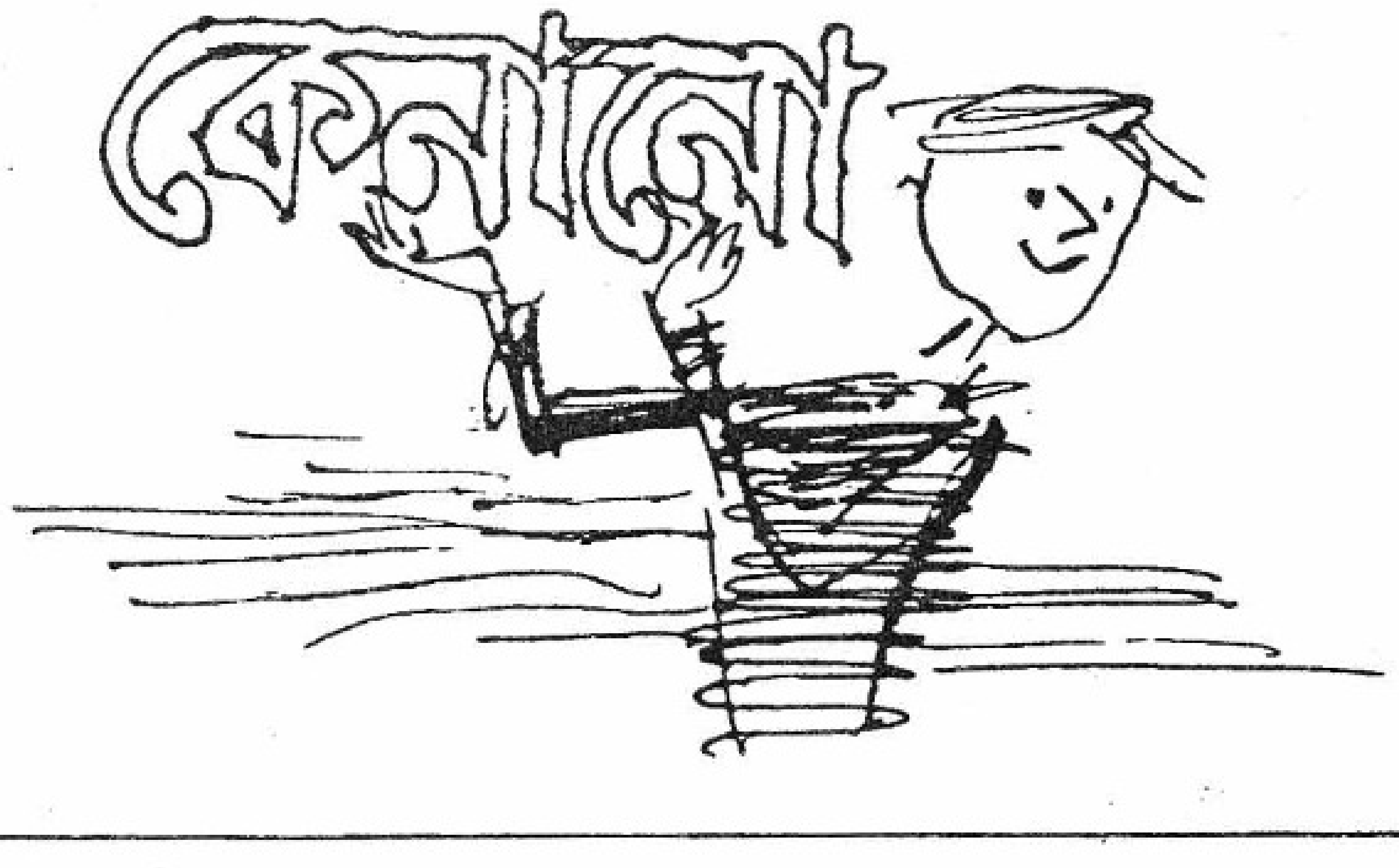
লিখুন	লিখবেন না
কোটেশন ('উদ্ধৃতি-চিহ্ন বা কোটেশন-মার্ক' দেখুন)	—
কোনও	কোনো
কোম্পানি	কোম্পানী
কোলন ('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
ক্রস	ক্রশ
ক্রসিং	ক্রশিং
ক্লাস	ক্লাশ
ক্ষুব্ধ	ক্ষুব্দ

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

কিনছ (কিনিতেছ)	কিনছো
কিনছিল (কিনিতেছিল)	কিনছিলো
কিনত (কিনিত)	কিনতো
কিনব (কিনিব)	কিনবো
কিনল (কিনিল)	কিনলো
কিনিয়েছিল (কিনাইয়াছিল)	কিনিয়েছিলো
কিনিয়ো (ক্রয় করাইয়ো ; ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	কিনিও
কিনেছিল (কিনিয়াছিল)	কিনেছিলো
কিনো (ক্রয় করিয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	কিন

ক

লিখুন	লিখবেন না
কেনাও (ক্রয় করাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ক্রয় করাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
কেনাচ্ছ (ক্রয় করাইতেছ)	কেনাচ্ছো
কেনাচ্ছিল (ক্রয় করাইতেছিল)	কেনাচ্ছিলো
কেনাত (ক্রয় করাইত)	কেনাতো
কেনান (ক্রয় করান, ক্ষেত্র বিশেষে ক্রয় করাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	—
কেনানো (ক্রয় করানো)	—
কেনাব (কিনাইব)	কেনাবো
কেনাল (ক্রয় করাইল)	কেনালো
কেনো (ক্রয় করো, ক্ষেত্র বিশেষে ক্রয় করাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	কেন



খ

খই। **'খৈ'** না লিখে **'খই'** লিখুন। (তুলনীয় : 'কই', 'থই', 'দই'।)

খঞ্জনি। এই বানান লিখুন ; **'খঞ্জনী'** লিখবেন না।

খটাশ। বানানে 'দন্ত্য স' ব্যবহার করবেন না।

খত। অর্থ : 'চিঠি', 'দলিল', 'স্বীকৃতিপত্র' ইত্যাদি। 'খণ্ড-ত' ব্যবহার করবেন না।

খদির। অর্থ : 'খয়ের'। **'খদীর'** লিখবেন না।

খপ্পর। অর্থ : 'কবল' বা 'ফাঁদ'। কারও খপ্পরে পড়া মানে কারও কবলিত হওয়া বা কারও ফাঁদে পড়া। শব্দটা সংস্কৃত 'খর্পর' থেকে এসেছে, যার অর্থ অবশ্য অন্য।

খবর। দৈনিক পত্রিকার দফতরে নানা সূত্রে যত খবর এসে পৌঁছয়, ছাপা হয় তার অতিক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশমাত্র। কোনও বিশেষ পত্রিকা সম্পর্কে এ-কথা বলা হচ্ছে না, সমস্ত কাগজ সম্পর্কেই এ-কথা অল্পবিস্তর সত্য।

যে-সব খবর ছাপা হয়, তারও সবটাই যে সর্বক্ষেত্রে ছাপা হয়, এমন বলা চলে না। যে-সব খবর ছাপার জন্য বাছাই করা হয়েছে, তার সবটাই যে জরুরি তা তো নয়, তারও কিছু-না-কিছু ডালপালা থাকে, যা ছাঁটাই করলে মূল খবরের কোনও ক্ষতি হয় না। সুতরাং খবর বাছাইয়ের পরে চলে তার ঝাড়াই-পর্ব। নির্বাচিত সংবাদগুলির যে-অংশ অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়, এই ঝাড়াই-পর্বে তা বাদ পড়ে যায়।

খবর বাছাই করা হয় গুরুত্ব অনুযায়ী। কোন কোন খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আসবে, তাও তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। আপন পাঠকমণ্ডলীর আগ্রহ, চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে সব কাগজেরই একটা মোটামুটি ধারণা থাকে, এবং তারই উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে কোন কাগজ কোন খবরকে কতটা গুরুত্ব দেবে। তা ছাড়া একটি কাগজের সেই সময়কার নীতির উপরেও সেটা নির্ভরশীল। নীতি পালটালে গুরুত্ববিচারের মাপকাঠিও পালটায়।

কিছু খবর অবশ্য সব কাগজের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রভুত্বের অবসান, কুয়েতে ইরাকি আক্রমণ, দেশের প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল, কেন্দ্রীয় সরকারের পরাজয়, কেন্দ্রে নূতন সরকার গঠন—এমন কোনও কাগজের কথা কল্পনা করাই শক্ত, এই ধরনের ঘটনার খবর যেখানে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল হরফের হেডলাইন পাবে না। বস্তুত, এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনার খবর—দলমতনীতিনির্বিশেষে—এ-দেশের প্রায় প্রতিটি কাগজেই আট-কলাম-জোড়া ব্যানার হেডলাইন পেয়েছিল।

খ

অন্য দিকে, একটি রাজ্যের কাছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অন্য একটি রাজ্যের কাছে সেই ঘটনার তেমন-কিছু গুরুত্ব না-ও থাকতে পারে। না-থাকার কারণ, এই রাজ্যের জনজীবনে প্রচুর আগ্রহ জাগালেও সেই ঘটনাটি হয়তো আর-একটি রাজ্যের জনজীবনে আদৌ আগ্রহ জাগাবে না। কোনও-কোনও ঘটনার আবেদন সার্বজনিক, আঞ্চলিক সীমানাকে তা অক্লেশে অতিক্রম করে। অন্য দিকে, এমন ঘটনাও কম ঘটে না, যার আবেদন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই দুই ধরনের ঘটনার উপরেই সাংবাদিককে সমান নজর রাখতে হয়। এর দ্বারা কিন্তু এমন কথা বোঝানো হচ্ছে না যে, ভারতবর্ষের বিশেষ কোনও একটি রাজ্য থেকে যে-কাগজ প্রকাশিত হয়, তার বার্তা-বিভাগ অন্যান্য রাজ্যের ঘটনাবলির উপরে নজর রাখবেন না। না, তা নয়। তবে যেখান থেকে কাগজটি প্রকাশিত হচ্ছে, সেই রাজ্যের ঘটনাবলি যে অন্যান্য রাজ্যের ঘটনার তুলনায় সেই কাগজে বেশি গুরুত্ব পাবে, এটাই স্বাভাবিক।

ধরা যাক, একই দিনে ঘটল একই ধাঁচের, একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা। একটি পশ্চিমবঙ্গে, অন্যটি মহারাষ্ট্রে। সে-ক্ষেত্রে যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কোনও পত্রিকায় কর্মরত, তিনি মহারাষ্ট্রের ঘটনার তুলনায় এ-রাজ্যের ঘটনাটিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। কেননা, তিনি জানেন যে, গুরুত্ব একই রকমের হওয়া সত্ত্বেও, এ-রাজ্যের ঘটনাটি এখানকার মানুষদের জীবনকে যতটা আলোড়িত করবে, মহারাষ্ট্রের ঘটনাটি ততটা করবে না।

অর্থাৎ কিছু ঘটনার গুরুত্ব রাজ্যনির্বিশেষে সর্বত্র সমান। আবার কিছু ঘটনার গুরুত্ব নির্ভর করে সেটা কোথায় ঘটছে, তার উপরে। এই কারণেই দেখা যায় যে, একই কাগজের বিভিন্ন সংস্করণ যখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রকাশিত হয়, তখন তার যে-সংস্করণ যে-রাজ্য থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সংস্করণে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সেই রাজ্যের ঘটনাবলি। একই দিনের 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' কি 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর দুটি সংস্করণ মিলিয়ে দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

প্রায়ই দেখা যায়, কোনও একটি কাগজে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর বেরিয়েছে, যা অন্য কাগজে নেই। এগুলি 'এক্সক্লুসিভ' খবর, যা ওই পত্রিকার নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত। এই ধরনের খবর নানা কাগজে মাঝেমধ্যে বার হয়। তবে, যে-পত্রিকার সংবাদ-সংগ্রাহকদের উদ্যোগ যত বেশি, সেই কাগজে এক্সক্লুসিভ খবর তত বেশি বার হবে, এটাই প্রত্যাশিত। যাকে আমরা 'স্কুপ' বলি, তাও আসলে এক্সক্লুসিভ খবরই।

বিভিন্ন এজেন্সি থেকে পাঠানো বড়-বড় খবর কিন্তু সব কাগজই পায়।

তার উপরে তাই খর নজর রাখা দরকার। এজেন্সি কোনও বড় খবর দিল, অথচ সমস্ত কাগজে বার হওয়া সত্ত্বেও একটি কাগজে তা নেই, এমন হলে বুঝতে হবে, এজেন্সির দেওয়া খবরের উপরে সেই কাগজের বার্তা-বিভাগের সতর্ক নজর ছিল না। কাগজ এর ফলে মার খায়, তার সম্পর্কে পাঠকদের আস্থা থাকে না।

দৈনিক কাগজগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত হয় বড়-বড় শহর থেকে। কিন্তু ঘটনা যে শুধু শহরেই ঘটে, তা নয়, ঘটে মফস্বলেও। মফস্বল অঞ্চলকে তাই অবহেলা করবেন না। সেখানেও রয়েছেন দৈনিক পত্রিকার অসংখ্য পাঠক, এবং—শহরের জীবনের মতোই—মফস্বল-জীবনেরও রয়েছে অসংখ্য সমস্যা। সে-সব সমস্যার কথা কাগজে বার হয় না, এমন ধারণার কারণ না ঘটে। মফস্বলের খবরও কাগজে নিয়মিত থাকা চাই।

কিন্তু কাকে বলে খবর ? ইংরেজিতে এই রকমের একটা কথা আছে যে, কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা খবর হয় না, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে তবেই সেটা খবর। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, খবরের এই যে পরিহাসবিজড়িত বর্ণনা, এতে জোর পড়ছে এমন ঘটনার উপরে, যা অপ্রত্যাশিত, যা পাঠককে চমকে দেয়।

কথাটাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে তাই গ্রহণ করবেন না। বস্তুত, কুকুর মানুষকে কামড়ালেও সেটা ছাপার মতো খবর হতে পারে, যদি (১) বিখ্যাত কোনও মানুষকে কুকুরে কামড়ায়, অথবা যদি (২) দশটা মানুষকে কোথাও একই দিনে রাস্তার কুকুরের কামড় খেতে হয়। (জলাতঙ্ক সম্পর্কে আশঙ্কার কারণেই দ্বিতীয় ঘটনাটা খবর হয়ে উঠবে।)

সংবাদের উপরে মন্তব্য করার জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধকারেরা আছেন, ভাষ্যকারেরা আছেন, তা ছাড়া আছেন নিয়মিত কলামের লেখকেরা। ও কাজ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের নয়। প্রতিবেদন বা রিপোর্ট মন্তব্যবর্জিত হবে। প্রতিবেদকের কাছে এটাও প্রত্যাশিত যে, তিনি পারতপক্ষে এমন কোনও বিশেষণ ব্যবহার করবেন না, তাঁর রচনাকে যার ফলে পক্ষপাতদুষ্ট বা অভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়।

খবর, সূচনা। খবর ও প্রতিবেদনের যেটা একেবারে মুখপাত বা সূচনাংশ, তাকে ব্রিটেনে বলা হয় 'ইনট্রো', আমেরিকায় 'লিড'। খবরের বাদবাকি অংশের তুলনায় এটির গুরুত্ব বেশি। তার কারণ, এটির দ্বারা আকৃষ্ট হলে তবেই একজন পাঠক গোটা খবরটি পড়তে উৎসাহী হবেন, অন্যথায় তিনি চোখ ফেরাবেন অন্য খবরের দিকে। সেই বিচারে বলা চলে, ইনট্রোই অনেক ক্ষেত্রে অনেক খবরের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

খ

ইনট্রো হবে সহজ, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। যেন চোখ বুলোবামাত্র বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা আসলে কী। যে-ইনট্রো কাঠিন্য, অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতার কারণে পাঠকের বিরক্তি ঘটায়, কিংবা একবার পড়ে যার অর্থ উপলব্ধি করা যায় না, বুঝতে হবে যে, ইনট্রো হিসাবে তা তার ভূমিকা পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। বিদেশের এক বিখ্যাত সাংবাদিক জানাচ্ছেন, তাঁর কর্মজীবনের চল্লিশ শতাংশ কেটেছে স্রেফ ইনট্রো রচনা ও সংশোধনের কাজে। কথাটা মনে রাখুন, এবং ইনট্রোকে সেই গুরুত্ব দিন, যা তার প্রাপ্য।

ইনট্রো হচ্ছে খবরের প্রথম অনুচ্ছেদ। সেটি ঠিকমতো লেখা হল কি না, তা কীভাবে বোঝা যাবে ? উপায় মাত্র একটাই। অনুচ্ছেদটির উপরে চোখ বুলিয়ে যদি মনে হয় যে, পাঠক এই প্রথম অনুচ্ছেদ পড়েই দমে যাবেন না, বরং উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিও পড়তে চাইবেন, একমাত্র তা হলেই ওই প্রথম অনুচ্ছেদটি ইনট্রো হিসাবে সফল, নইলে নয়।

ইনট্রো যথাসম্ভব ছোট হবে। যেমন কাঠিন্য, অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা, সূচনাংশের দৈর্ঘ্যও তেমনই পাঠকের বিরক্তি ঘটায়। সুতরাং ইনট্রো সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হবে। কতটা সংক্ষিপ্ত ? পাশ্চাত্যের নানা কাগজে ইনট্রোর ঊর্ধ্বতম শব্দসংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়। যাঁরা অত বাঁধাবাঁধির কড়াকড়ি পছন্দ করেন না, তাঁরাও কিন্তু বলেন যে, তিরিশ থেকে চল্লিশটি শব্দই যথেষ্ট। এর চেয়ে কম শব্দেও অবশ্য চমৎকার সব ইনট্রো অনেকে লিখেছেন। আবার শব্দসংখ্যা চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশে পৌঁছলেই যে সে-ইনট্রো বাতিল, এমনও বলা যাবে না। আসলে, কথাটাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে, শব্দসংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখাটাই সুবুদ্ধির কাজ।

শুধু ছোট হলেই কিন্তু চলবে না। ইনট্রো ছোট হবে অবশ্যই। আবার, যতই ছোট হোক, মূল ঘটনা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণাও ইনট্রো থেকে হওয়া চাই। এই যে দু'-দুটো শর্ত, যুগপৎ একে মেটানোর মধ্যেই ইনট্রোর সার্থকতা।

১৯৯১ সালের ১৭ মার্চ তারিখের একটি ঘটনার কথা বলি। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে সেদিন নদিয়ার তেহট্ট থানার দেবনাথপুর বাজারে এগারো ব্যক্তির মৃত্যু হয়। জখমও হন অনেকে। যিনি এই ঘটনার প্রতিবেদন লিখবেন, তাঁর লেখার সূচনাংশ যদি হয় :

এগারো ব্যক্তি গুলিতে নিহত

তা হলে কি একে সার্থক বা অব্যর্থ ইনট্রো বলা চলবে ? না, তা চলবে না।

খ

কারণ, সূচনাংশকে ছোট রাখার শর্তটিকে তিনি এখানে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় মিটিয়েছেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি পালন করেননি। অর্থাৎ, মূল ঘটনা সম্পর্কে কোনও ধারণা এই ইনট্রো থেকে হচ্ছে না। সে ব্যাপারে বিস্তর ফাঁকফোকর এখানে থেকে যাচ্ছে। সেই ফাঁকফোকরগুলি ভরাট করা দরকার। তা করেও খুবই অল্প কথায় এই প্রতিবেদনের ইনট্রো লেখা যেতে পারে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় এই ঘটনার যে প্রতিবেদন বার হয়েছিল (১৮ মার্চ, ১৯৯১) তার ইনট্রোটি এবারে দেখা যাক :

তেহট্ট (নদিয়া), ১৭ মার্চ—নদিয়া তেহট্ট থানার দেবনাথপুর বাজারে আজ ভোরে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বি এস এফ)-র গুলিতে ১১ জন গ্রামবাসী নিহত হন। বি এস এফের তিন জওয়ান-সহ আহত হন ১১ জন। ডাকাতির অভিযোগে একটি দোকানঘরের মধ্যে বি এস এফের জওয়ানদের আটকে রেখেছিলেন গ্রামবাসীরা। সেই জওয়ানদের 'উদ্ধার' করতে বি এস এফের একটি দল সকালে ঘটনাস্থলে আসে। তার পরেই, সকাল সাতটা নাগাদ, হাটের মধ্যে বি এস এফের লোকেরা নির্বিচারে গুলি চালায়। তেহট্ট থানা এলাকায় আজ বন্‌ধ পালিত হয়। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে দেবনাথপুর থেকে বি এস এফকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এটিকেও যে সুলিখিত ইনট্রো বলা যাচ্ছে না, তার কারণ, দ্বিতীয় শর্তটিকে মেটাতে গিয়ে পেণ্ডুলামকে এখানে একেবারে বিপরীত প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলত, প্রথম শর্তটি এখানে আদৌ মেটেনি। খবরের ফাঁকফোকর ভরাট করতে গিয়ে এমন সব তথ্য এই ইনট্রোর মধ্যে ঠাসা হয়েছে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে অনেকাংশে চালান করে দেওয়া যেত, অন্তত ইনট্রোর মধ্যে যা ঢোকানোর কোনও দরকারই ছিল না। কিন্তু ঢোকানো হয়েছে, এবং বেঢপ সাইজের এই ইনট্রোর শব্দসংখ্যা তার ফলে সত্তরকেও ছাড়িয়েছে।

অথচ এর অর্ধসংখ্যক শব্দের সাহায্যেও এই ইনট্রোটি এমনভাবে লেখা যায়, মূল খবর সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা করে নেওয়া যাতে শক্ত হয় না। কীভাবে লেখা যায়, দেখুন :

তেহট্ট (নদিয়া), ১৭ মার্চ—সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে এখানকার দেবনাথপুর বাজারে আজ ১১ ব্যক্তি নিহত হন। ডাকাতির অভিযোগে এই বাহিনীর কয়েকজন জওয়ানকে আটকে রাখা হয়েছিল। বাহিনীর অন্য একদল জওয়ান এসে তাদের উদ্ধার করে। তারপরেই তারা গ্রামবাসীদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালায়।

লক্ষ করুন, খবরের যেটা সারাংশ, কিংবা, বলা যায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

অংশ, শুধু সেটাই রাখা হয়েছে এই ইনট্রোতে। যে-অংশের গুরুত্ব তুলনায় কিছুটা কম, তা যে একেবারে ছাঁটাই হয়ে গেল, তা নয়, তবে এই সূচনাংশে তাকে রাখা হয়নি, সে-অংশ পরবর্তী অনুচ্ছেদে যাবে। নিহতের সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, আহতের সংখ্যা পরে গেলেও ক্ষতি নেই। ঘটনা যে সকালবেলার, সেটা আছে, কিন্তু সময় যে 'সাতটা নাগাদ' সেটা পরে জানালেও ক্ষতি হবে না। (বস্তুত, সময়টা সাতটা অথবা সাতটা পাঁচ, আদালতের সওয়াল-জবাবে তার গুরুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু কাগজের পাঠকের কাছে সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।) যেমন বন্‌ধ, তেমন ঘটনাস্থল থেকে রক্ষিবাহিনীর অপসারণও মূল ঘটনা নয়, ও-সবই আসলে তার জের। ফলত, ইনট্রো থেকে সরিয়ে নিয়ে ও-সব খবরও পরবর্তী অংশে চালান করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রেই ইনট্রো অত্যধিক দীর্ঘ হয়ে যায় একটা পুরনো নীতির প্রতি আসক্তির দরুন। নীতিটা কী ? না 'কে কী কেন কবে ও কোথায়', ইনট্রোর মধ্যেই এই পাঁচটা প্রশ্নের জবাব ঠেসে দিতে হবে। এ-কালের সাংবাদিকরা কিন্তু এই পুরনো নীতি বর্জন করেছেন। তাঁরা বলেন, খবরের যেটা সবচেয়ে জরুরি অংশ, তারই দিকে নজর রেখে এমনভাবে ইনট্রো লেখা উচিত, খবরের বাদবাকি অংশ সম্পর্কেও যাতে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তোলা যায়। পাঁচটা প্রশ্নের কোনওটাকেই যে তাঁরা অবজ্ঞা করেন, তা নয়, কিন্তু একইসঙ্গে বলেন যে, তাবৎ প্রশ্নের উত্তর ইনট্রোতে ঠেসে দেবার দরকার নেই। যে-সব উত্তর পরে দিলেও চলে, তা পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেওয়াই ভাল।

ইনট্রোতে 'কে বলছেন'-এর চেয়ে 'কী বলছেন' সাধারণত বেশি গুরুত্ব পায়। তাই, যা বলা হচ্ছে, ইনট্রোতে সাধারণত সেটাই প্রথমে আসবে। যিনি বলছেন, তাঁর নামটা পরে। এই রীতি কীভাবে লঙ্ঘিত হয়, একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যাবে :

সীতামারি, ২৫ মার্চ—প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর আজ বলেছেন, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই পটেলকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার অধিকার সমাজবাদী জনতা দলের হাইকমান্ড দেয়নি। ...

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ মার্চ ১৯৯১)

দেখা যাচ্ছে, এখানে বক্তার নাম আগে এসেছে, বক্তব্য পরে। এটা ইনট্রো লেখার সাধারণ রীতি নয়। সাধারণ রীতি অনুযায়ী লিখতে হলে এই একই খবরকে কীভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, দেখুন :

সীতামারি, ২৫ মার্চ—আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা

করবেন, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই পটেলকে সমাজবাদী জনতা দলের হাইকমান্ড এমন অধিকার দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর আজ এ-কথা জানান।...

খবরই মুখ্য, সূত্র গৌণ। কোনও খবর যে-সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কিংবা যেখানে ও যে-পরিবেশে ঘটেছে কোনও খবর-হবার-মতো ঘটনা, তাকেই মুখ্য করে তোলাটা একটা ব্যাধিবিশেষ। ইংরেজিতে বলে 'সোর্স অবসেশন', আমরা বলতে পারি 'সূত্ররোগ'। এই রোগে যাঁরা আক্রান্ত, তাঁদের লেখা ইনট্রোতে খবরকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সূত্রটাই সামনে এসে দাঁড়ায়। ইনট্রো লিখবার সময় এই বিপদের কথাটা মনে রাখুন, এবং খবরকেই নিয়ে আসুন সামনে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধরা যাক, রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বেতন সর্বস্তরে বাড়বে। যত বড় সূত্র থেকেই এই খবরটা আপনি পেয়ে থাকুন না কেন, সূত্রের চেয়ে খবরের মূল্য যেহেতু বেশি, তাই বেতন যে বাড়ছে, এটাকেই আপনি ইনট্রোর একেবারে প্রথমে নিয়ে আসুন। সূত্র গৌণ, সেটা এর পরে আসবে।

কিংবা, ধরা যাক, কলকাতা পুরসভা স্থির করেছেন যে, শহরে আপাতত চারতলার চেয়ে বেশি উঁচু বাড়ি তুলবার অনুমতি তাঁরা দেবেন না। সে-ক্ষেত্রেও, চারতলার বেশি বাড়ি তোলা যে চলবে না, সেটাই হবে আপনার ইনট্রোর প্রথম কথা। কেননা, সিদ্ধান্তটাই তো খবর; যে-প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত, তার উল্লেখ পরে আসুক। পাঠক সিদ্ধান্তটাই আগে জানতে চান। কার সিদ্ধান্ত, কিংবা কোন সূত্রে সেটা আপনি পেয়েছেন, সেটা পরে জানালেও ক্ষতি নেই।

এই সহজ কথাটা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের ইনট্রোতে খবর নয়, সূত্র সময় পরিবেশ ইত্যাদি অগ্রাধিকার পায়। সোনা ফেলে তাঁরা আঁচলে গিঁট বাঁধেন। তাঁরা লেখেন, "মহাকরণে অর্থ-দফতরের এক উচ্চপদস্থ অফিসার আজ এই প্রতিবেদককে জানান..." কিংবা "কলকাতায় কয়েকটি বহুতল অট্টালিকা ধসে পড়বার পরে শহর জুড়ে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, পুরসভার বৈঠকে তা নিয়ে আজ তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয় যে..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু নয়। কোনও ইনট্রোই উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করবেন না। একে তো খবরের সূচনাতেই উদ্ধৃতিচিহ্ন বা কোট-মার্ক থাকাটা বিসদৃশ, তার উপরে আবার কার কথা থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, সেটা না জানা পর্যন্ত উদ্ধৃত বাক্যটির গুরুত্ব যে খবর হিসাবে কতটা, তাও বুঝবার

উপায় নেই। বক্তার গুরুত্ব অনুযায়ী উদ্ধৃতির গুরুত্ব বাড়ে-কমে। দৃষ্টান্ত :

নয়াদিল্লি, ×××—"পাকিস্তান যা-ই করুক ও তার কার্যকলাপে যতই প্ররোচনা থাক, ভারত কিছুতেই পরমাণু-বোমা বানাবে না।" আজ এখানে এক জনসভায় ভারতের...

ভারতের কে ? কোনও ধর্মীয় সংগঠনের নাতিবিখ্যাত নেতা, অথবা কোনও আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলনের মুখপাত্র ? এই ঘোষণা সে-ক্ষেত্রে বড় খবর হওয়ার গুরুত্ব পাবে না, মামুলি খবর হিসাবে ভিতরের পাতায় ছাপা হবে। আদৌ ছাপা না হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু বক্তা যদি হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ? সে-ক্ষেত্রে এই ঘোষণা নিশ্চয় যৎপরোনাস্তি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হবে। পরদিনের কাগজে এটা প্রথম খবর হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

তবে সে-ক্ষেত্রেও এই খবরের ইনট্রো উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে শুরু হবে না। ইনট্রো হবে এইরকম :

নয়াদিল্লি, ×××—ভারত কিছুতেই পরমাণু-অস্ত্র বানাবে না। এই ঘোষণা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর। আজ এখানে এক জনসভায় তিনি বলেন যে, পাকিস্তান...

ইনট্রো ও টেলিগ্রাম। ঘটনার বিবরণ যেখানে বিস্তারিত, সেখানে তার ভিতর থেকে আসল খবরটুকু খুঁজে নিতে হয়, এবং তাকেই দিতে হয় অগ্রাধিকার। সেটা কী করে করা যাবে ? টেলিগ্রামের কথা ভাবুন। বাড়িতে বাড়াবাড়ি অসুখ চলছে, আগের ডাক্তারের ওষুধে কাজ না-হওয়ায় শহর থেকে বড় ডাক্তার আনানো হয়েছে, পুরনো প্রেসক্রিপশন পালটে তিনি আবার নতুন করে বিধানপত্র লিখে দিয়েছেন, কিন্তু রোগী যে বাঁচবেনই, এমন ভরসা তিনিও দিতে পারছেন না। এদিকে রোগীর বড় ছেলে রয়েছে প্রবাসে, তার কর্মস্থলে। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাকে আনানো দরকার। তো সেই টেলিগ্রামের বয়ানটা কী হবে ? তাতে তো আর ডাক্তার পালটানো, শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসা, পুরনো প্রেসক্রিপশন বাতিল হওয়া, নতুন বিধানপত্র, এত সব খবর ঢোকানো যাবে না। টেলিগ্রামে জানাতে হবে শুধু সেইটুকু, যা সবচেয়ে জরুরি, এবং যা না জানালেই নয়। এই যেমন : 'ফাদার সিরিয়াসলি ইল, কাম শার্প।'

খবরের সূচনাংশ লেখার সময়েও এইভাবে চিন্তা করুন। বিস্তারিত বিবরণের ভিতর থেকে নিষ্কাশন করে নিয়ে যাকে অগ্রাধিকার দেবেন, খবরের সেই সারাংশ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ভেবে নিন যে, পাঠককে যদি টেলিগ্রাম করে জানাতে হত, তা হলে এর কতটুকু আপনি জানাতেন। যেটুকু জানাতেন, সেইটুকুই সারাংশ। এবারে তাকে স্বাভাবিক ভাষার

সৌকর্যে মণ্ডিত করার পরে যা দাঁড়াল, সেটাই আপনার ইনট্রো হোক।

এই নিয়ম কি সর্বদা পালিত হয় ? অনেক সময়েই হয় না। যে-কথা দ্বিতীয় বাক্যে বলা উচিত, তা প্রথম বাক্যে ঢুকে পড়ে। যে-কথা দ্বিতীয় কি তৃতীয় অনুচ্ছেদে গেলে ক্ষতি নেই, তাও ইনট্রোর মধ্যে এসে ভিড় বাড়ায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

স্টাফ রিপোর্টার : গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ—দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে সভাপতির নামে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য কেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে অ গ প-র কার্যনির্বাহক কমিটি আজ 'বিরোধী' আট নেতাকে ১৫ দিনের সময় দিয়েছে। এদিন সকাল থেকে শুরু হওয়া অ গ প-র কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল সোমবারের 'সাধারণ সভা' বিক্ষুব্ধ নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। কেন্দ্রীয় কমিটি এদিন কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত কিন্তু নিতে পারেনি। দলের সভাপতি প্রফুল্ল মহন্ত বলেছেন, 'আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁদের সময় দেওয়া হল।'

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ মার্চ ১৯৯১)

এই যে ইনট্রো, এর দোষ একাধিক। প্রথমত, বিশেষ্যপদকে পিছনে ঠেলে সর্বনাম এখানে সামনে এসে হাজির হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই ইনট্রোর মধ্যে নাহক ঢোকানো হয়েছে প্রচুর তথ্য। ফলে এর আয়তনও হয়েছে ঢাউস। আশিরও-বেশি-শব্দ-সংবলিত এই ইনট্রো থেকে কিন্তু বিস্তর শব্দ পরবর্তী অনুচ্ছেদে চালান করা যায়। লেখা যায় :

স্টাফ রিপোর্টার : গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ—অসম গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি আজ বিরোধী আট নেতার কাছে জানতে চেয়েছেন, কেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কমিটির অভিযোগ, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে তাঁরা সভাপতির বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন।

ইনট্রো এখানেই শেষ হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খবর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আসবে।

বিলম্বিত সূচনা বা ডিলেড ইনট্রো। পাঠকের আগ্রহ যেখানে মূলত কোনও ঘটনার উপরে নিবদ্ধ, ঘটনার সারাংশকেই সেখানে সংবাদের সূচনাংশে আনতে হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হার্ড নিউজ', তার ইনট্রো লেখার এটাই রীতি। সরকারের পতন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা, প্রার্থী মনোনয়ন, ভোটের ফলাফল, যুদ্ধারম্ভ, দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড, বিমান ছিনতাই, রেল-দুর্ঘটনা, জাহাজডুবি—এই সব ঘটনা এবং এই ধরনের অন্যান্য তাবৎ ঘটনাই এই পর্যায়ে পড়ে। এ-সব ঘটনার ক্ষেত্রে খবরের যেটা সবচেয়ে

খ

জরুরি অংশ, পাঠকরা সেটাই সর্বাগ্রে জানতে চান। ফলে ইনট্রো লেখার সময়ে সেই অংশই পায় অগ্রাধিকার। এতক্ষণ আমরা যে-কয়েকটি ইনট্রোর দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তার সবই আসলে এই ধরনের খবরের ইনট্রো।

কিন্তু এ ছাড়াও থাকে অন্য ধরনের খবর (কিংবা খবর-ভিত্তিক রচনা), যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'সফ্‌ট নিউজ'। সংবাদপত্রে সাধারণত সেগুলি চলচ্চিত্র, পুস্তক-পরিচয় কি রবিবারের পৃষ্ঠায় (আনন্দবাজারের ক্ষেত্রে 'পত্রিকা'ংশেও বটে) প্রকাশিত হয় ; কখনও-কখনও 'অ্যাংকর' হিসাবে খবরের পৃষ্ঠাতেও চলে আসে। 'নির্বাচনী প্রেক্ষাপট' ও 'ভোটের ডায়েরি' হিসাবেও এই ধরনের খবর-ভিত্তিক রচনা আমরা ছাপা হতে দেখেছি। লক্ষ করুন, এ-সব রচনায় ঘটনার তুলনায় উপস্থাপন-রীতিকে কিছু কম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বরং, ঘটনাকে একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে উপস্থাপনের রীতি (কিংবা বলতে পারি রীতিগত চাতুর্য) এ-সব ক্ষেত্রে সামনে চলে আসে, এবং আমাদের নজর কেড়ে নেয়। যেটা মূল বিষয়বস্তু, অর্থাৎ যেটা খবর, সেটা কি এর ফলে মার খেয়ে যায় ? মোটেই না। বরং উপস্থাপনের ওই ভঙ্গিমাই আরও বেশি করে আমাদের টানতে থাকে মূল বিষয়বস্তুর দিকে।

একটি প্রতিবেদনের কথা মনে পড়ছে। জয়পুরের মহারানি গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে তাঁর সপত্নীপুত্র কর্নেল ভবানী সিংহের বিরোধ তার বিষয়বস্তু। বিরোধটা মূলত সম্পত্তির অধিকার নিয়ে। কিন্তু গোড়ায় সে-কথার উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিবেদনের ইনট্রো ছিল এই রকম :

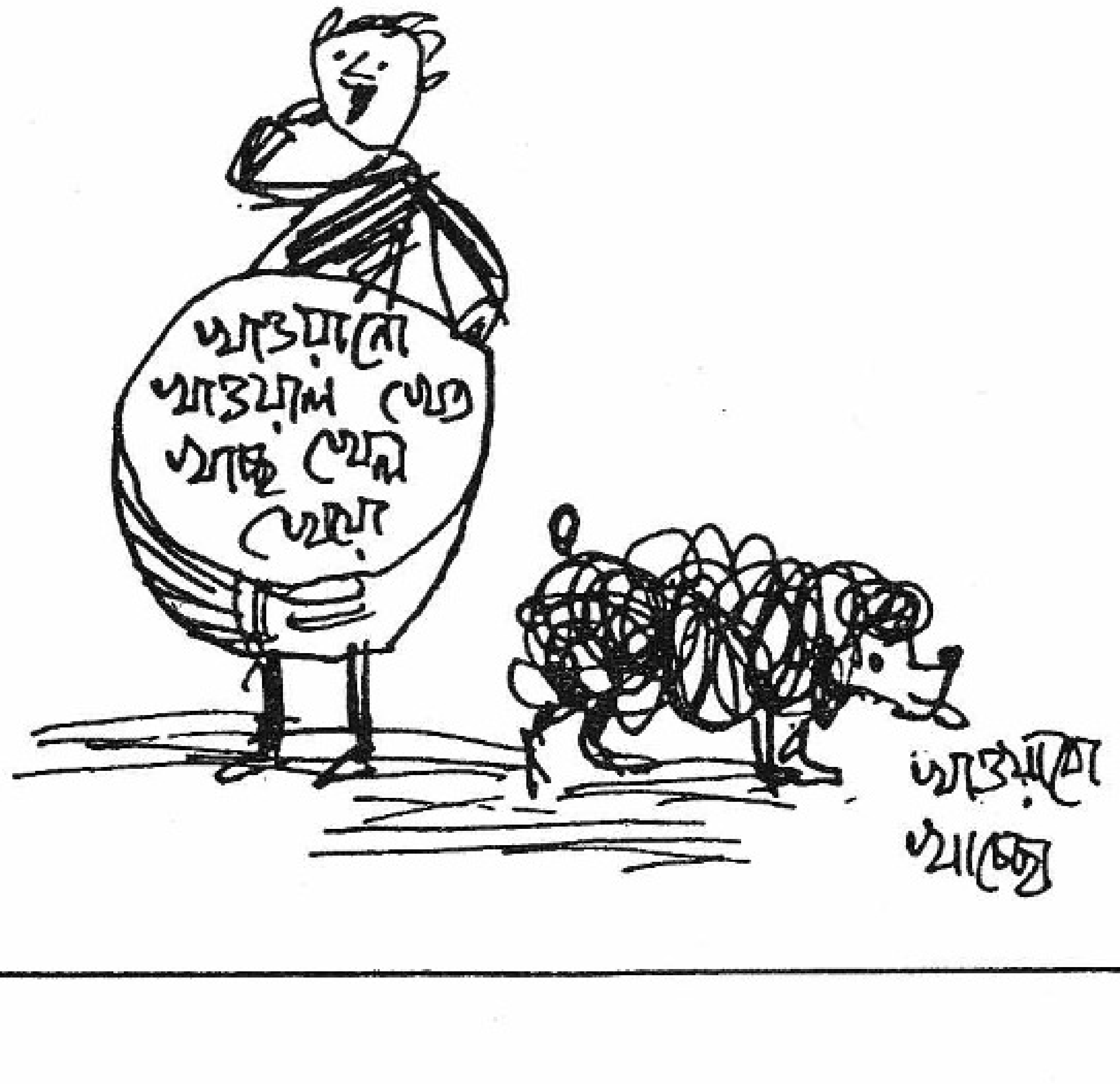
দু'জনের মধ্যে অনেক অমিল। এমন কী, তাঁদের রাজ্যের যা নাম, সেই জয়পুর শব্দটাকেও তাঁরা দু'জনে দু'ভাবে উচ্চারণ করেন।

ডিলেড ইনট্রোর এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। রচনার যা মূল বিষয়বস্তু, প্রতিবেদনের গোড়ায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু তা না-ই থাক, সূচনাংশ এ-ক্ষেত্রে এমন কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে যে, পাঠককে তা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কাদের অমিল, কী কী বিষয়ে অমিল, তা জানতে তিনি প্রলুব্ধ হন, এবং একেবারে অনিবার্যভাবেই তিনি ঢুকে পড়েন এই প্রতিবেদনের মধ্যে।

সূচনাংশ চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই। তা যেন পাঠকের আগ্রহকে উশকে দেয়। কথাসাহিত্যিক শংকর অবশ্য 'সূচনা' কিংবা 'সমাপ্তি' বলেন না। বলেন 'টেক অফ' আর 'ল্যান্ডিং'! যেমন বিমান-চালনা, তেমন লেখনী-চালনার ব্যাপারেও কিন্তু এ দুটোই সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার। আমরা এখানে সমাপ্তি নয়, সূচনার কথা ভাবছি। সূচনাই যদি না আগ্রহ জাগায়, তা হলে বুঝতে হবে, ডিলেড ইনট্রোর কৌশলটা আদৌ খাটেনি।

খ

লিখুন	লিখবেন না
খাওয়াব (খাওয়াইব)	খাওয়াবো
খাওয়াল (খাওয়াইল)	খাওয়ালো
খাচ্ছ (খাইতেছ)	খাচ্ছো
খাচ্ছিল (খাইতেছিল)	খাচ্ছিলো
খাব (খাইব)	খাবো
খেত (খাইত)	খেতো
খেল (খাইল)	খেলো
খেয়েছিল (খাইয়াছিল)	খেয়েছিলো
খেয়ো (ভোজন করিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	খেও



গ

গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় এই পদবিগুলির এই রূপই রক্ষা করুন। এদের বিকার ঘটাবেন না। অর্থাৎ 'গাঙ্গুলি' 'চ্যাটার্জি' 'ব্যানার্জি' ও 'মুখার্জি' লিখবেন না। ('নাম' দেখুন)

গণনা। অর্থ : 'গুনিবার কাজ', 'গোনা'। **'গননা'** লিখবেন না।

গণ্ডগোল। 'গণ্ড' বলতে যেমন 'গাল' বা 'কপোল' বোঝায়, তেমন বোঝায় 'বড়'ও। **'গণ্ডগোল'** সেই অর্থে 'বড় রকমের গোল'। চলতি অর্থ : 'চিৎকার', 'চেঁচামেচি', 'বিশৃঙ্খলা', 'হইচই'। **গণ্ডমূর্খ** = বড় মূর্খ বা একেবারেই নির্বোধ। প্রসঙ্গত **'গণ্ডগ্রাম'** কথাটাও মনে রাখুন। এর প্রকৃত অর্থ : 'বড় গ্রাম'। চলতি অর্থ কিন্তু এর বিপরীত।

গঁদ। 'চন্দ্রবিন্দু'র কথাটা ভুলে যাবেন না।

গনতকার। শব্দটার বানানে 'মূর্ধন্য ণ' ও 'খণ্ড ত' ব্যবহার করবেন না। **'গণৎকার', 'গণতকার'** অথবা **'গনৎকার'** লেখার অভ্যাস বর্জন করুন।

গরিব। ঈ-কার ব্যবহার করবেন না।

গরীয়সী। দুটি ঈ-কারের দরকার হচ্ছে, এটা মনে রাখুন। (তুলনীয় বানান : পটীয়সী, পাপীয়সী, মহীয়সী, সমীচীন, হরীতকী।)

লিখুন	**লিখবেন না**
গাণ্ডিব	গাণ্ডীব
গান্ধীজি	গান্ধীজী
গিন্নি	গিন্নী
গির্জা	গীর্জা
গুনিন	গুণিন
গুপ্ত	গুপ্তা
(গোপন ও পদবি, দুই অর্থেই)	
গৃহস্থালি	গৃহস্থালী
গেরিলা	গরিলা, গোরিলা
(বিশেষ ধরনের সংগ্রামকারী অর্থে)	
গোলক	গোলোক
(গোলাকার বস্তু)	
গোলোক	গোলক
(বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোক অর্থে)	
গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীপতি	গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, গোষ্ঠিপতি

গ

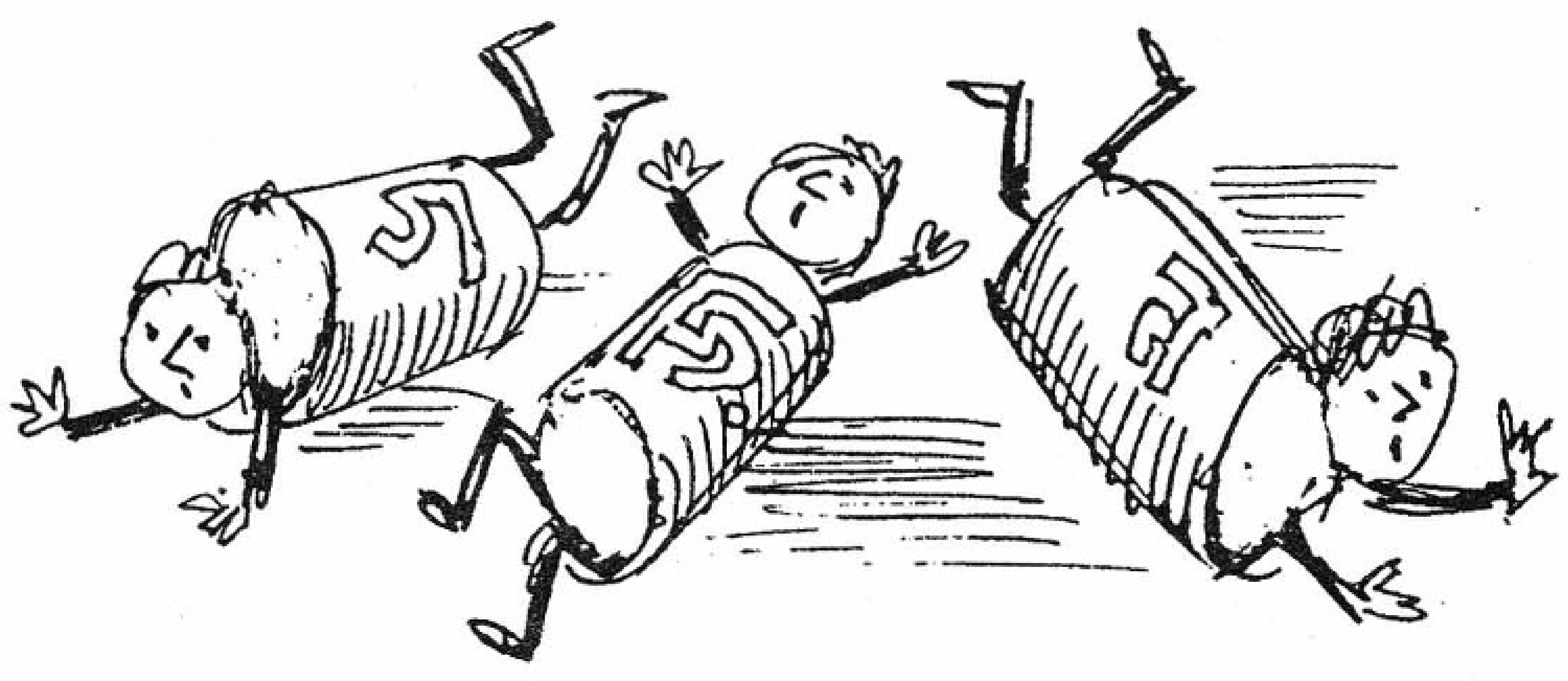
লিখুন	লিখবেন না
গ্রন্থি (গাঁট বা গিঁট অর্থে)	গ্রন্থী
গ্রন্থী (গুরুদ্বারে নির্দিষ্ট ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত ব্যক্তি)	গ্রন্থি
গ্রস্ত (গ্রাস করা হয়েছে এমন)	গ্রস্থ
গ্রিক	গ্রীক
গ্রিস	গ্রীস

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

গড়ছ (গড়িতেছ)	গড়ছো
গড়ছিল (গড়িতেছিল)	গড়ছিলো
গড়ত (গড়িত)	গড়তো
গড়ব (গড়িব)	গড়বো
গড়ল (গড়িল)	গড়লো
গড়াও (গড়াইয়া লইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে গড়াইয়া লইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
গড়াচ্ছ (গড়াইতেছ)	গড়াচ্ছো
গড়াচ্ছিল (গড়াইয়া লইতেছিল)	গড়াচ্ছিলো
গড়াত (গড়াইত)	গড়াতো

গ

লিখুন	লিখবেন না
গড়ান (গড়াইয়া লইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে গড়াইয়া লইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
গড়ানো (গড়িবার কাজ করানো)	গড়ান
গড়াব (গড়াইব)	গড়াবো
গড়াল (গড়াইয়া লইল)	গড়ালো
গড়িয়ো (গড়াইয়া লইয়ো)	গড়িও
গড়িয়েছিল (গড়াইয়া লইয়াছিল)	গড়িয়েছিলো
গড়েছিল (গড়িয়াছিল)	গড়েছিলো
গড়ো (গড়িবার কাজ করিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে গড়িবার কাজ করিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	গড়
গোড়ো (গড়িবার কাজ করিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	গোড়



ঘ

ঘটমান। অর্থ : 'ঘটছে এমন'। ক্রিয়াপদে ঘটমান বর্তমানের দৃষ্টান্ত : 'রাম যাচ্ছে', 'শ্যাম আসছে', 'যদু লিখছে', 'মধু পড়ছে'। ঘটমান অতীতের দৃষ্টান্ত : 'রাম যাচ্ছিল', 'শ্যাম আসছিল', 'যদু লিখছিল', 'মধু পড়ছিল'।

ঘটি। 'ঘটী' লিখবেন না।

ঘন। একটি অর্থে 'মেঘ' বোঝায়, অন্য অর্থে 'গাঢ়' বা 'জমাট'। 'ঘন-ঘন' বলতে কিন্তু এ দুটি অর্থের কোনওটিই বোঝাবে না ; বোঝাবে 'প্রায়ই', 'বারবার' বা 'অল্প সময়ের ব্যবধানে'।

ঘনিষ্ঠ। বানান যেন 'ঘনিষ্ট' না হয়।

ঘরনি। অর্থ : 'গৃহস্বামিনী' বা 'গৃহিণী'। 'ঘরনি' তৎসম শব্দ নয়, সুতরাং 'মূর্ধন্য ণ' লাগাবেন না। ঈ-কার দেবারও দরকার নেই।

লিখুন	লিখবেন না
ঘরানা	ঘরাণা
ঘরামি	ঘরামী
ঘাটি (চন্দ্রবিন্দু দেবার দরকার নেই)	ঘাঁটি, ঘাটী, ঘাঁটী
ঘানি	ঘাণি, ঘাণী, ঘানী
ঘুঁটি	ঘুটি
ঘুঁটে	ঘুটে
ঘুণ	ঘুন, ঘূণ, ঘূন
ঘুস	ঘুঁষ, ঘুঁস
ঘূর্ণমান (ঘুরছে এমন)	ঘুর্ণমান, ঘূর্ণ্যমান
ঘূর্ণ্যমান (ঘোরানো হচ্ছে এমন)	ঘূর্ণমান
ঘূর্ণিত	ঘুর্ণিত
ঘোঁট	ঘোট
ঘোড়া	ঘোঁড়া
ঘোরালো (জটিল অথবা উদ্বেগজনক অর্থে)	ঘোরাল
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
ঘুরছ (ঘুরিতেছ)	ঘুরছো

ঘ

লিখুন	লিখবেন না
ঘুরছিল (ঘুরিতেছিল)	ঘুরছিলো
ঘুরত (ঘুরিত)	ঘুরতো
ঘুরব (ঘুরিব)	ঘুরবো
ঘুরল (ঘুরিল)	ঘুরলো
ঘুরিয়েছিল (ঘুরাইয়াছিল)	ঘুরিয়েছিলো
ঘুরিয়ো (ঘুরাইয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঘুরিও
ঘুরেছিল (ঘুরিয়াছিল)	ঘুরেছিলো
ঘুরো (ঘুরিয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঘুর
ঘোরাও (ঘুরাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঘুরাইয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ঘোরাচ্ছ (ঘুরাইতেছ)	ঘোরাচ্ছো
ঘোরাচ্ছিল (ঘুরাইতেছিল)	ঘোরাচ্ছিলো
ঘোরাত (ঘুরাইত)	ঘোরাতো
ঘোরান (ঘুরাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ঘুরাইয়াছিলেন । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ঘোরানো (ঘুরানো)	ঘোরান
ঘোরাব (ঘুরাইব)	ঘোরাবো

ঘ

লিখুন	লিখবেন না
ঘোরাল (ঘুরাইল)	ঘোরালো
ঘোরো (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকো, ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে, ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	ঘোর



চ

চকমকি । এক রকমের পাথর, কঠিন কোনও বস্তুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি হলে যাতে আগুন জ্বলে ওঠে । ইংরেজি=flint । বানান **'চকমকী'** লিখবেন না ।

চক্ষুর্লজ্জা, চক্ষুলজ্জা । প্রথম বানান ব্যাকরণসম্মত, কিন্তু দ্বিতীয়টি চলিত, অতএব গ্রাহ্য । আমরা 'চক্ষুলজ্জা'ই লিখব ।

চক্ষূরোগ, চক্ষুরোগ । এ-ক্ষেত্রেও একই কথা । প্রথম বানান ব্যাকরণসম্মত, কিন্তু দ্বিতীয়টি চলিত, অতএব গ্রাহ্য । আমরা 'চক্ষুরোগ'ই লিখব ।

চড়ক । চৈত্র-সংক্রান্তির পার্বণ । 'ড়'-স্থলে 'র' বসাবেন না ।

চতুর্ভুজ । চার-হাতবিশিষ্ট । **'ভুজ'** শব্দের অর্থ হাত । বানানে ঊ-কার ব্যবহার করবেন না ।

চমূ । সৈন্যদল । বানানে উ-কার ব্যবহার করবেন না ।

চরক । প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ ঋষি । প্রণীত গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' ।

চরকি । এক রকমের আতসবাজি, যা চক্রাকারে ঘোরে । অন্য অর্থে নাগরদোলা । ঈ-কার ব্যবহার করবেন না ।

চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়, চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় । **চর্ব্য** = চর্বণের যোগ্য ; **চূষ্য, চোষ্য** = চুষবার বা চোষণ করবার যোগ্য ; **লেহ্য** = লেহন বা চাটবার যোগ্য ; **পেয়** = পানের যোগ্য । **'চর্ব্য'** অংশে য-ফলার কথাটা মনে রাখুন, এবং **'চূষ্য'** অংশে উ-কার বসাবেন না । গোটা শব্দটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে পানাহারের সার্বিক আয়োজনের কথা ।

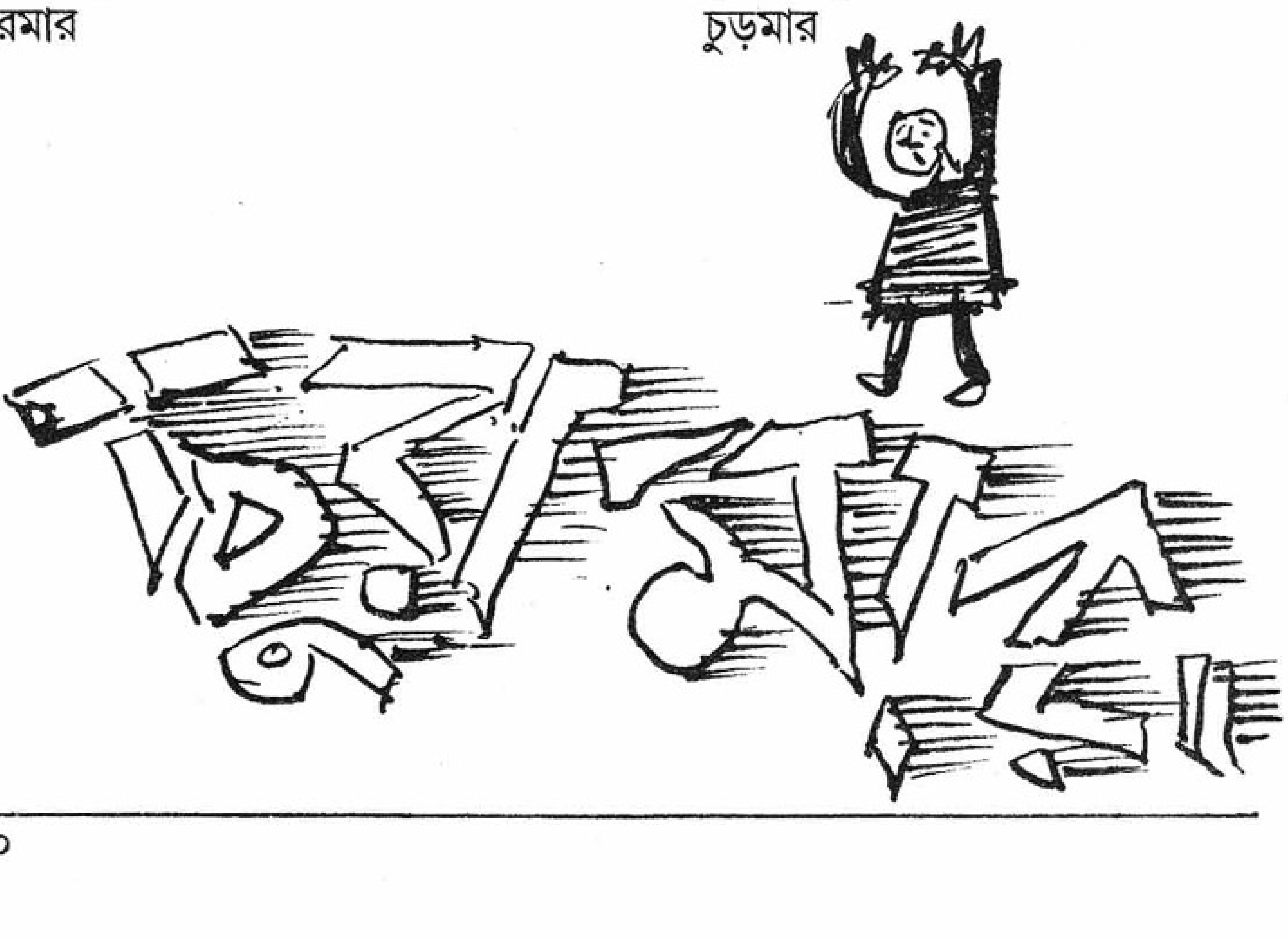
চাকরানি । শব্দটি তৎসম নয় । সুতরাং **'চাকরাণি', 'চাকরাণী'** অথবা **'চাকরানী'** বানান লিখবেন না ।

চৌধুরি, চৌধুরী । শব্দটি অতৎসম । বানান তাই **চৌধুরি** হওয়াই সংগত । তবে পদবি যাঁর চৌধুরি, এই শব্দের বানান যদি তিনি **চৌধুরী** লেখেন, তবে আমরাও তাঁর ক্ষেত্রে ঈ-কারযুক্ত বানানই লিখব । (দৃষ্টান্ত : রমাপদ চৌধুরী ।) উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ এলাকার বহু সঙ্গতিপন্ন ভূস্বামীর নামের আগেও কিন্তু এই শব্দটি দেখা যায় । এটা তাঁদের পদবি নয়, সচ্ছলতা বা প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক । সে-ক্ষেত্রে কিন্তু **চৌধুরি** বানান লেখাই সংগত হবে । (দৃষ্টান্ত : চৌধুরি চরণ সিংহ । 'নাম' দেখুন)

লিখুন	লিখবেন না
চাটনি	চাটনী
চাটূক্তি	চাটুক্তি
চাঁদনি	চাঁদনী

চ

লিখুন	লিখবেন না
চাপাটি	চাপাটী
চামেলি	চামেলী
চালানি	চালানী
চালিয়াত	চালিয়াৎ
চালুনি	চালুনী
চিক্কণ	চিক্কন, চিকণ
চিৎ (চৈতন্য অর্থে)	চিত
চিৎকার	চীৎকার
চিত (উপুড়-এর বিপরীত, ঊর্ধ্বমুখে শয়ান অবস্থা)	চিৎ
চিদম্বর	চিদাম্বর
চিন	চীন
চিরুনি	চিরুণি, চিরুণী
চিহ্ন	চিহ্ণ
চীর (ছিন্ন বস্ত্র বা বল্কল অর্থে)	চির
চুন	চুণ
চুপড়ি, চুবড়ি	চুপড়ী, চুবড়ী
চুরমার	চুড়মার



চ

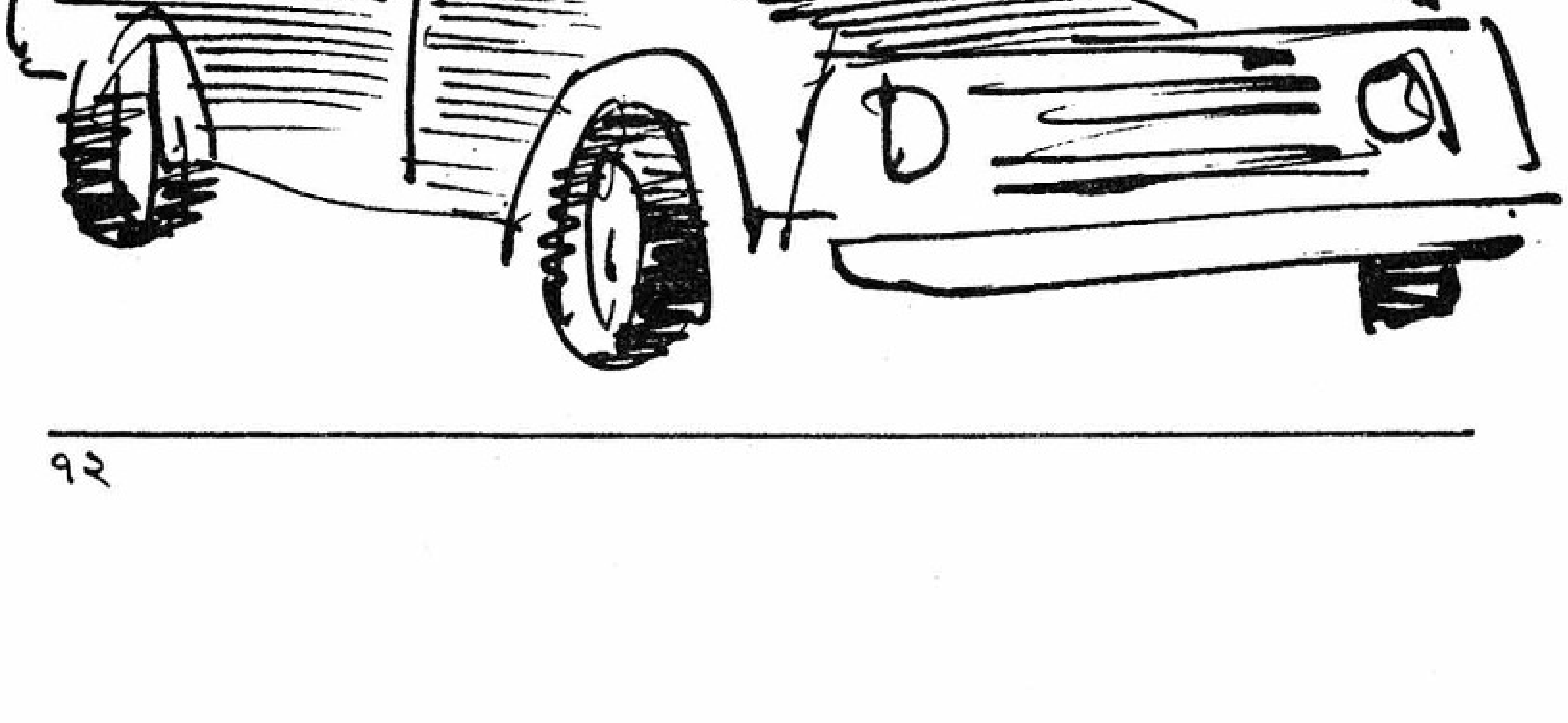
লিখুন	লিখবেন না
চেকোস্লোভাকিয়া ('নাম' দ্রষ্টব্য)	চেকোশ্লোভাকিয়া
চেন	চেইন
চোদ্দো	চোদ্দ
চৌচির (চার ভাগে বিভক্ত বা খণ্ডবিখণ্ড অর্থে)	চৌচিড়

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

লিখুন	লিখবেন না
চলছ (চলিতেছ)	চলছো
চলছিল (চলিতেছিল)	চলছিলো
চলত (চলিত)	চলতো
চলব (চলিব)	চলবো
চলল (চলিল)	চললো
চলেছিল (চলিয়াছিল)	চলেছিলো
চলো (চলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে চলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	চল
চালাও (চালাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে চালাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
চালাচ্ছ (চালাইতেছ)	চালাচ্ছো
চালাচ্ছিল (চালাইতেছিল)	চালাচ্ছিলো
চালাত (চালাইত)	চালাতো

চ

লিখুন	লিখবেন না
চালান (চালাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে চালাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	—
চালানো (চালাইবার কাজ)	চালান
চালাব (চালাইব)	চালাবো
চালাল (চালাইল)	চালালো
চালিয়েছিল (চালাইয়াছিল)	চালিয়েছিলো
চালিয়ো (চালাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	চালিও
চোলো (চলিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	চোল



ছ

ছন্দোবদ্ধ। অর্থ : 'ছন্দে-গাঁথা'। বানানে ও-কারের কথাটা মনে রাখুন। **'ছন্দবদ্ধ'** লিখবেন না।

ছন্ন। সাধারণ অর্থ : 'নষ্ট'। যথা, 'ছন্নমতি'।

ছন্নছাড়া। অর্থ : 'শৃঙ্খলাহীন', 'এলোমেলো'। (কথাটা 'ছন্দ-ছাড়া' থেকে এসে থাকতে পারে।)

ছলাত। ধ্বন্যাত্মক বা ধ্বনির অনুকারী (onomatopoetic) শব্দ। বানানে 'খণ্ড ত' ব্যবহার করবেন না।

ছাউনি। সাধারণ অর্থ : 'আবরণ'। অন্য অর্থে 'শিবির'ও বোঝায়। যথা 'সেনা-ছাউনি'। বানানে ঈ-কার ব্যবহার করবেন না।

লিখুন	লিখবেন না
ছাঁকনি	ছাকনি, ছাকনী
ছাঁকা	ছাকা
ছার (তুচ্ছ অর্থে)	ছাড়
ছুতমার্গ	ছুঁৎমার্গ, ছুঁতমার্গ
ছোড়া (নিক্ষেপ করা অর্থে)	ছোঁড়া
ছোঁড়া (ছোকরা অর্থে)	ছোড়া
ছোরা (অস্ত্র অর্থে)	ছোড়া
ছ্যাকড়া	ছ্যাকরা, ছ্যাঁকড়া, ছ্যাঁকরা
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
ছুটছ (ছুটিতেছ)	ছুটছো
ছুটছিল (ছুটিতেছিল)	ছুটছিলো
ছুটত (ছুটিত)	ছুটতো
ছুটব (ছুটিব)	ছুটবো

ছ

লিখুন	লিখবেন না
ছুটল (ছুটিল)	ছুটলো
ছুটিয়েছিল (ছুটাইয়াছিল)	ছুটিয়েছিলো
ছুটিয়ো (ছুটাইয়ো)	ছুটিও
ছুটেছিল (ছুটিয়াছিল)	ছুটেছিলো
ছুটো (ছুটিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ছুট
ছোটাও (ছুটাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ছুটাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ছোটাচ্ছ (ছুটাইতেছ)	ছোটাচ্ছো
ছোটাচ্ছিল (ছুটাইতেছিল)	ছোটাচ্ছিলো
ছোটাত (ছুটাইত)	ছোটাতো
ছোটান (ছুটাইয়া থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে ছুটাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ছোটানো (ছুটাইবার কাজ)	ছোটান
ছোটাব (ছুটাইব)	ছোটাবো
ছোটাল (ছুটাইল)	ছোটালো
ছোটো (ছুটিয়া থাকো। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ছোট

জ

জগৎ। তৎসম শব্দ। সুতরাং বানান পালটে 'ৎ'-স্থলে 'ত' বসাবার চেষ্টা করবেন না। কাগজে মাঝে-মাঝেই **'জগত'** বানান বার হয়। সতর্ক না হলে এই ভুল বানানই চলতে থাকবে। মনে রাখুন, 'ৎ' আছে বলেই (সন্ধির নিয়মে) 'জগজ্জ্যোতি', 'জগদীশ', 'জগদ্ধাত্রী' ইত্যাদি শব্দ আমরা পাচ্ছি।

জঙ্গি। ঈ-কার দেবেন না।

জটাজূট। **'জটাজুট'** লিখবেন না। বানানে ঊ-কার চাই।

জটিল। **'জটীল'** লিখবেন না। ই-কারেই সন্তুষ্ট থাকুন।

জুতা, জুতো। আমরা সাধু বাংলায় 'জুতা' লিখি, চলিত বাংলায় 'জুতো'। এই পর্যন্ত কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর পক্ষ থেকে আদালতে আর্জি পেশ করে ওই যে তাঁর প্রয়াত স্বামীর 'জুতো দুটি' ফেরত চাওয়া হয়েছিল স্মারক হিসাবে রক্ষা করবার জন্য (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ জুন ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১), ওখানে 'জুতোজোড়া' লিখলেই ঠিক হত। বাংলায় সাধারণত 'একটি জুতো' বা 'দুটি জুতো' বলা হয় না। বলা হয় 'একপাটি জুতো' বা 'একজোড়া জুতো'। প্রকাশরীতির এই বৈশিষ্ট্যের কথাটা মনে রাখুন।

লিখুন	লিখবেন না
জবানবন্দি	জবানবন্দী
জবাবি	জবাবী
জরুরি	জরুরী
জাঁতা	যাঁতা
জাদু	যাদু
জাদুকর	যাদুকর
জাদুঘর	যাদুঘর
জানুয়ারি	জানুয়ারী
জাপানি	জাপানী
জায়গির	জায়গীর
জালিয়াত	জালিয়াৎ
জিতেন্দ্র	জীতেন্দ্র
জিনিস	জিনিষ
জুত	জুৎ
জেঠি	জেঠী, জ্যেঠি, জ্যেঠী
জোগাড়	যোগাড়

জ

লিখুন	লিখবেন না
জোগান	যোগান
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
জানছ (জানিতেছ)	জানছো
জানছিল (জানিতেছিল)	জানছিলো
জানত (জানিত)	জানতো
জানব (জানিব)	জানবো
জানল (জানিল)	জানলো
জানাও (জানাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে জানাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
জানাচ্ছ (জানাইতেছ)	জানাচ্ছো
জানাচ্ছিল (জানাইতেছিল)	জানাচ্ছিলো
জানাত (জানাইত)	জানাতো
জানান (জানাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে জানাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
জানানো (জানাইবার কাজ)	জানান
জানাব (জানাইব)	জানাবো
জানাল (জানাইল)	জানালো

জ

লিখুন	লিখবেন না
জানিয়েছিল (জানাইয়াছিল)	জানিয়েছিলো
জানিয়ো (জানাইয়ো)	জানিও
জানো (জ্ঞাত আছ। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	জান
জেনেছিল (জানিয়াছিল)	জেনেছিলো
জেনো (জানিয়া লইয়ো, জ্ঞাত হইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	জেন



ঝ

ঝকমারি । অর্থ : 'ঝঞ্ঝাট', 'ঝামেলা', 'ভুল' । বানানে ঈ-কার লাগাবেন না ।

ঝনাত । যেমন 'ছলাত', তেমন **'ঝনাত'**ও ধ্বন্যাত্মক বা ধ্বনির অনুকারী (onomatopoetic) শব্দ । বানানে 'খণ্ড ত' ব্যবহার করবেন না ।

ঝরনা, ঝর্না । 'মূর্ধন্য ণ' ব্যবহার করবেন না । মনে রাখুন, শব্দটি তৎসম নয় । 'র' বা 'রেফ' থাকা সত্ত্বেও অতএব স্বচ্ছন্দে 'দন্ত্য ন' ব্যবহার করুন ।

লিখুন	**লিখবেন না**
ঝাঁজ	ঝাজ, ঝাঁঝ
ঝাঁজালো (ঝাঁজযুক্ত অর্থে)	ঝাজাল, ঝাঝাল, ঝাঁজাল, ঝাঁঝাল
ঝাঁপি	ঝাঁপী
ঝিউড়ি	ঝিউড়ী
ঝিল্লি	ঝিল্লী
ঝুড়ি (চুপড়ি অর্থে)	ঝুরি
ঝুপড়ি	ঝুপড়ী
ঝুরি (বৃক্ষশাখা থেকে লম্বমান শিকড় অর্থে)	ঝুড়ি
ঝুরিভাজা	ঝুড়িভাজা
ঝুলি	ঝুলী
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
ঝুলছ (ঝুলিতেছ)	ঝুলছো
ঝুলছিল (ঝুলিতেছিল)	ঝুলছিলো
ঝুলত (ঝুলিত)	ঝুলতো
ঝুলব (ঝুলিব)	ঝুলবো
ঝুলল (ঝুলিল)	ঝুললো
ঝুলিয়েছিল (ঝুলাইয়াছিল)	ঝুলিয়েছিলো

ঝ

লিখুন	লিখবেন না
ঝুলিয়ো (ঝুলাইয়ো)	ঝুলিও
ঝুলে ছিল (ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল)	ঝুলেছিল
ঝুলেছিল (ঝুলিয়াছিল)	ঝুলে ছিল
ঝুলো (ঝুলিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঝুল
ঝোলাও (ঝুলাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঝুলাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ঝোলাচ্ছ (ঝুলাইতেছ)	ঝোলাচ্ছো
ঝোলাচ্ছিল (ঝুলাইতেছিল)	ঝোলাচ্ছিলো
ঝোলাত (ঝুলাইত)	ঝোলাতো
ঝোলান (ঝুলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ঝুলাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ঝোলানো (ঝুলাইবার কাজ)	ঝোলান
ঝোলাব (ঝুলাইব)	ঝোলাবো
ঝোলাল (ঝুলাইল)	ঝোলালো
ঝোলো (ঝুলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঝুলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঝোল



ট

টইটম্বুর । অর্থ : 'কানায়-কানায় ভর্তি' (যতটা ভর্তি হলে উপচে পড়ার অবস্থা হয়) । **'টৈটম্বুর'** লিখবেন না ।

টমাটো, টম্যাটো । **'টমেটো'** লিখবেন না ।

টাকরা । অর্থ : 'তালু' । **'টাগরা'** লিখবেন না ।

টাঁকশাল । মুদ্রা নির্মাণের কারখানা । বানানে চন্দ্রবিন্দুর কথাটা মনে রাখুন ।

টিকা । ইংরেজি 'ভ্যাকসিনেশন' ও সংস্কৃত **'তিলক'** অর্থে ব্যবহারের সময় এই বানানই গ্রাহ্য, তখন ঈ-কার ব্যবহার করবেন না ।

টিপ্পনী । অর্থ : 'সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, মন্তব্য' । চলিত অর্থে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য । অবিকৃত তৎসম শব্দ, সুতরাং বানান পালটাবার প্রশ্নই ওঠে না । কাগজে মাঝে-মাঝে **'টিপ্পনি'** বানান বার হয়, তাই সতর্ক করে দিতে হল ।

লিখুন	**লিখবেন না**
টিলক (পদবি । 'নাম' দেখুন)	তিলক
টীকা (ব্যাখ্যা)	টিকা
টেকা	টেঁকা
টেকসই	টেঁকসই
টেলিভিশন	টেলিভিসন
টোড়ি	টোড়ী
টোস্ট	টোষ্ট
ট্যাঁক	ট্যাক
ট্যাঁস	ট্যাস
ট্রেজারি	ট্রেজারী
ট্রেন	ট্রেণ
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
টলছ (টলিতেছ)	টলছো
টলছিল (টলিতেছিল)	টলছিলো
টলত (টলিত)	টলতো

ট

লিখুন	লিখবেন না
টলব (টলিব)	টলবো
টলল (টলিল)	টললো
টলাও (টলাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে টলাইয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
টলাচ্ছ (টলাইতেছ)	টলাচ্ছো
টলাচ্ছিল (টলাইতেছিল)	টলাচ্ছিলো
টলাত (টলাইত)	টলাতো
টলান (টলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে টলাইয়াছিলেন । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
টলানো (টলাইবার কাজ)	টলান
টলাব (টলাইব)	টলাবো
টলাল (টলাইল)	টলালো
টলিয়েছিল (টলাইয়াছিল)	টলিয়েছিলো
টলিয়ো (টলাইয়ো)	টলিও
টলেছিল (টলিয়াছিল)	টলেছিলো
টলো (টলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে টলিয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	টল
টোলো (ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	টোল

ঠ

ঠাকরুন। **'ঠাকরুণ'** লিখবেন না।

ঠাকরানি। **'ঠাকুরাণি', 'ঠাকুরাণী'** অথবা **'ঠাকুরানী'** লিখবেন না।

ঠাট। অর্থ: 'বাইরের চালচলন, ধরনধারণ' ইত্যাদি। যথা, 'আয় বাড়েনি, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তবু মধ্যবিত্ত মানুষের ঠাট বজায় না রেখে উপায় নেই।' বানানে চন্দ্রবিন্দু নেই, সুতরাং **'ঠাঁট'** লিখবেন না।

ঠিকুজি। **'ঠিকুজী'** লিখবেন না।

ঠেঙাড়ে/ঠ্যাঙাড়ে, ঠেঙানো/ঠ্যাঙানো, ঠোঙা। এ-সব শব্দের কোনওটির বানানেই 'ঙ্গ' ব্যবহার করবেন না, 'ঙ'ই যথেষ্ট।

লিখুন	**লিখবেন না**
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
ঠকছ (ঠকিতেছ)	ঠকছো
ঠকছিল (ঠকিতেছিল)	ঠকছিলো
ঠকত (ঠকিত)	ঠকতো
ঠকব (ঠকিব)	ঠকবো
ঠকল (ঠকিল)	ঠকলো
ঠকাও (ঠকাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঠকাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ঠকাচ্ছ (ঠকাইতেছ)	ঠকাচ্ছো
ঠকাচ্ছিল (ঠকাইতেছিল)	ঠকাচ্ছিলো
ঠকাত (ঠকাইত)	ঠকাতো
ঠকান (ঠকাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ঠকাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—

ঠ

লিখুন	লিখবেন না
ঠকানো (ঠকাইবার কাজ)	ঠকান
ঠকাব (ঠকাইব)	ঠকাবো
ঠকাল (ঠকাইল)	ঠকালো
ঠকিয়েছিল (ঠকাইয়াছিল)	ঠকিয়েছিলো
ঠকিয়ো (ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঠকিও
ঠকেছিল (ঠকিয়াছিল)	ঠকেছিলো
ঠকো (ঠকিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঠকিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঠক
ঠোকো (ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঠোক



ড

ডাইনি । **'ডাইনী'** লিখবেন না ।

ডাঁশ । পতঙ্গ বিশেষ । **'ডাশ'** লিখবেন না । চন্দ্রবিন্দুর কথাটা মনে রাখুন ।

ডাকসাইটে । অর্থ : 'নামজাদা', 'প্রসিদ্ধ', 'বিখ্যাত' । **'ডাকসাঁইটে'** লিখবেন না ।

ডাকাবুকো । অর্থ : 'বেপরোয়া', 'ভয়ডরহীন' । বিশেষণ । সাধারণত অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । যথা, 'ডাকাবুকো ছেলে' ।

ডাঙা । বানানে 'ঙ্গ' ব্যবহার করবেন না, 'ঙ'ই যথেষ্ট ।

ডাচ । **'ওলন্দাজ'** লিখুন । 'ডাচ' লিখবেন না ।

ডিক্রি । আদালত থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ । **'ডিক্রী'** লিখবেন না । তা ছাড়া **'ডিগ্রি'**র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না ।

ডিঙা, ডিঙি, ডোঙা । বানানে 'ঙ্গ' ব্যবহার করবেন না, 'ঙ'ই যথেষ্ট ।

ডেপুটি । **'ডেপুটী'** লিখবেন না ।

ড্যাশ । 'বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন ।

ড্রেন । কাগজে মাঝে-মাঝে (সম্ভবত র-ফলাটির জন্য) **'ড্রেণ'** বানান বার হয় । 'দন্ত্য ন' ব্যবহার করুন ।

লিখুন	**লিখবেন না**
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
ডুবছ (ডুবিতেছ)	ডুবছো
ডুবছিল (ডুবিতেছিল)	ডুবছিলো
ডুবত (ডুবিত)	ডুবতো
ডুবব (ডুবিব)	ডুববো
ডুবল (ডুবিল)	ডুবলো
ডুবিয়েছিল (ডুবাইয়াছিল)	ডুবিয়েছিলো
ডুবিয়ো (ডুবাইয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	ডুবিও

ড

লিখুন	লিখবেন না
ডুবে ছিল (ডুবন্ত অবস্থায় ছিল)	ডুবেছিল
ডুবেছিল (ডুবিয়াছিল)	ডুবেছিলো
ডুবো (ডুবিয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ডুব
ডোবাও (ডুবাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ডুবাইয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ডোবাচ্ছ (ডুবাইতেছ)	ডোবাচ্ছো
ডোবাচ্ছিল (ডুবাইতেছিল)	ডোবাচ্ছিলো
ডোবাত (ডুবাইত)	ডোবাতো
ডোবান (ডুবাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ডুবাইয়াছিলেন । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ডোবানো (ডুবাইবার কাজ)	ডোবান
ডোবাব (ডুবাইব)	ডোবাবো
ডোবাল (ডুবাইল)	ডোবালো
ডোবো (ডুবিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ডুবিয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ডোব



ঢ

ঢাঁই। মৎস্য বিশেষ। চন্দ্রবিন্দুর কথাটা মনে রাখুন। **'ঢাই'** লিখবেন না।
ঢাকি। অর্থ : 'যে ঢাক বাজায়'। ঈ-কার ব্যবহার করবেন না।
ঢালী। অর্থ : 'ঢালধারী'। **'ঢালি'** লিখবেন না।
ঢিট। অর্থ : 'জব্দ' বা 'শায়েস্তা'। চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করবেন না।
ঢু। **'ঢুঁ'** লিখবেন না, চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের দরকার নেই।
ঢুঢু। এ-ক্ষেত্রেও চন্দ্রবিন্দু বর্জনীয়।
ঢুলি। অর্থ : 'যে ঢোল বাজায়'। ঈ-কার ব্যবহার করবেন না।
ঢেঙা, ঢ্যাঙা। 'ঙ্গ' ব্যবহার করবেন না, 'ঙ'ই যথেষ্ট।
ঢোক। অনেকে **'ঢোঁক'** লেখেন, কাগজে সেই বানান দেখাও যায়। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করবেন না।

লিখুন	**লিখবেন না**
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
ঢুলছ (ঢুলিতেছ)	ঢুলছো
ঢুলছিল (ঢুলিতেছিল)	ঢুলছিলো
ঢুলত (ঢুলিত)	ঢুলতো
ঢুলব (ঢুলিব)	ঢুলবো
ঢুলল (ঢুলিল)	ঢুললো
ঢুলিয়েছিল (ঢুলাইয়াছিল)	ঢুলিয়েছিলো
ঢুলিয়ো (ঢুলাইয়ো)	ঢুলিও
ঢুলেছিল (ঢুলিয়াছিল)	ঢুলেছিলো
ঢুলো (ঢুলিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঢুল
ঢোলাও (ঢুলাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঢুলাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—

ঢ

লিখুন	লিখবেন না
ঢোলাচ্ছ (ঢুলাইতেছ)	ঢোলাচ্ছো
ঢোলাচ্ছিল (ঢুলাইতেছিল)	ঢোলাচ্ছিলো
ঢোলাত (ঢুলাইত)	ঢোলাতো
ঢোলান (ঢুলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ঢুলাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ঢোলানো (ঢুলাইবার কাজ)	ঢোলান
ঢোলাব (ঢুলাইব)	ঢোলাবো
ঢোলাল (ঢুলাইল)	ঢোলালো
ঢোলো (ঢুলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ঢুলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ঢোল



ত

তকলি । হাতে সুতা কাটার যন্ত্র । **'তকলী'** লিখবেন না ।

তক্ষুনি । 'তৎক্ষণাৎ' থেকে এসেছে, কিন্তু 'ক্ষণ'-এর 'মূর্ধন্য ণ' এখানে খাটবে না, 'দন্ত্য ন' ব্যবহার করুন ।

তখনই । উচ্চারণ **'তখনি'** বটে, কিন্তু **'তখনই'** লিখুন ।

তখনও । উচ্চারণ **'তখনো'** বটে, কিন্তু **'তখনও'** লিখুন ।

তছরুপ । অর্থ : 'কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের টাকাকড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা ।' কাগজে প্রায়ই **'তছরূপ'** বানান দেখি । কিন্তু মনে রাখুন, 'রূপ'-এর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই ।

তড়িৎ । অর্থ : 'বিদ্যুৎ' । কিন্তু **'তড়িদাহত'** (তড়িৎ+আহত) । অর্থ : 'বিদ্যুতের স্পর্শ ঘটায় আহত' ।

তদারকি । **'তদারকী'** লিখবেন না ।

তদ্দ্বারা । 'তৎ+দ্বারা' । 'খণ্ড ত' রয়েছে, সুতরাং সন্ধি করলে এ-ক্ষেত্রে মাত্র একটি 'দ'-এ চলবে না, **'তদ্বারা'** লিখলে ভুল হবে ।

তফসিল । **'তপসিল'** লিখবেন না ।

তফসিলি । **'তপসিলি', 'তপসিলী', 'তফসিলী'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না ।

তফাত । **'তফাৎ'** লিখবেন না ।

তবলচি । 'তবলচী' লিখবেন না ।

তরণি । এই বানানই লিখুন । যখন ই-কার দিলেও চলে, তখন আর 'তরণী' লেখার দরকার নেই ।

তর্জনী । 'তর্জনি' লিখবেন না ।

তর্জমা । দৈনিক পত্রিকায় যে-সব খবর আমরা ছাপা হতে দেখি, তার বৃহদংশকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায় । এক ভাগ সংগৃহীত হয় পত্রিকাগুলিরই পুরো কিংবা আংশিক সময়ের কর্মীদের দ্বারা । অন্য ভাগ পাওয়া যায় সংবাদ-সরবরাহকারী বিভিন্ন নিউজ এজেন্সি থেকে । (এ ছাড়া সরকারি প্রচার-বিভাগ, নানা রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দূতাবাস ইত্যাদি থেকেও সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিছু-কিছু বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার ও খবর পাঠানো হয় ঠিকই, তবে নিজস্ব কর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত ও এজেন্সি থেকে প্রেরিত খবরের তুলনায় তার পরিমাণ নেহাতই নগণ্য ।)

যে-সব সাংবাদিক ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজে কাজ করেন, বাইরে থেকে তার-বার্তা পাঠাতে হলে এককালে তাঁদেরও ইংরেজি ভাষার শরণ না নিয়ে উপায় থাকত না । পরে এক সময় ভারতীয় ভাষায়, কিন্তু রোমক লিপিতে, তার-বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা হয় । ফ্যাক্স-ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে অবশ্য রোমক লিপি ব্যবহারেরও দরকার হয় না । যে-কোনও ভাষায়

তো বটেই, এই ব্যবস্থায় যে-কোনও লিপিতেই এখন খবর পাঠানো যাচ্ছে।

বস্তুত, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত নানা দৈনিক পত্রিকার কর্মীরা এখন বাইরের নানা জায়গা থেকে বহুলাংশে বাংলা ভাষাতেই তাঁদের কাগজের জন্য খবর ও নিবন্ধাদি পাঠিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে সে-সব লেখা বাংলা লিপিতেই আসে। রোমক লিপিতে এলেও তর্জমার ঝামেলা পোহাতে হয় না, শুধু লিপিটা পালটে নিলেই হল।

অন্য দিকে, এ-দেশের দুটি বৃহৎ নিউজ এজেন্সি (পি. টি. আই. ও ইউ. এন. আই.) থেকে যে খবর আসে, তার ভাষা কিন্তু ইংরেজি। বিদেশি নিউজ এজেন্সিগুলিও (রয়টার, এ. পি., এ. এফ. পি. ইত্যাদি) এ-দেশের কাগজগুলিকে একমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই খবর সরবরাহ করে। সে-সব খবর ছাপতে হলে ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট হচ্ছে। সেটা এই যে, ইংরেজি কাগজের বার্তা-বিভাগে যাঁরা কাজ করেন (বিশেষত ডেস্কের কাজ), ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা না-জানলেও তাঁদের চলে। সে-ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজে যাঁরা ওই একই কাজ করেন, তাঁদের অন্তত দুটি ভাষা জানা চাই। যে ভারতীয় ভাষায় কাগজটি প্রকাশিত হচ্ছে, একদিকে যেমন সেই ভাষায় তাঁদের দখল থাকা অত্যাবশ্যক, অন্যদিকে তেমন ইংরেজি ভাষাটাও ভাল করে না জানলে তাঁদের চলে না। অর্থাৎ, বাংলা কাগজের বার্তা-বিভাগের যাঁরা কর্মী, বাংলা ও ইংরেজি, দুটো ভাষাই তাঁদের বেশ ভালভাবে জানতে হবে। দুই ভাষাতেই যদি না তাঁরা পোক্ত হন, তা হলে তাঁদের তর্জমা আড়ষ্ট ও দুর্বল তো হবেই, হয়তো বিশেষ নির্ভরযোগ্যও হবে না।

মারাত্মক ভুলও মাঝে-মাঝে ঘটে যেতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। প্রবল বন্যায় রেল-লাইন থেকে বহু 'উডেন স্লিপার' ভেসে গিয়েছে, ইংরেজিতে পাওয়া এই খবর যখন বাংলা কাগজে বার হল, তখন পাঠক জানলেন, এটা 'কাঠের খড়ম' ভেসে যাওয়ার ব্যাপার! বোঝাই যাচ্ছে যে, অনেক বছর আগে ঘটে যাওয়া এই ভুলটা যিনি করেছিলেন, ইংরেজি ভাষায় তাঁর দখল বিশেষ পোক্ত ছিল না।

তর্জমার ভুল আগে ঘটত, এখন ঘটে না, এমন ধারণা ঠিক নয়। কোনও খবর কিংবা বক্তব্যকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাবার কাজে এখনও নানা ভুলভ্রান্তি আমরা ঘটতে দেখি। সব পাঠকের চোখেই যে এগুলি ধরা পড়ে, তা হয়তো নয়, কিন্তু যাঁদের চোখে ধরা পড়ে, কাগজের

বিশ্বাসযোগ্যতা অন্তত তাঁদের কাছে যে হ্রাস পায়, এই সহজ কথাটা মনে রাখা ভাল।

তর্জমার ভুল যে ঘোর অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। একে তো ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়, তার উপরে আবার এই বিদেশি ভাষাটিকে ভাল করে আয়ত্ত করবার সুযোগ কিংবা সময়ও আমরা সবাই পাই না। ফলে, আমরা অনেকেই যা শিখি, তা কাজ-চালানো গোছের ইংরেজি মাত্র, এই ভাষার প্রয়োগবিধির নানা রহস্যের অনেকটাই আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়।

যেমন, ধরা যাক, নানা ইংরেজি শব্দের নিতান্ত একটি অর্থ জেনেই আমরা অনেকে খুশি থাকি। কিন্তু যেমন অন্যান্য ভাষায়, তেমন ইংরেজি ভাষাতেও রয়েছে এমন অনেক শব্দ, যার অর্থ নিতান্ত একটি নয়, একাধিক। প্রসঙ্গভেদে সে-সব শব্দের অর্থভেদ ঘটে। অর্থনির্ণয়ে প্রসঙ্গবিচার তাই জরুরি। বস্তুত, কোনও শব্দের যে-অর্থ আমরা জানি, সেটা খাটবে কিংবা খাটবে না, প্রসঙ্গটা খেয়াল করলেই অনেক সময় তা ধরতে পারা যায়। কিন্তু প্রসঙ্গটা কী, সর্বদাই যে তা আমরা খেয়াল করি, তা নয়। ফলে আমাদের তর্জমাও সর্বদা নির্ভুল হয় না।

'উডেন স্লিপার'-এর বাংলা যিনি করেছিলেন 'কাঠের খড়ম', তিনিও আসলে প্রসঙ্গটা খেয়াল করেননি। তা যদি করতেন, তা হলে তাঁর একটা খটকা না লেগে পারত না। সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি ভাবতেন যে, বন্যার তোড়ে 'কাঠের খড়ম' তো ভাসতেই পারে, কিন্তু রেল-লাইনে অত 'কাঠের খড়ম' আসবে কোত্থেকে ? সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি ইঙ্গ-বঙ্গ শব্দকোষটা একবার দেখে নিতেন নিশ্চয়, এবং তা হলেই জানতে পারতেন যে, 'স্লিপার' বলতে যেমন এক রকমের পাদুকা বোঝায়, তেমনই বোঝায় কাঠের সেই পুরু তক্তাকেও, যা রেল-লাইনে পাতা থাকে। সত্যি কথা বলতে কী, শব্দকোষের পৃষ্ঠা ওলটাবারও দরকার সর্বক্ষেত্রে হয় না ; শব্দার্থ নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ জাগলে সহকর্মীরাই অনেক ক্ষেত্রে তা মিটিয়ে দিতে পারেন।

মুশকিল এই যে, ওই সন্দেহটাই আমাদের অনেকের জাগে না। কেনই বা জাগবে ! আমরা তো ধরেই বসে আছি, যে-শব্দের যে-অর্থ আমরা জানি, সেটাই তার একমাত্র অর্থ। ফলে, প্রসঙ্গটা কী, এবং আমাদের জানা অর্থটার সঙ্গে তার কোনও বিরোধ ঘটছে কি না, সেটাও আমরা অনেকে খেয়াল করি না।

এই যে আত্মসন্তোষ, এটাই খুলে দেয় ভুলের দরজা।

ত

আন্দাজে তর্জমা করাও কম বিপজ্জনক নয়। '...ইন এ ট্যাবলয়েড ডেইলি পেপার পাবলিশ্‌ড ফ্রম হংকং...'—এই বাক্যাংশকে বাংলায় তর্জমা করতে গিয়ে যিনি লিখেছিলেন '...হংকং থেকে প্রকাশিত ট্যাবলয়েড নামক একটি দৈনিক পত্রিকায়...', বোঝা যায় যে, 'ট্যাবলয়েড' শব্দটার অর্থ তিনি জানতেন না। শব্দকোষের পাতা ওলটালেই কিন্তু অর্থটা জানা যেত। দুঃখের বিষয়, সেটুকু কষ্টও তিনি স্বীকার করেননি। তিনি স্রেফ আন্দাজে কাজ সারবার চেষ্টা করেছেন, এবং ফেঁসে গিয়েছেন।

ইংরেজিতে এই রকমের একটা কথা চালু আছে যে, তর্জমা একইসঙ্গে বিশ্বস্ত ও সুন্দর হয় না। হয় তা বিশ্বস্ত অর্থাৎ মূলানুগ হয়, অথবা সুন্দর। যিনি সাহিত্যের তর্জমা করছেন, তাঁকে কিন্তু বিশ্বস্ততা ও সৌন্দর্য, দু' দিকেই সমান নজর রাখতে হয়। অন্য দিকে, সংবাদপত্রের জন্য যিনি খবর কিংবা নিবন্ধাদি তর্জমা করছেন, তুলনায় তাঁকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হয় বিশ্বস্ততার উপরেই।

মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটাই আসলে সাংবাদিকের তর্জমা-কর্মের প্রধান শর্ত। সেই শর্তটা তিনি পালন করবেন অবশ্যই। কিন্তু তাই বলেই যে তিনি ভাষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন হবেন, তাও নয়। তাঁর ভাষা পুষ্পিত হবে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হবে। সেটা হবে, যদি তাঁর তর্জমার ভাষাটা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গিমা ও প্রকাশরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু হয় না। তার একটা মস্ত কারণ এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই যে-তর্জমা আমরা করি, তা একেবারেই আক্ষরিক তর্জমা। আক্ষরিক তর্জমায় ইংরেজি বাগ্‌ভঙ্গিমা ও প্রকাশরীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না, শুধু ইংরেজি শব্দগুলি বাংলায় অনূদিত হয় মাত্র। ফলে তার গা থেকে ইংরেজির গন্ধ পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না, এবং বাংলা পড়তে-পড়তেও তখন স্বতই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এটা বাংলাই তো ?

একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'কাশ্মির ইজ সেফ ফর্ টুরিস্টস'—কাশ্মিরের জনৈক সরকারি মুখপাত্রের এই যে উক্তি, এর বঙ্গানুবাদ কী হবে ? আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলা করেছিল 'পর্যটকদের জন্য কাশ্মির নিরাপদ'। কিন্তু এটা একেবারেই আক্ষরিক তর্জমা, ফলে এর গা থেকে ইংরেজির গন্ধ মুছে যায়নি। তর্জমাটা যদি বাংলা প্রকাশরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হত, তা হলে ইংরেজি 'ফর'-এর বাংলা এ-ক্ষেত্রে 'জন্য' হত না, হত 'পক্ষে'। লেখা হত 'পর্যটকদের পক্ষে কাশ্মির নিরাপদ'।

ত

সাধারণভাবে কয়েকটা ইংরেজি শব্দের কথা বলি, প্রায়ই যার বেঠিক বাংলা চোখে পড়ে :

(ক) 'সুদ' আর 'স্বার্থ' ছাড়াও ইংরেজি 'ইন্টারেস্ট' শব্দটার আরও নানা অর্থ হয়। 'ইন দি ইন্টারেস্ট...' দেখলেই আমরা অনেক সময় তার বাংলা করে বসি 'স্বার্থে'। ফলে তর্জমাটা ভুল হয়তো হয় না, কিন্তু ইংরেজি-ঘেঁষা থেকে যায়। মনে রাখা দরকার, ক্ষেত্রবিশেষে এর বাংলা হবে 'জন্য'। যেমন, 'ইন দি ইন্টারেস্ট অভ আওয়ার ডেভেলাপমেন্ট অ্যাজ এ নেশন...'—এই বাক্যাংশের বাংলা 'জাতি হিসাবে আমাদের উন্নতির স্বার্থে...' করবেন না, করুন 'জাতি হিসাবে আমাদের উন্নতির জন্য...'।

(খ) 'টু স্যাটিসফাই' মানে 'সন্তোষবিধান করা' ; যিনি 'স্যাটিসফায়েড', তিনি 'সন্তুষ্ট'। ঠিক কথা। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে হাকিম যখন 'স্যাটিসফায়েড' হন যে, অভিযুক্ত লোকটি খুনিই বটে, তখন বস্তুত তিনি কী হচ্ছেন ? 'টু বি স্যাটিসফায়েড' মানে সেখানে 'নিশ্চিত হওয়া'।

(গ) 'টু ক্লেম' মানে 'দাবি করা'। কিন্তু সর্বত্রই কি তা-ই ? কোনও রাজনৈতিক নেতা যখন 'ক্লেম' করেন যে, জনাকয়েক সদস্যকে বহিষ্কার করা সত্ত্বেও তাঁর দলের শক্তি হ্রাস পায়নি, তখনও কি 'ক্লেম' কথাটার আমরা ওই একই অর্থ করব ? অনুরূপ ক্ষেত্রে তা-ই অনেক সময় আমরা করি বটে, কিন্তু সেটা ঠিক হয় না। আমাদের বুঝতে হবে যে, এ-সব ক্ষেত্রে 'টু ক্লেম' বলতে বোঝায় 'টু অ্যাসার্ট'। সেটা যদি বুঝি, তা হলে বাংলা প্রকাশরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ-ক্ষেত্রে আমরা লিখব, "তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, কয়েকজন সদস্যকে বহিষ্কার করা সত্ত্বেও তাঁর দলের শক্তি হ্রাস পায়নি।"

(ঘ) ইংরেজরা তাদের দেশ থেকে প্রাচ্য পৃথিবীর নানা অঞ্চলের দূরত্বের হিসাব কষে কোনও অঞ্চলকে বলে 'নিয়ার ইস্ট', কোনও অঞ্চলকে বলে 'ফার ইস্ট'। (এই ইংরেজরাই এককালে 'নিয়ার ইস্ট' বলতে তুরস্ক ও বল্‌কান রাষ্ট্রগুলিকে বোঝাত, আজকাল সে-ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যকে বোঝায়।) বাংলা কাগজে এ-সব কথার আক্ষরিক তর্জমা করা ঠিক নয়। আমরা দেখব, যে-অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে, তার অবস্থান এই প্রাচ্য পৃথিবীর কোনখানে বা কোন দিকে। সেই বিচারে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি লেখাই ভাল।)

(ঙ) দশ-বছরব্যাপী সময় বোঝাতে গিয়ে ইংরেজিতে যখন 'টোয়েন্টিজ', 'থার্টিজ', 'ফর্টিজ', 'ফিফটিজ', 'সিক্সটিজ', 'সেভেন্টিজ', 'এইট্টিজ' ও 'নাইনটিজ' বলা হয়, তখন যথাক্রমে তার বাংলা করুন 'বিশের দশক', 'তিরিশের দশক', 'চল্লিশের দশক', 'পঞ্চাশের দশক', 'ষাটের দশক',

'সত্তরের দশক', 'আশির দশক' ও 'নব্বইয়ের দশক'। 'বিশের দশক'কে 'দ্বিতীয় দশক', 'তিরিশের দশক'কে 'তৃতীয় দশক', 'চল্লিশের দশক'কে 'চতুর্থ দশক' ইত্যাদি বললে ভুল হবে। মনে রাখুন, এই শতাব্দীর 'বিশের দশক' বলতে ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে বোঝায় ; সে-ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক বলতে বোঝায় ১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে।

মূল ভাষায় যদি একটি বাক্যের মধ্যেই বিস্তর কথা আঁটিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তর্জমাতেও যে সে-সব কথাকে অনধিক একটি বাক্যের মধ্যেই ধরাতে হবে, তা ভাববেন না। দরকার হলে একটি বাক্যকে ভেঙে একাধিক বাক্য গঠন করুন।

ইংরেজি বাক্য যেভাবে বিন্যস্ত হয়, বাংলা বাক্য সেভাবে বিন্যস্ত হয় না। দুই ভাষার বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি দু' রকম। এ-কথা অনুবাদকের ভুলে গেলে চলবে না। কোনও ইংরেজি বাক্যকে যখন কেউ বাংলায় অনুবাদ করছেন, তখন তাঁকে ভাবতে হবে, ইংরেজি বাক্যটিতে যা বলা হয়েছে, সেই কথাটা বাংলায় বলতে হলে তিনি কীভাবে বলতেন। যে-ভাবে বলতেন, একেবারে সেইভাবে যদি বাংলা বাক্যটিকে তিনি বিন্যস্ত করেন, তর্জমার ভাষা তা হলেই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়।

মনে রাখুন

(১) যে-সব সাংবাদিক বাংলা কাগজে কাজ করেন, বাংলা ও ইংরেজি, দুটো ভাষাই তাঁদের ভালভাবে জানা দরকার।
(২) একই ইংরেজি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে ; কোন প্রসঙ্গে কোন অর্থটা খাটবে, সেটা বোঝা চাই।
(৩) আন্দাজে তর্জমা করবেন না।
(৪) মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটাই সাংবাদিকের তর্জমার প্রধান শর্ত।
(৫) তর্জমার ভাষা পুষ্পিত হবে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হবে।

তারিখ, বার। নির্ণয়ের ব্যাপারে বাংলা মতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মতের মিল নেই। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, দুই গণনা-পদ্ধতি দুই রকম। বাংলা মতে তারিখ ও বার শুরু হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ; পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার মেয়াদ। পাশ্চাত্ত্য মতে রাত বারোটায় তারিখ ও বারের সূচনা ;

ত

মেয়াদ পরবর্তী রাত বারোটা পর্যন্ত। ফলে বাংলা মতে যা তেসরা ফেব্রুয়ারি রবিবারের ঘটনা, ইংরেজি মতে তা চৌঠা ফেব্রুয়ারি সোমবারের ঘটনা হতেই পারে। সূর্যোদয় হলে আমরা বলি, আর-একটা দিন শুরু হল ; সাহেবদের আর-একটা দিন সে-ক্ষেত্রে তার অনেক আগেই, অর্থাৎ রাত বারোটা বাজা মাত্র, শুরু হয়ে গিয়েছে।

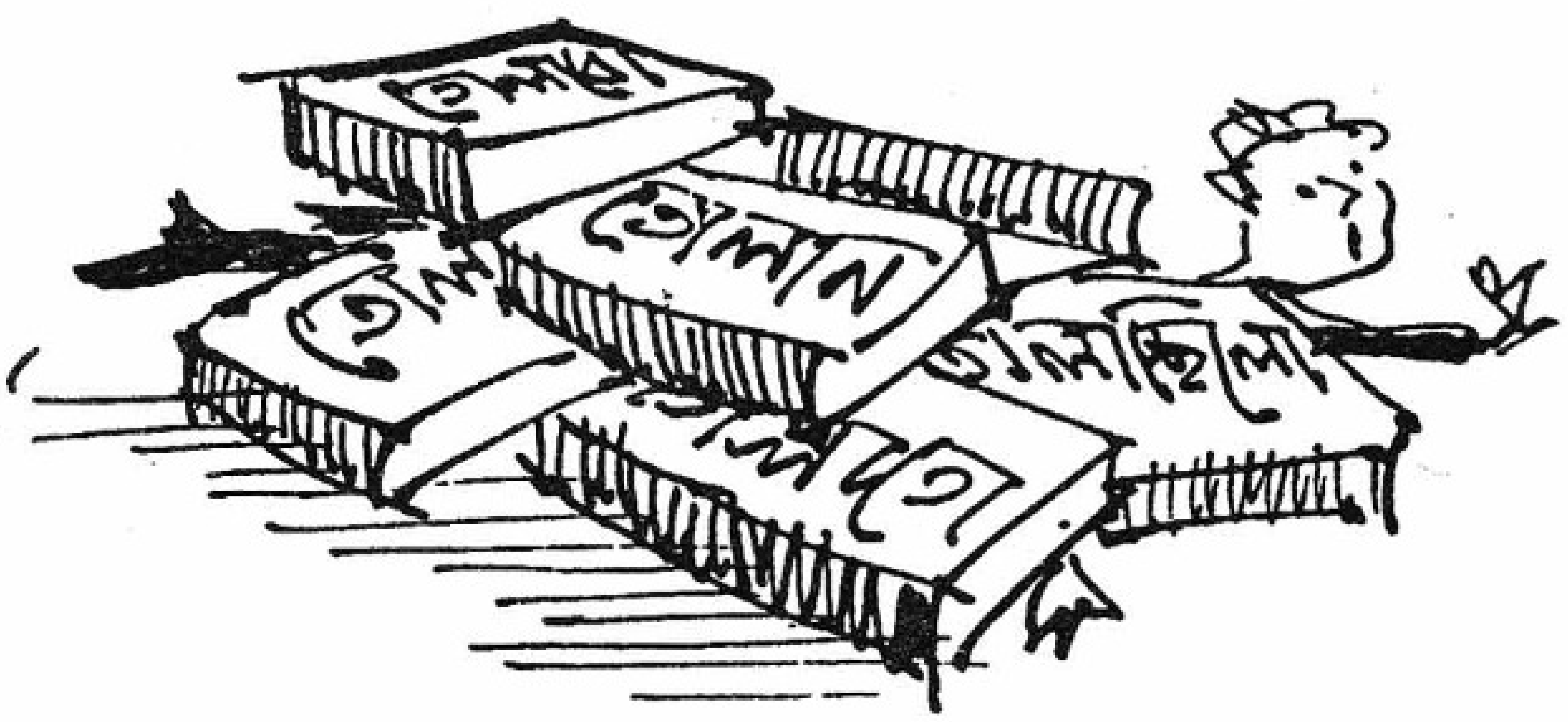
ফলে, তারিখ ও বারের হিসাব নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কলকাতার কলিন লেনে একটি চারতলা বাড়ি কিছু দিন আগে ভেঙে পড়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, ভেঙে পড়ার সময়টা কী ? আনন্দবাজার পত্রিকা লিখছে 'বুধবার শেষ রাতে'। আর স্টেটসম্যান লিখছে 'early on Thursday morning'। কোনটা ঠিক ? আসলে একটাও বেঠিক নয়। তফাত শুধু এই যে, বাংলা কাগজটি বারের হিসাব করেছে বাংলা মতে, আর ইংরেজি কাগজটি বারের হিসাব করেছে ইংরেজি মতে। আনন্দবাজার পত্রিকার যুক্তি, তখনও যেহেতু সূর্যোদয় হয়নি, তাই তখনও বুধবার। স্টেটসম্যানের যুক্তি, এটা রাত বারোটার পরের ঘটনা, তাই বুধের মেয়াদ কেটে গিয়ে তখন বৃহস্পতি চলছে।

তার পরেও অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায়। বারের ব্যাপারটা তো বোঝা গেল, কিন্তু সমস্যা সেখানেই মিটছে না, দুর্ঘটনার তারিখটা কী ? বাংলা কাগজে বাংলা মতে বার-গণনা করে যেমন 'বুধবার' লেখা হয়েছে, তারিখের ব্যাপারেও তেমন ওই বাংলা গণনা-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে লেখা যায় '১৪ ফাল্গুন'। মুশকিল এই যে, বাংলা কাগজের একেবারে প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় একবার বাংলা সন-তারিখের উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু তাবৎ খবরে লেখা হয় ইংরেজি তারিখ। ইংরেজি গণনা-পদ্ধতি অনুযায়ী বুধবার ছিল ২৭



ত

লিখুন	লিখবেন না
তোলাচ্ছ (তুলাইতেছ)	তোলাচ্ছো
তোলাচ্ছিল (তুলাইতেছিল)	তোলাচ্ছিলো
তোলাত (তুলাইত)	তোলাতো
তোলান (তুলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে তুলাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
তোলানো (তুলাইবার কাজ)	তোলান
তোলাব (তুলাইব)	তোলাবো
তোলাল (তুলাইল)	তোলালো
তোলো (তুলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে তুলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	তোল



থ

থই। **'থৈ'** লিখবেন না। (তুলনীয় : 'কই', 'খই', 'ছই', 'দই' ইত্যাদি।)
থইথই। **'থৈথৈ'** লিখবেন না। (তুলনীয় : 'হইহই'।)
থলি। **'থলী'** লিখবেন না।
থানকুনি। এক রকমের শাক। **'থানকুনী'** লিখবেন না।
থালি। **'থালী'** লিখবেন না।
থুতনি। **'থুতনী'** লিখবেন না।
থুড়থুড়ে, থুত্থুড়ে। **'থুরথুরে'** বা **'থুত্থুরে'** লিখবেন না।
থুড়ি। **'থুড়ী'**, **'থুরি'** বা **'থুরী'** লিখবেন না।

লিখুন	**লিখবেন না**
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের নির্দশন	
থামছ (থামিতেছ)	থামছো
থামছিল (থামিতেছিল)	থামছিলো
থামত (থামিত)	থামতো
থামব (থামিব)	থামবো
থামল (থামিল)	থামলো
থামাও (থামাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে থামাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
থামাচ্ছ (থামাইতেছ)	থামাচ্ছো
থামাচ্ছিল (থামাইতেছিল)	থামাচ্ছিলো
থামাত (থামাইত)	থামাতো
থামান (থামাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে থামাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—

থ

লিখুন	লিখবেন না
থামানো (থামাইবার কাজ)	থামান
থামাব (থামাইব)	থামাবো
থামাল (থামাইল)	থামালো
থামিয়েছিল (থামাইয়াছিল)	থামিয়েছিলো
থামিয়ো (থামাইয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	থামিও
থামো (থামিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে থামিয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	থাম
থেমে ছিল (গতিহীন অবস্থায় ছিল)	থেমেছিল
থেমেছিল (থামিয়াছিল)	থেমেছিলো
থেমো (থামিয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ	থেম



দ

লিখুন	লিখবেন না
দিল (দান করিল)	দিলো
দেওয়াও (দান করাও, ক্ষেত্র বিশেষে দান করাইয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
দেওয়াচ্ছ (দান করাইতেছ)	দেওয়াচ্ছো
দেওয়াচ্ছিল (দান করাইতেছিল)	দেওয়াচ্ছিলো
দেওয়াত (দান করাইত)	দেওয়াতো
দেওয়ান (দান করাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে দান করাইয়াছিলেন । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
দেওয়ানো (দান করাইবার কাজ)	দেওয়ান
দেওয়াব (দান করাইব)	দেওয়াবো
দেওয়াল (দান করাইল)	দেওয়ালো
দেব (দিব)	দেবো



ধ

ধড়িবাজ । অর্থ : 'কূটকৌশলী', 'ধূর্ত', 'ফন্দিবাজ', 'সেয়ানা' । **'ধড়ীবাজ'** লিখবেন না ।

ধন্বন্তরি । **'ধন্বন্তরী'** লিখবেন না ।

ধমনি । 'ধমনী' বানানও সমান শুদ্ধ । কিন্তু যেখানে দুই বানানই গ্রাহ্য, সেখানে আমরা ই-কারই দেব ।

ধরণি । এ-ক্ষেত্রেও একই কথা । আমরা 'ধরণী' না লিখে 'ধরণি'ই লিখব ।

ধরন । প্রচলিত এই বানানই গ্রাহ্য করুন । **'ধরণ'** লিখবেন না । **'ধারণ'** লিখতে কিন্তু 'মূর্ধন্য ণ' চাই । দুটি শব্দের বানান গুলিয়ে ফেলেন অনেকে ।

ধরনা, ধর্না । **'ধরণা'** বা **'ধর্ণা'** লিখবেন না ।

ধাড়ি । **'ধাড়ী'** লিখবেন না ।

ধানুকী । অর্থ : 'ধনুর্ধারী' । **'ধানুকি'** লিখবেন না ।

ধারণ । **'ধারন'** লিখবেন না । ('ধরন' দ্রষ্টব্য ।)

লিখুন	**লিখবেন না**
ধারালো	ধারাল
ধিক্কৃত, ধিকৃত	ধিকৃত
ধুনরি, ধুনুরি	ধুনরী, ধুনুরী
ধুনা	ধূনা
ধুম (আধিক্য, জাঁকজমক, প্রাচুর্য বা সমারোহ অর্থে)	ধূম
ধুলা	ধূলা
ধুলো	ধূলো
ধূম (ধোঁয়া অর্থে)	ধুম
ধূলি	ধুলি
ধূসর	ধুসর
ধ্বজা	ধজা

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

ধরছ (ধরিতেছ)	ধরছো
ধরছিল (ধরিতেছিল)	ধরছিলো

ধ

লিখুন	লিখবেন না
ধরত (ধরিত)	ধরতো
ধরব (ধরিব)	ধরবো
ধরল (ধরিল)	ধরলো
ধরাও (ধরাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ধরাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ধরাচ্ছ (ধরাইতেছ)	ধরাচ্ছো
ধরাচ্ছিল (ধরাইতেছিল)	ধরাচ্ছিলো
ধরাত (ধরাইত)	ধরাতো
ধরান (ধরাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ধরাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ধরানো (ধরাইবার কাজ)	ধরান
ধরাব (ধরাইব)	ধরাবো
ধরাল (ধরাইল)	ধরালো



ধ

লিখুন	লিখবেন না
ধরিয়েছিল (ধরাইয়াছিল)	ধরিয়েছিলো
ধরিয়ো (ধরাইয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ধরিও
ধরে ছিল (ধারণ করিয়া ছিল)	ধরেছিল
ধরেছিল (ধরিয়াছিল)	ধরেছিলো
ধরো (ধরিয়া থাকিবার কাজ করিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ধরিয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	ধর
ধোরো (ধরিয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ধোর



ন

নকশা । **'নকসা'**, **'নক্সা'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না ।

নকশি । **'নকশী'**, **'নকসি'**, **'নক্সি'**, **'নকসী'**, **'নক্সী'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না ।

নখ । **'নোখ'** লিখবেন না ।

নগণ্য । যা গোনার যোগ্য নয়, তা **'নগন্য'** নয়, **'নগণ্য'** ।

নচেৎ । **'নচেত'** লিখবেন না ।

নচ্ছার । **'নচ্ছাড়'** লিখবেন না ।

নজির । অর্থ : 'তুলনীয় ঘটনা বা পূর্ব-দৃষ্টান্ত' । কাগজে মাঝে-মাঝে **'নজীর'** বানান দেখা যায় । ঈ-কার লাগাবেন না ।

নথি । **'নথী'** লিখবেন না ।

নভশ্চর । **'নভোচর'** লিখবেন না ।

নাকি । অর্থ : 'অনুনাসিক' । যথা, 'নাকি কান্না', 'নাকি স্বরে কথা বলা' । **'নাকী'** লিখবেন না । এটি যখন কথার মাত্রা, তখন আবার আলাদা করে **'না কি'** লিখবেন না ।

নাগরি । মাটির পাত্র বিশেষ । যথা, 'গুড়ের নাগরি' । এই অর্থে ব্যবহার করলে **'নাগরী'** লিখবেন না । 'নাগরী'র অর্থ : 'রসিকা নারী', 'প্রণয়িনী' । 'নাগরী' একটি লিপিরও নাম ।

নাম । অ-বাংলা নানা নাম বাংলায় কীভাবে লেখা হবে, তা নিয়ে মাঝে-মাঝে সমস্যা দেখা দেয় । সমস্যা যে শুধুই ব্যক্তি-নাম নিয়ে, তা নয়, সমস্যা নানা রাষ্ট্র, রাজ্য, স্থান ও প্রতিষ্ঠানের-নাম নিয়েও ।[১] আদবানি, না আডবাণী ? পাকিস্থান, না পাকিস্তান ? পাঞ্জাব, না পঞ্জাব ? পুনা, না পুণে ? অ্যাকাডেমি, না অকাদেমি ?

এ-ব্যাপারে সকলের নীতি এক নয় । আনন্দবাজার পত্রিকা যে-নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী, তা নিম্নে বিবৃত হল :

রাষ্ট্র-নাম : বিভিন্ন রাষ্ট্রের নামের বানান বাংলায় এমনভাবে করা উচিত, যাতে সেখানকার স্থানীয় উচ্চারণ যথাসম্ভব আভাসিত হয় । দৃষ্টান্ত : ইংলন্ড নয়, ইংল্যান্ড ; পাকিস্থান নয়, পাকিস্তান ; রুমানিয়া নয়, রোমানিয়া । অধিকাংশ বিদেশি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের নামের যে-উচ্চারণ আমরা ইংরেজিতে পাই, আপাতত সেটাই গ্রাহ্য হবে । কথাটা এইজন্য বলছি যে, এখনই যদি আমরা বেলজিয়ামকে বেলজিক অথবা স্পেনকে এসপানা লিখতে শুরু করি, তা হলে স্থানীয় উচ্চারণকে সম্মান করা হলেও পাঠককে

১. অ-বাংলা/অ-ভারতীয় স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নাম বাংলায় কীভাবে লেখা উচিত, তা এই গ্রন্থের সূচনায় 'বানান-বিধি'র অন্তর্ভূত ২৮ নং ধারার 'খ' 'গ' ও 'ঘ' অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে বলা হয়েছে । এখানে তা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলা হল, এবং সেইসঙ্গে দেওয়া হল কিছু দৃষ্টান্ত ।

অসুবিধায় ফেলা হবে। এ-ক্ষেত্রে অতএব 'ধীরে চলো' নীতিই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া নয়, চেকোস্লোভাকিয়া। জুগোশ্লাভিয়া বা যুগোশ্লাভিয়া নয়, ইউগোস্লাভিয়া। একইসঙ্গে মনে রাখুন, অ-তৎসম শব্দে আনন্দবাজার পত্রিকা যেহেতু দীর্ঘস্বর ব্যবহারের পক্ষপাতী নয়, তাই এই কাগজে গ্রীস না লিখে গ্রিস এবং চীন না লিখে চিন লেখাই সংগত। ('চিন' থেকেই এসেছে চিন-রাজবংশের নাম। : এর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই।)

আরও মনে রাখুন, ইউরোপীয় রাষ্ট্রটির নাম 'নেদারল্যান্ডস', সুতরাং এই নামই লিখুন, রাষ্ট্র-নাম লিখতে গিয়ে 'হল্যান্ড' লিখবেন না। হল্যান্ড আসলে নেদারল্যান্ডসের একটি অংশ মাত্র। (নামটা এসেছে Holtlant থেকে, যার অর্থ দাঁড়ায় বনভূমি। Holt=বন, Lant=ভূমি।) যেমন কিছুকাল আগেও 'রাশিয়া' ছিল ইউ. এস. এস. আর. বা ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্স নামক রাষ্ট্রের একটা অংশ মাত্র, এও তেমন ব্যাপার।

রাজ্য-নাম ও স্থান-নাম : উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নাগরী লিপি প্রচলিত। ওই লিপিতে সেখানকার স্থায়ী অধিবাসীরা নিজ-নিজ রাজ্য ও রাজ্যের এলাকাভুক্ত নানা স্থানের নাম যে-বানানে লিখে থাকেন, বাংলা লিপিতেও সেই বানানই গ্রাহ্য। অসমিয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি লিপির সঙ্গেও বাংলা লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। এ-সব লিপিতে রাজ্য-নাম ও স্থান-নামের যে-বানান দেখা যায়, বাংলা লিপিতেও সেই বানান অনুসরণই সংগত হবে। লেখা উচিত হবে : অসম, অজিণ্ঠা, অহমদাবাদ, ইন্দৌর, ইলাহাবাদ, ওড়িশা, পঞ্জাব, পটনা, পটৌডী, পুণে ইত্যাদি।

দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ও লিপির সঙ্গে পরিচয় না থাকায় জানা শক্ত হবে, সেখানকার নানা রাজ্য-নাম ও স্থান-নামের স্থানীয় উচ্চারণ কী। জানা যদি একান্তই অসম্ভব হয়, তা হলে ইংরেজিতে এ-সব রাজ্য-নাম ও স্থান-নামের যে-বানান আমরা পাই, তারই উপরে নির্ভর করে চালাতে হবে বাংলা লিপ্যন্তরের কাজ।

প্রতিষ্ঠানের নাম : ভারতীয় নানা প্রতিষ্ঠানের নামের বানান বাংলা লিপিতে পাওয়া না গেলেও রোমান ও নাগরী লিপিতে পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে আনন্দবাজার পত্রিকার নীতি এই যে, নাগরী লিপিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের নামের যে-বানান করে থাকেন, বাংলা লিপিতেও সেই বানানই গ্রাহ্য করতে হবে। দৃষ্টান্ত : সাহিত্য অকাদেমি, ললিতকলা অকাদেমি, সংগীত নাটক অকাদেমি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, অ্যাকাডেমি ফর প্রফেশনালস অ্যান্ড

এগজিকিউটিভস, বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার।

যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তাঁদের নামের বানান লেখেন মহীন্দ্রা অ্যান্ড মহীন্দ্রা, তাঁদের ক্ষেত্রে ও তাঁদের ক্লাব-টিমের ক্ষেত্রে সেই বানানই গ্রাহ্য।

কলকাতার ক্লাবের নাম : মহমেডান স্পোর্টিং। ঢাকার ক্লাবের নাম : মোহামেডান স্পোর্টিং। এ-ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। কোথাকার ইলিশ বেশি স্বাদু, তা নিয়ে তর্ক চলুক, কিন্তু দুই স্পোর্টিংয়ের কার নামের বানান ঠিক, তা নিয়ে যেন তর্ক তুলবেন না। গঙ্গায়-পদ্মায় বানানের এই যে ফারাক, এটা 'স্পোর্টিংলি' মেনে নিন।

ব্যক্তি-নাম : বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব ভারতীয় অল্পবিস্তর বিখ্যাত, তাঁরা নিজ-নিজ নাম (ও পদবি) যে-পদ্ধতিতে ও যে-বানানে লিখে থাকেন, আনন্দবাজার পত্রিকাতেও তাঁদের বেলায় সেই পদ্ধতি ও সেই বানানই গ্রাহ্য। পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে, দুর্গাপ্রসাদ, রামসেবক, জানকীনন্দন, জাহ্নবীকুমার, চণ্ডীচরণ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি নামের যাঁরা অধিকারী, তাঁদের অনেকে এ-সব নাম ভেঙে দিয়ে আলাদা করে লেখেন : দুর্গা প্রসাদ, রাম সেবক, জানকী নন্দন, জাহ্নবী কুমার, চণ্ডী চরণ, চন্দ্র শেখর ইত্যাদি। নামের অর্থ তার ফলে পালটে যায় ঠিকই, কিন্তু অন্যজনের তো এ-ক্ষেত্রে কিছু করবার নেই, নিজের নাম যিনি যে-পদ্ধতিতে ও যে-বানানেই লিখুন, অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে অন্যদেরও সেই পদ্ধতি মানতে হবে ও সেই বানান গ্রাহ্য করতে হবে।

খান ও খাঁ। নিজ নামের বানানে যদি কেউ 'খাঁ' লেখেন, তবে আলাদা কথা, অন্যত্র 'খান' লিখুন। যথা : আরিফ মহম্মদ খান, মনসুর আলি খান পটৌডী। তা ছাড়া, খেতাবের ক্ষেত্রেও 'খান বাহাদুর', 'খান সাহেব'।

চিনা ব্যক্তি-নাম ও স্থান-নাম। ইংরেজিতে লিপ্যন্তরের ব্যাপারে ইদানীং প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ওয়েড-গাইলস পদ্ধতি অনুযায়ী এ-সব নাম ইংরেজিতে লিপ্যন্তরিত হত, এবং তারই ভিত্তিতে চলত বাংলা লিপ্যন্তরের কাজ। এখন সে-ক্ষেত্রে পাইনিয়িন পদ্ধতি অনুযায়ী ইংরেজি লিপ্যন্তরের কাজ চলে। পাইনিয়িন-ভিত্তিক লিপ্যন্তরে চিনা ব্যক্তি-নাম ও স্থান-নামের মূল উচ্চারণ অধিকতর নির্ভরযোগ্যভাবে আভাসিত হয় বলে বাংলা লিপ্যন্তরও এরই ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আমরা এই আধুনিক লিপ্যন্তর-পদ্ধতি অনুসরণ করব। ফলে, চিনের প্রয়াত নেতার নাম আমরা **মাও জেদং** লিখব, **মাও সে-তুং** লিখব না। সংবাদে প্রায়ই দেখা যায়, এমন আরও কয়েকটি চিনা ব্যক্তি-নাম ও স্থান-নাম বাংলায় কীভাবে লেখা হবে, তা দেখানো হল :

কিংদাও (আগে লেখা হত সিংতাও), **গুয়াংদং** (আগে লেখা হত কোয়াংটুং), **গুয়াংঝাও** (আগে লেখা হত ক্যান্টন), **জিংজিয়াং** (আগে লেখা হত সিনকিয়াং), **জিয়াং কিং** (মাও জেদংয়ের প্রয়াতা পত্নী), **ঝাও জিয়াং, তিয়ানজিন** (আগে লেখা হত তিয়েনসিন), **দেং জিয়াওপিং** (আগে লেখা হত তেং সিয়াওপিং), **হু ইয়াওবাং**।

দুটি কথা মনে রাখুন। প্রথমত, পাইনিয়িন-পদ্ধতিতে হাইফেন ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয়ত, চিনা ব্যক্তি-নামে পদবিটাই আগে আসে। সুতরাং, প্রথমবার উল্লেখের সময় পুরো নাম **দেং জিয়াওপিং** লিখবেন ঠিকই, কিন্তু পরে যখন সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন, তখন মিঃ জিয়াওপিং লেখা চলবে না, লিখতে হবে **মিঃ দেং**।

মনে রাখুন

(১) পাতিল নয়, পাটিল। প্যাটেল নয়, পটেল।
(২) বিখ্যাত সমাজসেবী মানুষটির পদবি আমতে নয়, আমটে। বালগঙ্গাধর তিলক নয়, টিলক।
(৩) অসমিয়া পদবি বড়ুয়া নয়, বরুয়া।
(৪) চ্যবন নয়, চহ্বাণ। চৌহান ভিন্ন পদবি।
(৫) স্মরণ সিং নয়, স্বর্ণ সিংহ। করণ সিং নয়, কর্ণ সিংহ।
(৬) তেওয়ারি নয়, তিওয়ারি। মানকড় নয়, মাঁকড়। আম্বেদকর নয়, অম্বেডকর।
(৭) মহারাষ্ট্রীয় পদবির শেষ তিন বর্ণ অনেক ক্ষেত্রে kar হয়। এর বাংলা লিপ্যন্তর 'কার' হবে না, 'কর' হবে। যথা গাওস্কর, বেঙ্গসরকর, আছরেকর, তেণ্ডুলকর।
(৮) 'জী' যাঁর নামের অংশ (যথা রামজীলাল সুমন), তিনি ঈ-কার ব্যবহার করুন, কিছু বলবার নেই, সেটাই আমাদের লিখতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ই-কার বাঞ্ছনীয়। বিশেষত, সম্মানার্থে যখন ব্যবহৃত হবে, তখন অবশ্যই 'জি'। যথা গান্ধীজি, বাপুজি, নেতাজি।



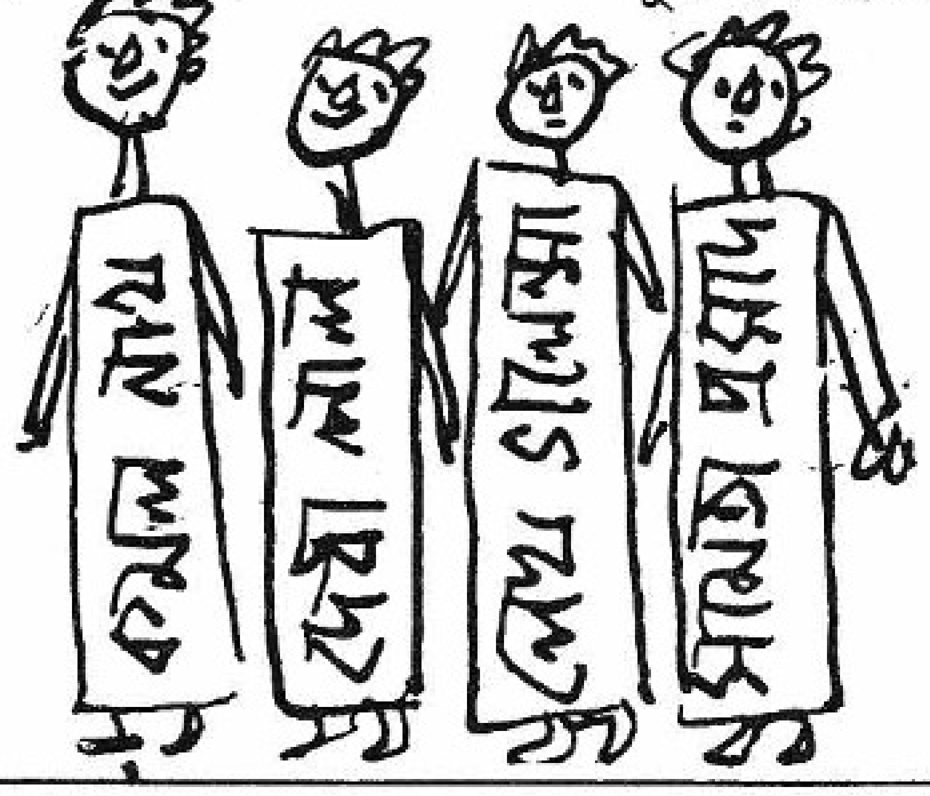
ন

পরিচিত কিছু নাম এখানে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল। যেমন রাজনীতি, তেমন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও নামগুলি আহৃত হয়েছে।

ব্যক্তি-নাম

অশোক গেলট
ইয়াসের আরাফত
এন. টি. রামরাও
এম. এল. ফোতেদার
এস. বি. চহ্বাণ
কপিল দেব
কমল নাথ
কর্ণ সিংহ
চন্দ্র শেখর
চিদম্বরম
টি. এন. শেষন
দিব্যেন্দু বড়ুয়া
দেবী লাল
পি ভি নরসিংহ রাও
প্রকাশ কারাত
বিজয় অমৃতরাজ
বিজয়রাজে সিন্ধিয়া
বিজু পট্টনায়ক
বিশ্বনাথন আনন্দ
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ
বেঙ্গল রাও
বেলুপিল্লাই প্রভাকরন

ভীমরাও রামজি অম্বেডকর
মনসুর আলি খান পটৌডী
মহম্মদ আজহারউদ্দিন
মিখাইল গোরবাচেভ
মোহিন্দর অমরনাথ
রণসিংহে প্রেমদাস
রাজেশ খন্না
রামস্বামী বেঙ্কটরামন
লালকৃষ্ণ আডবাণী
লিয়েন্ডার পেজ
লেখ ভালেন্সা
শচীন তেণ্ডুলকর
শাবানা আজমি
শিবজিরাও পাটিল নিলঙ্গেকর
শিবরাজ পাটিল
সত্যজিৎ রায়
সরকারিয়া
সলমন রুশদি
সামতা প্রসাদ
সুধাকর নায়েক
সুনীল গাওস্কর
সুবাস ঘিসিং



ন

স্থান-নাম

অজিণ্ঠা
অসম
আজেরবাইজান
ইউগোস্লাভিয়া
ইংল্যান্ড
ইলাহাবাদ
ওড়িশা
কনেটিকাট
কেরল
কোচি
খলিস্তান
(এটি অবশ্য বাস্তব কোনও স্থান নয়, শিখ উগ্রপন্থীরা দাবি করেছে এমন একটি কল্পভূমি)
গুজরাত
গুয়াহাটি
চিন
চেকোস্লোভাকিয়া
জাইরে
জিম্বাবোয়ে
তাইল্যান্ড
তাঞ্জাভুর
তিরুবনন্তপুরম
দার্জিলিং
দিঘা
নগাঁও
নদিয়া
পঞ্জাব
পটনা
পুণে
পেরুমপুদুর
বড়োল্যান্ড
বোম্বাই
ভোপাল
মায়ানমার
মালদহ
মেরঠ
লখনউ
লস অ্যাঞ্জেলেস
সুরাত
সোভিয়েত ইউনিয়ন
স্টকহলম
হায়দরাবাদ
হিউস্টন



ন

লিখুন	লিখবেন না
নামী (খ্যাতনামা অর্থে)	নামি
নিকারি	নিকারী
নিকাশি	নিকাশী
নিক্কণ	নিক্কণ
নিচু	নীচু
নির্ঘাত	নির্ঘাৎ
নিরুপম	নিরূপম
নিরূপণ	নিরুপণ
নিস্পৃহ, নিঃস্পৃহ	নিষ্পৃহ
নীচে	নিচে
নেওয়া	নেয়া
নেতাজি	নেতাজী
নেপালি	নেপালী
নেহাত	নেহাৎ
নোটিস	নোটিশ

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

নামছ (নামিতেছ)	নামছো
নামছিল (নামিতেছিল)	নামছিলো
নামত (নামিত)	নামতো
নামব (নামিব)	নামবো
নামল (নামিল)	নামলো
নামাও (নামাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে নামাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
নামাচ্ছ (নামাইতেছ)	নামাচ্ছো

ন

লিখুন	লিখবেন না
নামাচ্ছিল (নামাইতেছিল)	নামাচ্ছিলো
নামাত (নামাইত)	নামাতো
নামান (নামাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে নামাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	—
নামানো (নামাইবার কাজ)	নামান
নামাব (নামাইব)	নামাবো
নামাল (নামাইল)	নামালো
নামিয়েছিল (নামাইয়াছিল)	নামিয়েছিলো
নামিয়ো (নামাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	নামিও
নামো (নামিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে নামিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	নাম
নেমেছিল (নামিয়াছিল)	নেমেছিলো
নেমো (নামিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	নেম



প

পক্ক। ব-ফলার কথাটা মনে রাখুন। কাগজে অনেক সময় **'পক্ক'** বানান বার হয়, সেটা ভুল বানান।

পক্ষিরাজ। **'পক্ষীরাজ'** লিখবেন না।

পক্ষ্ম। ইংরেজি 'আইল্যাশ'। **'পক্ষ'** লিখলে ভুল হবে, ম-ফলা চাই।

পঞ্জাব। **'পাঞ্জাব'** লিখবেন না। পঞ্জাবের অধিবাসী = পঞ্জাবি। তবে ধুতির সঙ্গে যা পরিধেয়, তা 'পাঞ্জাবি'। ('নাম' দ্রষ্টব্য।)

পঞ্জি। **'পঞ্জী'** লিখবেন না।

পঞ্জিকা। সৌর পঞ্জিকা (বা সৌর-গণনাভিত্তিক বর্ষ-পঞ্জিকা) প্রধানত পাঁচটি : ***গ্রেগরিয়ান, হিন্দু, ইরানি, ইথিয়পীয় ও ইহুদি।*** গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা আমাদের কাছে ইংরেজি ক্যালেন্ডার হিসাবেই পরিচিত। পাঁচ পঞ্জিকার প্রতিটিতেই আছে বারোটি করে মাস। প্রতিটি পঞ্জিকার নীচে তার মাসগুলির নাম যেমন দেওয়া হল, তেমন প্রতিটি মাসের পাশে ব্র্যাকেটে দেওয়া হল সেই মাসের দিন-সংখ্যা। তা ছাড়া, বিভিন্ন পঞ্জিকার মাসগুলি এখানে এমনভাবে বিন্যস্ত হল, যাতে বোঝা যায় যে, ইংরেজি ক্যালেন্ডারের কোন মাসে সূচনা হয় অন্যান্য পঞ্জিকার কোন মাসের।

ইংরেজি	*হিন্দু*	*ইরানি*
জানুয়ারি (৩১)	মাঘ (৩০)	বাহ্‌মন (৩০)
ফেব্রুয়ারি (২৮/২৯)	ফাল্গুন (৩০)	এসফান্দ (২৮/২৯)
মার্চ (৩১)	চৈত্র (৩০)	ফাবরদিন (৩১)
এপ্রিল (৩০)	বৈশাখ (৩১)	অর্দিবেহেস্ত (৩১)
মে (৩১)	জ্যৈষ্ঠ (৩১)	খোরদাদ (৩১)
জুন (৩০)	আষাঢ় (৩১)	তির (৩১)
জুলাই (৩১)	শ্রাবণ (৩১)	মোরদাদ (৩১)
অগস্ট (৩১)	ভাদ্র (৩১)	শরিবার (৩১)
সেপ্টেম্বর (৩০)	আশ্বিন (৩০)	মেহ্‌র (৩০)
অক্টোবর (৩১)	কার্তিক (৩০)	আবন (৩০)
নভেম্বর (৩০)	অগ্রহায়ণ (৩০)	আজার (৩০)
ডিসেম্বর (৩১)	পৌষ (৩০)	দে (৩০)



প

মুসলিম নববর্ষ	ইংরেজি তারিখ	বাংলা তারিখ
১৪১৫	৯ জুন, ১৯৯৪	২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১
১৪১৬	৩০ মে, ১৯৯৫	১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২
১৪১৭	১৮ মে, ১৯৯৬	৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩

তারিখ ও তিথি নির্ণয়। বিভিন্ন বাংলা পঞ্জিকার গণনায় এ-ব্যাপারে পার্থক্য দেখা যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অনুসারী।

পটীয়সী। দুটিই যে ঈ-কার, সেটা মনে রাখুন। (তুলনীয় : 'গরীয়সী', 'পাপীয়সী', 'ভাগীরথী', 'মহীয়সী', 'হরীতকী'।)

পটেল। **'প্যাটেল'** লিখবেন না। (সর্দার বল্লভভাই **পটেল**, ড. ইন্দ্রপ্রসাদ গোবর্ধনভাই **পটেল**। 'নাম' দ্রষ্টব্য।)

পট্টনায়ক। **'পটনাইক'**, **'পটনায়েক'**, **'পট্টনাইক'**, **'পট্টনায়েক'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না। ('নাম' দ্রষ্টব্য।)

পড়শি। অর্থ : **'প্রতিবেশী'**। অনেকে **'পড়শী'** লেখেন, কাগজে তা ছাপাও হয়। ঈ-কার লাগাবেন না।

পরিমাপ। আয়তন, ঘনতা, দৈর্ঘ্য, গতিবেগ, ঘনফল ও ধারিকা শক্তি, ওজন, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি পরিমাপ বা নির্ণয়ের নানাপ্রকার ইউনিট বা একক রয়েছে। যেমন, ধরা যাক, কোনও কিছুর দৈর্ঘ্য যেমন ইঞ্চি, ফুট ও গজ দিয়ে বোঝানো যায়, তেমন বোঝানো যায় সেন্টিমিটার, মিটার ইত্যাদি দিয়েও। নীচে যে সারণি দেওয়া হল, তা থেকে নানা ধরনের ইউনিটের সম্পর্ক বোঝা যাবে। হিসাবটা যে সর্বক্ষেত্রে একেবারে টায়টায় মিলবে, তা নয়, তবে ফারাক যদি কিছু ঘটেও, তবে তা যৎসামান্য।

ঘনতা

ব্রিটিশ গ্যালনপিছু ৪ আউন্স	=	লিটারপিছু ২৫ গ্রাম
ব্রিটিশ গ্যালনপিছু ২ আউন্স	=	লিটারপিছু ১৫ গ্রাম
প্রতি ঘন ফুটে ১ পাউন্ড	=	প্রতি ঘন মিটারে ১৬ কিলোগ্রাম
প্রতি ঘন ফুটে ৬২$\frac{১}{২}$ পাউন্ড	=	প্রতি লিটারে ১ কিলোগ্রাম
	=	ঘনতা ১

প

দৈর্ঘ্য

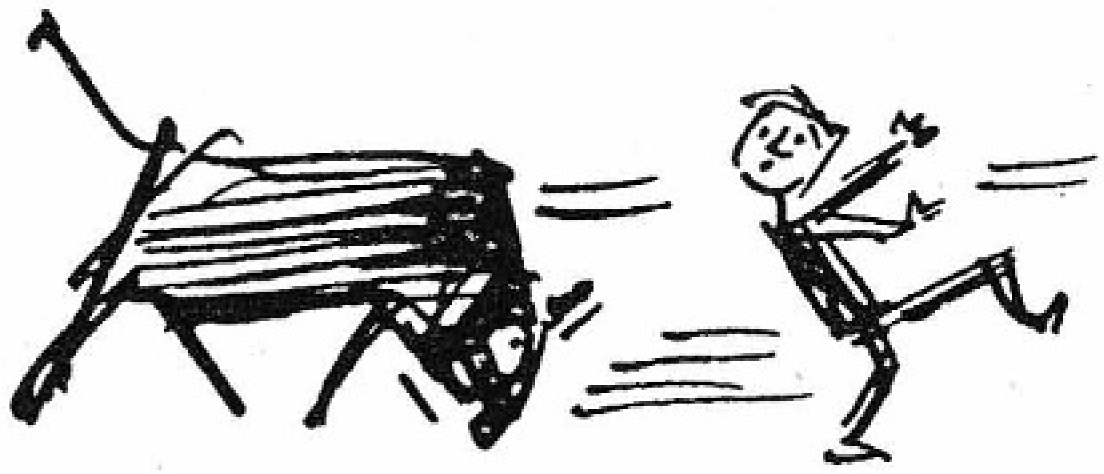
অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ	=	১ ইঞ্চি
	=	২৫ মিলিমিটার
১ ইঞ্চি	=	$২\frac{১}{২}$ সেন্টিমিটার
২ ইঞ্চি	=	৫ সেন্টিমিটার
১ ফুট	=	৩০ সেন্টিমিটার
	=	০·৩ মিটার
$৩\frac{১}{৪}$ ফুট	=	১ মিটার
৩৯ ইঞ্চি	=	১ মিটার
১১ গজ	=	১০ মিটার
$\frac{৫}{৮}$ মাইল	=	১ কিলোমিটার
৮ মাইল	=	৭ নটিক্যাল মাইল (আন্তর্জাতিক)

গতিবেগ

ঘণ্টাপিছু ২ মাইল	=	সেকেন্ডপিছু ৩ ফুট
ঘণ্টাপিছু ১১ কিলোমিটার	=	সেকেন্ডপিছু ১০ ফুট
ঘণ্টাপিছু ৩০ মাইল	=	ঘণ্টাপিছু ৪৮ কিলোমিটার
ঘণ্টাপিছু ৫০ মাইল	=	ঘণ্টাপিছু ৮০ কিলোমিটার
ঘণ্টাপিছু ৭০ মাইল	=	ঘণ্টাপিছু ১১৩ কিলোমিটার

উৎপাদনশীলতা

একরপিছু ৩ ব্রিটিশ বা মার্কিন বুশেল	=	হেক্টারপিছু ২ কুইন্টাল
একরপিছু ১০ ব্রিটিশ বা মার্কিন বুশেল	=	হেক্টারপিছু ৯ হেক্টোলিটার
একরপিছু ১ ব্রিটিশ হন্দর	=	হেক্টারপিছু $১\frac{১}{৪}$ কুইন্টাল
একরপিছু ১ ব্রিটিশ টন	=	হেক্টারপিছু $২\frac{১}{২}$ টন
একরপিছু ৯ পাউন্ড	=	হেক্টারপিছু ১০ কিলোগ্রাম



প

আয়তন

১ বর্গ ইঞ্চি	=	৬½ বর্গ সেন্টিমিটার
২ বর্গ ইঞ্চি	=	১৩ বর্গ সেন্টিমিটার
১০¾ বর্গ ফুট	=	১ বর্গ মিটার
৪৩ বর্গ ফুট	=	৪ বর্গ মিটার
৬ বর্গ গজ	=	৫ বর্গ মিটার
২½ একর	=	১ হেক্টার
৫ একর	=	২ হেক্টার
২৫০ একর	=	১ বর্গ কিলোমিটার
৩ বর্গ মাইল	=	৮ বর্গ কিলোমিটার

পান (pun)। ধ্বনিনির্ভর কৌতুকালঙ্কার বা শ্লেষালঙ্কার। এই অলঙ্কার যাঁদের প্রিয়, একই শব্দ বা একই ধ্বনির শব্দকে তাঁরা, কৌতুক বা শ্লেষের উদ্দেশ্যে, ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করতে ভালবাসেন। দৃষ্টান্ত : পান খাওয়ার কুফল সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে তাঁরা লিখতে প্রলুব্ধ হন 'পানাসক্তির কুফল'। 'পানাসক্তি' বলতে যে পানের প্রতি আসক্তি নয়, 'সুরাসক্তি' বোঝায়, তা তাঁরা জানেন অবশ্যই, তবু শব্দ নিয়ে খেলা করবার অভ্যাসটা তাঁরা ছাড়তে পারেন না। কিন্তু এই ধরনের খেলা একমাত্র লঘু রচনায় বা ফিচারের পাতায় চলতে পারে, সিরিয়াস রচনায় ও প্রতিবেদনে পান (pun) সর্বৈব পরিত্যাজ্য।

প্রোফেসর। কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ান, তাঁদের সকলকেই যে প্রোফেসর বলা যায়, তা নয়। 'প্রোফেসর' বলতে একটি নির্দিষ্ট পদের অধিকারীকে বোঝায়। তাঁকে অবশ্যই 'প্রোফেসর' বা 'অধ্যাপক' বলবেন। যেমন 'রিডার' পদের অধিকারীকে বলবেন 'রিডার'। তা ছাড়া আছেন 'সহকারী অধ্যাপক' বা 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর' ও 'লেকচারার'। শেষোক্তদের ক্ষেত্রে 'শিক্ষক' শব্দটি ব্যবহার করাই সংগত।

লিখুন	**লিখবেন না**
পণপ্রথা	পনপ্রথা
পতপত	পৎপৎ
পথিকৃৎ	পথিকৃত
পদবি	পদবী
পনরো, পনেরো	পনর, পনের

প

লিখুন	লিখবেন না
পনির	পনীর
পয়েন্ট ('হরফ' দেখুন)	—
পরকীয়া	পরকিয়া
পরগনা	পরগণা
পরজীবী	পরজীবি
পরভৃৎ (আপন আশ্রয়ে অন্যের পালক। সাধারণত কাক)	পরভৃত
পরভৃত (অন্যের আশ্রয়ে পালিত। সাধারণত কোকিল)	পরভৃৎ
পরমাণু	পরমানু
পরা (পরিধান করা অর্থে)	পড়া
পরান (প্রাণ অর্থে)	পরাণ
পরিদেবনা	পরিবেদনা
পরিমাণ	পরিমান
পরিষেবা	পরিসেবা
পরিষ্কার	পরিস্কার
পরিস্ফুট	পরিষ্ফুট, পরিষ্ফূট, পরিস্ফূট
পরিস্রাবণ (শোধন, ফিলট্রেশন)	পরিশ্রাবণ
পরিস্রুত (শোধিত হয়েছে এমন, ফিলটার্ড)	পরিশ্রুত
পাইকা ('হরফ' দেখুন)	—
পাউরুটি	পাঁউরুটি
পাকিস্তানি	পাকিস্তানী
পাগড়ি	পাগড়ী
পাঁচালি	পাঁচালী
পাটনি	পাটনী

প

লিখুন	লিখবেন না
পাটিল	পাতিল
(পদবি বিশেষ। 'নাম' দেখুন)	
পাঠানি	পাঠানী
পাণিনি	পানিণী, পানিনি, পানিনী
পাদরি, পাদ্রি	পাদরী, পাদ্রী
পানসি	পানসী
পাপড়ি	পাঁপড়ি
পালকি	পালকী
পারস্পরিক	পারস্পারিক
পার্থসারথি	পার্থসারথী
পাসপোর্ট	পাশপোর্ট
পিএইচ. ডি.	পি. এইচ. ডি.
পিসি	পিসী
পীড়াপীড়ি	পীড়াপিড়ি
পুণ্য	পুন্য, পূণ্য
পুথি	পুঁথি
পুব	পূব
পুরসভা	পৌরসভা
পুরস্কার	পুরষ্কার
পুরোহিত	পুরহিত
পুলিশ	পুলিস
পুলিশি	পুলিশী, পুলিসি, পুলিসী
পূর্বাহ্ণ	পূর্বাহ্ন
পেনশন	পেনসন
পেশি	পেশী
পৈতৃক	পৈত্রিক
পোশাক	পোষাক
পৌঁছেছে	পৌঁচেছে, পৌঁছেচে
পৌনঃপুনিক	পৌনপুনিক
পৌরোহিত্য	পৌরহিত্য
প্যারাগ্রাফ	—
('অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ' দেখুন)	

প

লিখুন	লিখবেন না
প্যারেনথিসিস	—
('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	
প্রজ্বালিত	প্রজ্জালিত, প্রজ্জ্বালিত
প্রতীক	প্রতিক
প্রতীকী	প্রতিকী
প্রদ্যোত	প্রদ্যোৎ
প্রবীণ	প্রবীন
প্রভিডেন্ট	প্রভিডেন্ড
প্রশ্নচিহ্ন	
('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	
প্রস্ত	প্রস্থ
(কিস্তি বা দফা অর্থে)	
প্রস্থ	প্রস্ত
(চওড়ার দিকের মাপ)	
প্রাঙ্গণ	প্রাঙ্গন
প্রাতরাশ	প্রাতঃরাশ
প্রার্থিপদ	প্রার্থীপদ
প্রীতিভাজন	প্রিয়ভাজন, প্রীতিভাজনীয়
প্রুফ	—
('সংশোধন, প্রুফ' দেখুন)	
প্রোজ্জ্বল	প্রোজ্জল, প্রোজ্বল

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

পড়ছ	পড়ছো
(পড়িতেছ)	
পড়ছিল	পড়ছিলো
(পড়িতেছিল)	
পড়ত	পড়তো
(পড়িত)	
পড়ব	পড়বো
(পড়িব)	
পড়ল	পড়লো
(পড়িল)	

প

লিখুন	লিখবেন না
পড়াও (পড়াইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে পড়াইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
পড়াচ্ছ (পড়াইতেছ)	পড়াচ্ছো
পড়াচ্ছিল (পড়াইতেছিল)	পড়াচ্ছিলো
পড়াত (পড়াইত)	পড়াতো
পড়ান (পড়াইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে পড়াইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
পড়ানো (পড়াইবার কাজ)	পড়ান
পড়াব (পড়াইব)	পড়াবো
পড়াল (পড়াইল)	পড়ালো
পড়িয়েছিল (পড়াইয়াছিল)	পড়িয়েছিলো
পড়িয়ো (পড়াইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	পড়িও
পড়ো (পড়িয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে পড়িয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	পড়
পড়ে ছিল (পতিত অবস্থায় ছিল)	পড়েছিল
পড়েছিল (পড়িয়াছিল)	পড়েছিলো
পোড়ো (পড়িয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	পোড়

ফ

ফকির। **'ফকীর'** লিখবেন না।

ফন্দি। **'ফন্দী'** লিখবেন না।

ফরাসি। **'ফরাসী'** লিখবেন না। (তুলনীয় : 'আরবি', 'জাপানি', 'তুর্কি', 'নেপালি', 'পাকিস্তানি', 'ভুটানি' ইত্যাদি।)

ফল। অর্থ : 'পরিণাম'। যথা, 'অপচয়ের ফল অনটন'। এই অর্থে কদাচ **'ফলশ্রুতি'** লিখবেন না।

ফানুস। **'ফানুশ'** লিখবেন না।

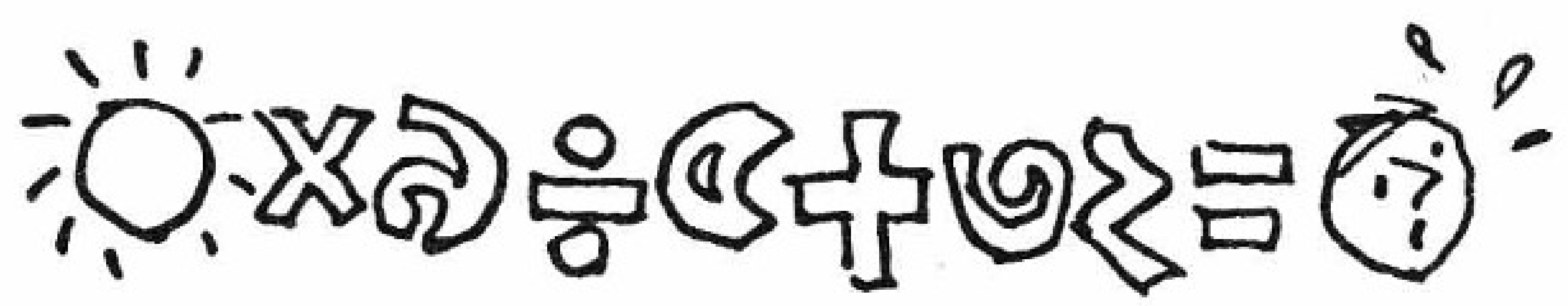
ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস। ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস, নাম দুটি দুই বিজ্ঞানীর। প্রথমজন জার্মান, দ্বিতীয়জন সুইডিশ। দুজনেই সপ্তদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন ও অষ্টাদশ শতকে মারা যান।

কাগজে এক সময়ে ফারেনহাইটের হিসাবে তাপাঙ্কের খবর দেওয়া হত। এখন দেওয়া হয় সেলসিয়াসের হিসাবে। কিন্তু ফারেনহাইটের স্মৃতি যে তাই বলে একেবারেই মুছে গিয়েছে, তা নয়। বস্তুত যাঁরা প্রবীণ মানুষ, সেলসিয়াসের হিসাব দেখে তাঁদের মনে এখনও প্রশ্ন জাগে, ফারেনহাইটের হিসাবে অঙ্কটা কী দাঁড়াত। সেটা কিন্তু সহজেই জেনে নেওয়া যায়। পদ্ধতিটা এই রকম :

সেলসিয়াসের হিসাবে যে তাপাঙ্ক পাচ্ছি, তাকে ৯ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, তাকে ভাগ করতে হবে ৫ দিয়ে। অতঃপর ভাগফলের সঙ্গে ৩২ যোগ করলেই পাওয়া যাবে ফারেনহাইটের তাপাঙ্ক। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখন ডিসেম্বর মাস, কাল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল, আজ কাগজ খুলে দেখছি, সেলসিয়াসের হিসাবে কাল সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক ছিল ১০°। **প্রশ্ন** : ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে কত ডিগ্রি ফারেনহাইট ?

উত্তর : ১০×৯ = ৯০। ৯০÷৫ = ১৮। ১৮+৩২ = ৫০। অর্থাৎ কাল ফারেনহাইটের হিসাবে সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক ছিল ৫০ ডিগ্রি।

এরই উল্টো পথে হিসাব কষে যাওয়া হয় ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াসে। সে-ক্ষেত্রে ফারেনহাইটের হিসাবে যে-তাপাঙ্ক পাচ্ছি, তার থেকে প্রথমে ৩২ বাদ দিতে হবে। তাতে যে-সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, তাকে গুণ করতে হবে ৫ দিয়ে। অতঃপর সেই গুণফলকে ৯ দিয়ে ভাগ করলেই আমরা সেলসিয়াসে পৌঁছে যাব।



ফ

লিখুন	লিখবেন না
ফাঁসি	ফাঁসী
ফুরসত	ফুরসৎ
ফুর্তি	ফূর্তি
ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারী
ফোকর	ফোকড়, ফোঁকড়, ফোঁকর
ফৌত	ফৌৎ
ফৌজদারি	ফৌজদারী
ফৌজি	ফৌজী
ফ্রি	ফ্রী
ফ্রিডম	ফ্রীডম

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

ফেলছ (ফেলিতেছ)	ফেলছো
ফেলছিল (ফেলিতেছিল)	ফেলছিলো
ফেলত (ফেলিত)	ফেলতো
ফেলব (ফেলিব)	ফেলবো
ফেলল (ফেলিল)	ফেললো
ফেলাও (ফেলাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ফেলাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	—
ফেলাচ্ছ (ফেলাইতেছ)	ফেলাচ্ছো
ফেলাচ্ছিল (ফেলাইতেছিল)	ফেলাচ্ছিলো
ফেলাত (ফেলাইত)	ফেলাতো

ফ

লিখুন	লিখবেন না
ফেলান (ফেলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ফেলাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ফেলানো (ফেলাইবার কাজ)	ফেলান
ফেলাব (ফেলাইব)	ফেলাবো
ফেলাল (ফেলাইল)	ফেলালো
ফেলিয়েছিল (ফেলাইয়াছিল)	ফেলিয়েছিলো
ফেলিয়ো (ফেলিবার কাজটা করাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ফেলিও
ফেলেছিল (ফেলিয়াছিল)	ফেলেছিলো
ফেলো, ফ্যালো (ফেলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ফেলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ফেল, ফ্যাল
ফেলো (ফেলিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ফেল



ব

বই কী। **'বই কি', 'বৈ কি', 'বৈ কী'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না।
বউনি। অর্থ : 'দিনের প্রথম বিক্রি'। **'বউনী'** লিখবেন না।
বকশিশ। **'বকশিস', 'বকশীশ', 'বকসিশ', 'বকসিস', 'বকসীশ', 'বকসীস'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না।
বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষণ। বক্তা বিখ্যাত হলেই যে তাঁর বক্তৃতাও হবে গুরুত্বপূর্ণ, এমন কোনও কথা নেই। হতে পারে, না-ও পারে। অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। বিখ্যাত সব রাজনৈতিক নেতার কথাই ধরা যাক। চর্মশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন থেকে অবসর-নিকেতনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, হরেক উপলক্ষে যে-সব বক্তৃতা তাঁরা দিয়ে থাকেন, তার অধিকাংশই চর্বিতচর্বণ মাত্র, সুতরাং খবর হিসাবে মূল্যহীন।

বক্তার খ্যাতিতে বিভ্রান্ত না হয়ে সাংবাদিককে এই সহজ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, তাঁকে খবর সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়েছে, বস্তাপচা পুরনো কথার পুনরুক্তির বিবরণ সংগ্রহ করতে নয়। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে, বক্তৃতার মধ্যে এমন কথা আছে কি না, খবর হিসাবে যা গুরুত্বপূর্ণ। বেশির ভাগ বক্তৃতাতেই তা থাকে না। যে অল্পসংখ্যক বক্তৃতায় থাকে, তারও সমস্ত অংশ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হবার যোগ্য নয়। মামুলি কথার তাবৎ ফেনা সরিয়ে সাংবাদিককে সেখানে শুধু সারাংশটুকুই গ্রহণ করতে হবে।

যেমন একবার করা হয়েছিল সার উইনস্টন চার্চিলের ক্ষেত্রে। পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে উঠে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "The arrival of the hydrogen bomb has rendered previous strategical conceptions obsolete." সুয়েজে ঘাটি রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে যেহেতু তখন তুমুল বিতর্ক চলছিল, সাংবাদিকদের তাই বুঝে নিতে ভুল হয়নি, সার উইনস্টনের এই উক্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ঠিকই আঁচ করেছিলেন যে, ব্রিটেন এবারে সুয়েজের ঘাটি ছেড়ে চলে আসতে চায়।

খবর চিনবার এটা অবশ্য বিদেশি দৃষ্টান্ত। তাও পুরনো দৃষ্টান্ত। এবারে একটা দেশি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একেবারে হাল আমলের দৃষ্টান্ত। "...হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালকে আজ ছ' বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল।" নয়াদিল্লি থেকে ২০ মার্চ তারিখে পাঠানো এই খবর পরদিন (২১ মার্চ, ১৯৯১) আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। একই দিনের অন্যান্য কাগজেও এই খবরটা বার হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটে যাবার আগে অন্য কোনও কাগজ কি এমন আভাস দিয়েছিল যে, বহিষ্কার এবারে আসন্ন ?

একমাত্র 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকা দিয়েছিল। বস্তুত, ২০ মার্চ তারিখেই 'দ্য

টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ছ'-কলম-জোড়া হেডলাইনের তলায় খবর ছিল যে, কংগ্রেস থেকে তাঁকে যাতে বহিষ্কার করা হয়, তারই জন্য বংশীলাল চেষ্টা চালাচ্ছেন। হেডলাইন ছিল : 'Bansi Lal forcing Cong to expel him'। খবরটা যিনি পাঠিয়েছিলেন, তাঁর কয়েকটি সূত্রের অন্যতম ছিল একটি বক্তৃতা, বংশীলাল যাতে রাজীব গান্ধীকে 'মূর্খ' বলতে কুণ্ঠিত হননি। তারই থেকে সংবাদদাতা আঁচ করেন যে, বংশীলাল এবারে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হতেই ব্যগ্র।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন কথাটা খবর বলে গণ্য হবে, এবং কোন কথাটা তা হবে না। উত্তরে সাধারণভাবে যা বলা যায়, তা এই যে, কারও কোনও উক্তি খবর বলে গণ্য হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল, তার মধ্যে নূতনত্ব থাকা চাই। যে-কথা হাজার লোকে হাজার বার বলেছেন, এবং যা শুনতে-শুনতে শ্রোতাদের কান পচে যাওয়ার উপক্রম, তার মধ্যে কোনও নূতনত্ব নেই, ফলত খবর বলে গণ্য হওয়ার কোনও যোগ্যতাও তার নেই।

নূতনত্বেরও অবশ্য থাকতে পারে প্রকারভেদ। নীচে যে শ্রেণী-বিভাগ করা হল, তার থেকেই সেটা স্পষ্ট হবে :

(ক) বক্তার আদর্শে/সিদ্ধান্তে কিংবা তথ্যে/যুক্তিতে নূতনত্ব থাকলে তা খবর বলে গণ্য হবে।

(খ) আদর্শে/সিদ্ধান্তে কিংবা তথ্যে/যুক্তিতে নূতনত্ব না থাকলেও তা খবর বলে গণ্য হবে, যদি কিনা বক্তাটি যে তেমন আদর্শ/সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন কিংবা পেশ করতে পারেন তেমন তথ্য/যুক্তি, এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত হয়। (প্রত্যাশিত নয় বলেই সেখানে আর-এক প্রকারের নূতনত্বের চমক থাকছে।) দৃষ্টান্ত : বিখ্যাত কোনও কমিউনিস্ট নেতা যদি সনাতন ধর্মাদর্শের প্রশংসা করেন তাঁর বক্তৃতায়, এবং প্রাচীন সেই ধর্মাদর্শের সপক্ষে উপস্থাপন করেন পুরনো নানা যুক্তি, তবে তা অবশ্যই খবর।

(গ) যুগ ও পরিবেশ কিংবা দেশ ও কালের ভিন্নতাও নানা পুরনো সিদ্ধান্ত ও যুক্তিকে আবার খবর করে তুলতে পারে। দৃষ্টান্ত : মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত কিংবা সেই আন্দোলনের সপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি যতই পুরনো হোক, পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশে যখন শাসক-সমাজের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেই একই ধাঁচের আন্দোলনের সূচনা হয়, এবং আন্দোলনের নেতাদের বক্তৃতায় তাঁদের আন্দোলনের সপক্ষে পেশ করা হয় একই যুক্তি, তখন পুনশ্চ সেটা খবর হয়ে ওঠে।

কী বলা হচ্ছে, কে বলছেন, কখন বলছেন ও কোথায় বলছেন, এ-সব

প্রশ্নের প্রতিটিই তাই তাৎপর্যপূর্ণ। ফলত, বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুষ্ঠান 'কভার' করতে যাঁকে পাঠানো হয়েছে, এর কোনওটি সম্পর্কেই তাঁর উদাসীন থাকা চলে না। বস্তু, ব্যক্তি, স্থান ও কাল, সবই তাঁকে সতর্কভাবে বিচার করে দেখতে হয়।

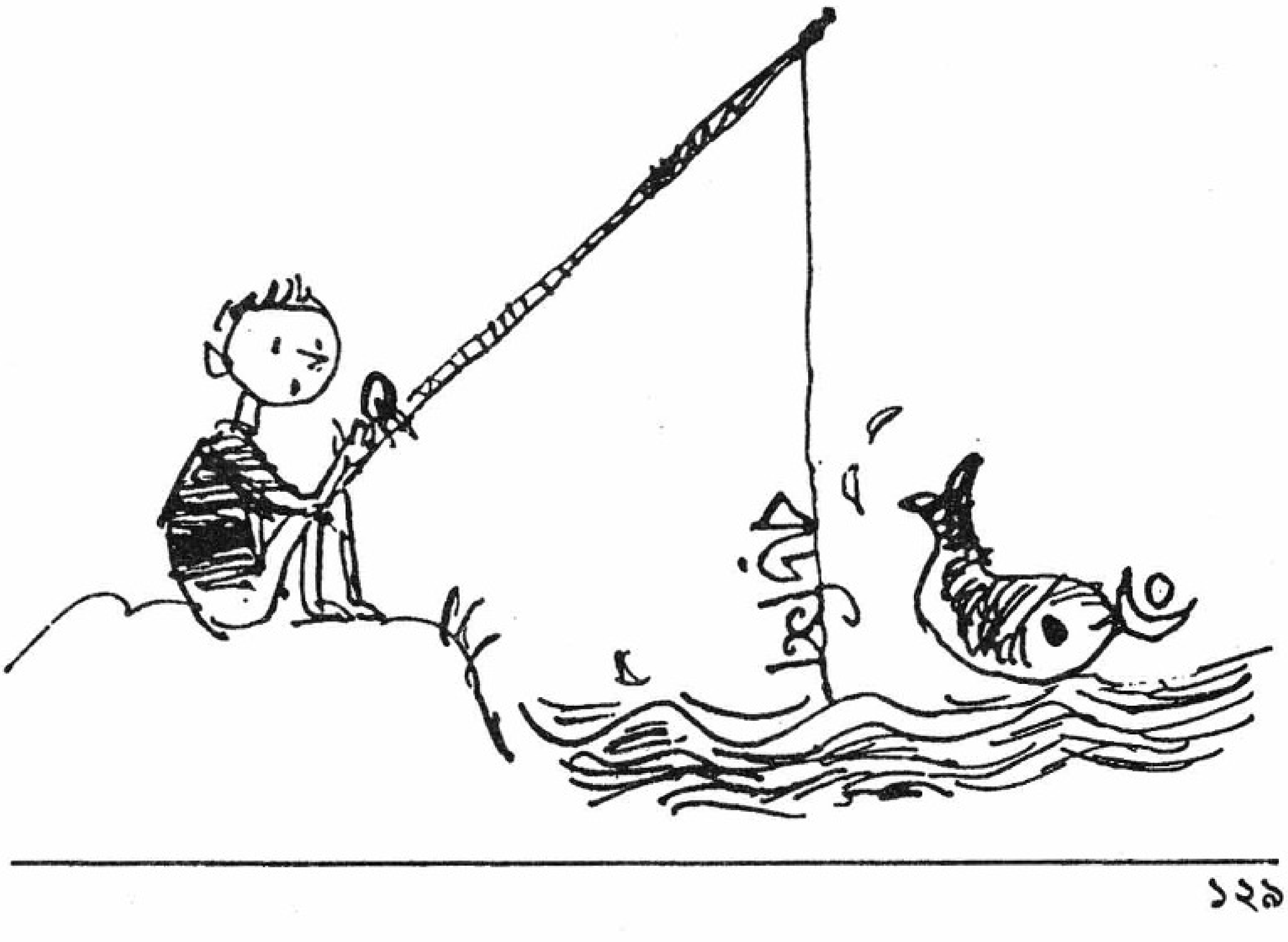
যেমন মৌখিক বক্তৃতা, তেমন লিখিত বিবৃতি ও ভাষণ সম্পর্কেও এ-কথা সমান সত্য। বৃহৎ নানা বক্তৃতা, বিবৃতি কি ভাষণ থেকে যদি এমন মাত্র একটি-দুটি বাক্য অথবা ইঙ্গিত তিনি পেয়ে যান, খবর হিসাবে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলে সেটাই একজন সতর্ক সাংবাদিকের মস্ত প্রাপ্তি বলে গণ্য হবে।

মনে রাখা চাই, যে-বক্তৃতা, ভাষণ কি বিবৃতি আদ্যন্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তারও কিছু-না-কিছু অংশ বর্জন করা যেতে পারে। বিশেষত, আনুষ্ঠানিক নানা বক্তৃতার সূচনায় ও উপসংহারে উদ্যোক্তা ও শ্রোতাদের উদ্দেশে যে মামুলি ধন্যবাদ শুভেচ্ছা ইত্যাদি জ্ঞাপন করা হয়, তা বিনা দ্বিধায় বর্জন করুন।

বক্ষ্যমাণ। অর্থ : 'যা বলা হবে'। **'বক্ষমাণ'**, **'বক্ষমান'**, **'বক্ষ্যমান'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না, লিখলে ভুল হবে।

বগি। **'বগী'** লিখবেন না।

বড়শি। অনেকে **'বঁড়শি'** লেখেন। কিন্তু 'চন্দ্রবিন্দু' দেবার দরকার নেই।



ব

বড়ো । উপজাতি । **'বোড়ো'** লিখবেন না । 'বৃহৎ' অর্থে বানান হবে 'বড়' । তখন ও-কার দেবেন না ।

বৎস । য-ফলা নেই, সুতরাং **'বৎস্য'** লিখবেন না । 'মৎস্য' লিখতে কিন্তু য-ফলা চাই । তফাতটা মনে রাখুন ।

বদখত । অর্থ : 'বিশ্রী' । **'বদখৎ'** লিখবেন না ।

বদলি । **'বদলী'** লিখবেন না ।

বন্দি । অর্থ : 'আটক' । **'বন্দী'** লিখবেন না ।

বন্দী । অর্থ : 'বন্দনা-গায়ক' । এই অর্থে **'বন্দি'** লিখবেন না ।

বপন । বীজ **'বপন'** করা হয়, **'রোপণ'** করা হয় না । বৃক্ষ **'রোপণ'** করা হয় ।

বয়ঃকনিষ্ঠ । **'বয়োকনিষ্ঠ'** লিখবেন না । বিসর্গ যেমন আছে, তেমনই থাকবে, সন্ধি হবে না ।

বরুয়া । অসমিয়া পদবি হলে **'বড়ুয়া'** লিখবেন না । ('নাম দেখুন)

বর্গি । মরাঠি দস্যু । **'বর্গী'** লিখবেন না ।

বর্ণালি । **'বর্ণালী'** লিখবেন না । ঈ-কার দেবার দরকার নেই ।

বসু । বঙ্গদেশীয় পদবি । এর বিকার ঘটাবেন না । অর্থাৎ বাসু, বোস, ভোস ইত্যাদি লিখবেন না । ('নাম' দেখুন)

বহিষ্কার । **'বহিস্কার'** লিখবেন না । 'নমস্কার', 'পুরস্কার' । কিন্তু 'পরিষ্কার', 'বহিষ্কার' ।

বাংলা । **'বাঙ্গলা'** বা **'বাঙ্গালা'** লিখবেন না । আমরা মুখে বলি 'বাংলা ভাষা', 'বাংলা সাহিত্য' । লেখার সময়েও এ-ক্ষেত্রে 'অতি-ভদ্রস্থ' হবার দরকার নেই । সুনীতিকুমারের গ্রন্থের উল্লেখ করবার সময় অবশ্য 'ভাষা-প্রকাশ **বাঙ্গালা** ব্যাকরণ'ই লিখতে হবে । কেননা, উদ্ধৃতিতে কোনও বিকার ঘটানো চলে না ।

বাক্যগঠন । বাক্য জটিল হলে ভাষা দুর্বোধ হয় । যে-ভাষা দুর্বোধ, তা অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছয় না । এই সহজ কথাটা মনে রাখুন ।

নানা পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ে বাইরে থেকে অনেকে অনেক লেখা পাঠান । তার দুটি-একটি ছাপা হয়, অধিকাংশই ফেরত যায় । কোন লেখা ছাপা হবে আর কোনটা হবে না, তা যাঁরা ঠিক করেন, একটা ব্যাপারে তাঁরা প্রায় সকলেই দেখা যায় একমত । সেটা এই যে, যে-সব লেখা তাঁদের হাতে আসে, তার অন্তত কিছু অংশের 'বিষয়বস্তু খুবই কৌতূহলোদ্দীপক' । বস্তুত সেগুলি ছাপতে পারলে তাঁরা খুশিই হতেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ছাপা হয় না সে-সব লেখা ; লেখকের ভাষা যেহেতু 'অতি কঠিন', তাই সেগুলি তাঁরা ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন ।

ব

কঠিন শব্দ যে ভাষাকে কঠিন করে তোলে, তা আমরা জানি। এ-ক্ষেত্রে তা হলে আমরা কী বুঝব ? ভাষা 'অতি কঠিন' মানে কি সে-সব লেখা অতি কঠিন-কঠিন শব্দে একেবারে ঠাসবোঝাই ? না, তা হয়তো নয়। অন্তত সর্বক্ষেত্রে নয়। বস্তুত, অনেক লেখায় হয়তো এমন শব্দ একটিও নেই, যাকে বিশেষ কঠিন বলা চলে। তবুও যাঁরা রচনা বাছাই করেন, সে-সব লেখার ভাষা তাঁদের কঠিন মনে হয় কেন ? কেনই বা কোনও একটি লেখার বিষয়বস্তু কৌতূহলোদ্দীপক মনে হওয়া সত্ত্বেও তার দু'-চারটি অনুচ্ছেদ পড়বার পরেই তাঁদের 'বিরক্তি ধরে যায়', এবং বাদবাকি অংশ আর পড়াই হয় না ?

প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার আগে বলি, সংবাদপত্রেও এমন নিবন্ধ বা প্রতিবেদন অনেক সময় ছাপা হয়, যার হেডলাইন আমাদের কৌতূহল জাগায় এবং যার শব্দসম্ভারও আমাদের অচেনা ঠেকে না, অথচ তা সত্ত্বেও তার খানিকটা অংশ পড়বার পরে আর আমরা এগোতে পারি না, আমাদের মনে হতে থাকে যে, এ বড় কঠিন ভাষায় লেখা।

আসলে, বিভিন্ন রচনার ভাষা যে আমাদের কঠিন মনে হয়, তার নানাবিধ কারণ থাকা সম্ভব। কঠিন-কঠিন শব্দ প্রয়োগ তার একটা বৃহৎ কারণ ঠিকই, তবে একমাত্র কারণ নয়। কারণ আরও অনেক। তার মধ্যে একটা কারণ অবশ্যই *বাক্যের জটিলতা।* কোনও রচনার বাক্যগুলি যদি হয় কঠিন ধাঁচের, শব্দগুলি সহজ হওয়া সত্ত্বেও তার ভাষা তা হলে কঠিন ঠেকতেই পারে।

বাক্যকে জটিল করে তুলবার অভ্যাস অবশ্য কিছু মানুষের মজ্জাগত। তাঁরা কোনও কথাই সরাসরি বলেন না, কিংবা বলতে পারেন না ; যা-কিছুই বলুন, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলেন। তাঁদের লেখার মধ্যেও সেই ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপারটা প্রায়ই এসে যায়। সংবাদপত্রের ভাষায় কিন্তু ঘোরপ্যাঁচ একেবারেই অচল। সেখানে বক্তব্য বিষয়কে কোনও নিবন্ধ কি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হয়।

বাক্য যেমন জটিল হবে না, তেমন খুব দীর্ঘও হবে না। জটিল বাক্য পাঠকের অস্বস্তি ঘটায়। অন্য দিকে, বাক্য যত দীর্ঘ হবে, পাঠকের অভিনিবেশ-ক্ষমতার উপরে তত বেশি চাপ পড়বে, এবং বিরক্ত বোধ করবেন তিনি। পারতপক্ষে তাই ***জটিল ও দীর্ঘ বাক্য রচনা করবেন না।***

মাঝে-মাঝে অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের বাইরে পা বাড়াতেই হয়। দরকার হয় একটি-দুটি জটিল অথবা দীর্ঘ বাক্য গঠনের। তখন সতর্ক থাকবে হবে, বাক্যটিকে যেভাবে আপনি সাজিয়ে নিচ্ছেন, তাতে তার

পূর্বাপর সংগতি যেন কোনও মতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। মনে রাখুন, কোনও বাক্যের প্রথমাংশে 'যখন' 'যত' 'যদি' 'যদিও' 'যে' 'যে-কারণে' 'যেজন্য' 'যেহেতু' ইত্যাদি শব্দ থাকলে, পরবর্তী অংশের সঙ্গে তাদের একটা সুষ্ঠু যোগসম্পর্ক থাকাই চাই। (অনেক সময় অবশ্য বাক্যের শেষাংশেও এই শব্দগুলিকে বসানো যায়। সে-ক্ষেত্রে বাক্যের প্রথমাংশের সঙ্গে এদের একটা সুষ্ঠু যোগসম্পর্ক থাকতে হবে।) বাক্যের গঠন নইলে ঠিক হয় না, এবং বক্তব্যেরও পূর্বাপর সংগতির সূত্র তাতে ছিন্ন হয়।

বাক্যগঠনে কর্তৃবাচ্যকে প্রাধান্য দিন। কর্মবাচ্যে আমরা লিখতে পারি, "এই মন্দির রামবাবুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, কর্তৃবাচ্যে এই একই কথা জানিয়ে আমরা যখন লিখি, "রামবাবু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন," তখন কথাটা আরও সরাসরি জানানো হচ্ছে।

ছোটখাটো দু'-একটি ত্রুটির কথা সকলেই জানেন, কিন্তু লিখবার সময়ে সকলেই যে সে-বিষয়ে সতর্ক থাকেন, তা নয়। যেমন, ধরা যাক, প্রয়োজন যেখানে একটিমাত্র 'না'-এর, দুটি 'না' যে সেখানে বাক্যের অর্থ একেবারে উলটে দিতে পারে, দেয়ও, এটাও সব সময়ে সকলের মনে থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। "যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র মানুষদের পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানো একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, যদি *না* কোনও দলের তহবিল থেকে আনুষঙ্গিক খরচ মেটাবার টাকাটা তাঁদের *না* দেওয়া হয়।" এই বাক্যে দুটি 'না' রয়েছে ; 'যদি' শব্দের পরবর্তী 'না', ও 'তাঁদের' শব্দের পরবর্তী 'না'। দুটি 'না'-এর যে-কোনও একটিকে বর্জন করা দরকার, নইলে এই বাক্যের অর্থ একেবারেই উলটে যায়। কাগজে যখন এই ধরনের বাক্য বার হয়, তখন বোঝা যায় যে, লেখক সতর্ক ছিলেন না। অসতর্কতার একটি দৃষ্টান্ত দিই : "...মোহনবাগান ম্যাচটা আরও দুই গোলে জিততে পারত, যদি *না* সত্যজিৎ এবং আনচেরি ফাঁকা গোল পেয়েও মিস *না* করতেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ ৮।) যেখানে একটি 'না' দরকার, দুটি 'না' সেখানে বাক্যের অর্থ উলটে দিয়েছে।

একই বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের উপরে জোর দেবেন না। দিলে বাক্য কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেখুন : "লোকসানের ধাক্কায় কলকাতায় ট্রাম চালানোই যে ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে, প্রকারান্তরে এ-কথাও সমীক্ষায় জানানো হয়েছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা,. ১৮ মার্চ ১৯৯৪, পৃ ১১।) জোর দেওয়া উচিত ছিল **'চালানো'** ও **'ক্রমে'** এই দুটি শব্দের যে-কোনও একটির উপরে। লেখা উচিত ছিল : "...চালানোই...ক্রমে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে..." অথবা "...চালানো...ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে..."

ব

বাক্য রচনার সময়ে সতর্ক থাকা দরকার অপ্রয়োজনীয় শব্দের অনুপ্রবেশ সম্পর্কেও। নানা বাক্যে অনেক সময়েই এমন একটি (বা একাধিক) শব্দ ঢুকে পড়তে দেখি, যেটি (বা যেগুলি) সেখানে ব্যবহার করবার কোনও দরকারই ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ৫ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের এক জায়গায় লেখা হয়েছে, "তবে বিচক্ষণ চন্দ্র শেখর অবশ্য এখনই এতটা দাবি করছেন না।" এই বাক্যে *'তবে'* ও *'অবশ্য'* এই দুটি শব্দের যে-কোনও একটি ব্যবহার করলেই লেখকের বক্তব্য কী তা বুঝতে পারা যায়, অন্যটি ব্যবহার করবার কোনও দরকারই হয় না। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ৭ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রোড়পত্র (পৃ. ২) থেকে। "অতএব এই সেদিনও নিঃসঙ্গ চন্দ্র শেখরের পাশে আজ তাই অনেকেরই ভিড়।" এই বাক্যে *'অতএব'* ও *'তাই'* এই শব্দ দুটির অর্থ তো একই। এদের একটিকে রাখাই তাই যথেষ্ট। আরও একটি দৃষ্টান্ত: লাইন্সম্যান সুগত মুখোপাধ্যায় 'অহেতুক হেনস্থা হলেন বিনা কারণে।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ অগস্ট ১৯৯২, পৃ ৬।) অর্থ যখন একই, তখন *'অহেতুক'* লেখার পরে আবার *'বিনা কারণে'* কেন ? একইসঙ্গে দুটিকে রাখায় বাক্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও একটি দৃষ্টান্ত : "তবে তা বলে রোগীর কিন্তু অভাব নেই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৯।) এই বাক্যে *'তবে'* আর *'তা বলে'*র মধ্যে একটিকে রাখলেই হত। মনে রাখুন : 'অধিকন্তু ন দোষায়' কথাটা অন্যত্র খাটলেও বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে খাটে না।

সাংবাদিককে যে প্রতিনিয়ত একটা চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়, তা স্বীকার্য। অনেক সময়েই অত্যন্ত দ্রুত তাঁকে তৈরি করতে হয় তাঁর লেখা। তবু তাঁর সতর্ক থাকা চাই। নইলে তাঁর লেখার মধ্যে নানা ত্রুটি থেকে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

ত্রুটি প্রধানত দু' রকমের হয়। তথ্যের ও ভাষার। এখানে আমরা বাক্যগঠন-সংক্রান্ত কিছু ত্রুটির কথা বলেছি। দুই পদের অসংগতিও একটা ত্রুটি। ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের মধ্যে যে একটা সংগতি রক্ষা করা চাই, অনেকের সেটা মনে থাকে না। ফলে, প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, ক্রিয়াপদটি সম্মানসূচক বটে, কিন্তু সর্বনামটি নয়। এই ত্রুটির মূলে রয়েছে লেখকের অসতর্কতা।

খবরের কাগজে এই ধরনের আরও কিছু-কিছু ভুলত্রুটি চোখে পড়ে, লেখক একটু সতর্ক থাকলেই বাক্যগুলিকে যা থেকে মুক্ত রাখা যায়।

ব

মনে রাখুন

(১) বাক্যগঠনে জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার্য।
(২) বাক্য খুব দীর্ঘ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। বক্তব্য যেখানে ছোট একটি বাক্যের মধ্যে আঁটানো যাচ্ছে না, সেখানে দীর্ঘ একটি বাক্যের বদলে বরং ছোট-ছোট দুটি কি তিনটি বাক্য লেখাই ভাল।
(৩) বাক্যের মধ্যে পূর্বাপর সংগতি রাখা চাই।
(৪) বাক্যগঠনে কর্তৃবাচ্যকে প্রাধান্য দিন।
(৫) বাক্য থেকে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বর্জনীয়।
(৬) ক্রিয়াপদে-সর্বনামে সংগতি রাখা দরকার।

বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য। ছোট-ছোট সিধে-সরল বাক্যকে আমরা, মাঝখানে কোথাও না থেমে, একটানা বলে যেতে পারি। বলেও থাকি। সে-ক্ষেত্রে বাক্য দীর্ঘ হলে, বা তত সিধে-সরল না হলে, একটানা তা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দমে কুলোয় না ; আবার যেখানে দমে কুলোয়, সেখানেও যে অমন একটানাভাবে অনেক বাক্য আমরা বলি না, তার কারণ, ওইভাবে বললে সে-সব বাক্যের অর্থ বুঝতে শ্রোতার অসুবিধা হয়।

এখানে কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

(১) পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।
(২) অসমে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে।
(৩) হাইকোর্টের অচলাবস্থা কাটাবার জন্য আলোচনা শুরু হল।
(৪) কংগ্রেস ৭ ডিসেম্বর থেকে আবার আন্দোলন শুরু করবে।

(দৃষ্টান্তগুলি ২৯ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গৃহীত।)

বাক্যগুলির কোনওটিই দীর্ঘ নয়। উপরন্তু প্রতিটি বাক্য সরলও বটে। মাঝখানে কোথাও না থেমে তাই এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটিকেই আমরা একটানা বলে যেতে পারি ; বাক্যের অর্থ বুঝতে তাতে কোনও শ্রোতারই কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। আমরা থামি একেবারে বাক্যের সমাপ্তিসূচক দাঁড়ি কিংবা পূর্ণচ্ছেদে এসে।

এবারে আরও কয়েকটি বাক্য দেখুন :

(১) পুলিশ প্রথমেই গুলি চালায়নি, প্রথমে তারা কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।
(২) যা ঘটবার তা-ই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে ; অসমে জারি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন।

(৩) হাইকোর্টে অচলাবস্থা চলছে ; সেটা কাটাবার জন্য আলোচনা শুরু হল ।

(৪) কংগ্রেস অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ৭ ডিসেম্বর থেকে আবার তাঁদের আন্দোলন শুরু হবে ।

এই বাক্যগুলিও মোটামুটি সোজা-সরলই বটে, কিন্তু এমনভাবে এরা বিন্যস্ত হয়েছে যে, এদের কোনওটিকেই একটানা বলে যাওয়ার উপায় নেই । পূর্ণচ্ছেদে পৌঁছবার আগে মাঝরাস্তায় একটু থেমে থাকলে তবেই শ্রোতার পক্ষে অক্লেশে এদের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় । লক্ষ করে দেখুন, বাক্যের মধ্যে যেখানে একটু থামলে অর্থ বুঝতে সুবিধা হয়, ঠিক সেখানেই বসানো হয়েছে কমা অথবা সেমিকোলন ।

কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদির প্রত্যেকটিই হল যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন । সোজা বাংলায় 'থামবার সংকেত' । কোনওটা কম থামবার, কোনওটা বেশি থামবার ।

যেখানে থামা দরকার, সেখানে না থেমে বক্তা কোনও বাক্য যদি একটানা বলে যান, শ্রোতার তা হলে অসুবিধা হয় ; ঠিক তেমনই, লেখার মধ্যে যেখানে বিরামচিহ্ন দেওয়া দরকার, লেখক যদি সেখানে তা না দেন, পাঠক তা হলে অসুবিধায় পড়েন ।

বাংলা লেখায় আজকাল বহুপ্রকার যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্নের ব্যবস্থা থাকে । এককালে আমাদের ভাষায় কিন্তু এত রকমের যতির ব্যবস্থা ছিল না । তাবৎ যতির কাজ তখন শুধু দাঁড়ি দিয়েই চালানো হত । বাংলা গদ্যে থাকত এক-দাঁড়ির (।) ব্যবস্থা, আর বাংলা কাব্যে যেমন এক-দাঁড়ির, তেমন দুই-দাঁড়ির (॥) । কাব্যে এই দুই-দাঁড়ি আসত পঙ্‌ক্তির শেষে, পর্যায়ক্রমে । বিজোড়সংখ্যক পঙ্‌ক্তির শেষে বসত এক-দাঁড়ি, জোড়-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির শেষে দুই-দাঁড়ি ।

নীচের পঙ্‌ক্তি দুটি লক্ষ করুন :

> ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী ।
> একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥

ভারতচন্দ্রের সময়ে এক-দাঁড়ি ও দুই-দাঁড়ি ছাড়া অন্য-কোনও যতিচিহ্ন ছিল না । যেমন ছিল না প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা নোট অব ইন্টেরোগেশন । উপরন্তু ছিল না উদ্ধৃতি-চিহ্নের সুবিধাও । সে-সব থাকলে, অনুমান করি, পঙ্‌ক্তি দুটিকে তিনি এইভাবে লিখতেন :

> ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
> "একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি ?"

ব

এখন যাঁরা বাংলা লেখেন, সব রকমের যতিচিহ্নের সুবিধাই তাঁরা পান। সুতরাং তাঁদের স্পষ্ট করে জানা দরকার যে, সে-সব চিহ্নের কোন্‌টা কোথায় ব্যবহার্য।

কমা

কমা অতিশয় স্বল্পকালব্যাপী বিরতির চিহ্ন। আমরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করি

(১) একই বাক্যের একাধিক অংশের মধ্যে যখন সামান্য সময়ের জন্য থেমে থাকবার দরকার হয়। দৃষ্টান্ত :

(ক) যিনি যতই অনুরোধ করুন, চন্দ্র শেখর কিছুতেই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহকে নেতা বলে মানতে রাজি হবেন না।

(খ) ভাবা গিয়েছিল, এই যে বিরোধ, দিন কয়েকের মধ্যে এর মীমাংসা যদি না-ও হয়, মাস কয়েকের মধ্যে নিশ্চয় হবে।

(২) বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ বা বর্ণের পরে যখন আমরা সামান্য সময়ের জন্য থেমে থাকি। দৃষ্টান্ত :

(ক১) পাত্রটি একে তো সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, উদারচিত্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিদ্বান, তায় সে আবার ধনী পিতার একমাত্র পুত্র। (ক২) রাম, শ্যাম, যদু ও মধুর মধ্যে কে ভাল আর কে মন্দ, বোঝা কঠিন।

(খ) ক, খ, গ ও ঘ-এর মধ্যে যদি ১২০ টাকা সমানভাবে বেঁটে দিতে হয়, তা হলে তাদের প্রত্যেকে পাবে ৩০ টাকা।

(৩) কোনও তারিখ যখন পুরোপুরি অথবা অংশত অঙ্কে লেখা হয়, তখন দিন, মাস ও বছরের পার্থক্য বোঝাবার জন্যও কমা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত :

(ক) ১৫, ৮, ১৯৪৭

(খ) ১৫ অগস্ট, ১৯৪৭

প্রথম দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অবশ্য কমার বদলে বিন্দু বা ডট-চিহ্ন ও হাইফেনের ব্যবহারই বেশি প্রচলিত ; লেখা হয় ১৫.৮.১৯৪৭ বা ১৫-৮-১৯৪৭। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও আজকাল কমা না-দিয়ে ১৫ অগস্ট ১৯৪৭ লেখা প্রচলসিদ্ধ বলে গণ্য হচ্ছে। মাসের নামটিকে প্রথমে নিয়ে এলে অবশ্য কমা দিতেই হয় ; লিখতে হয় অগস্ট ১৫, ১৯৪৭।

(৪) বড়-বড় রাশিতে শতক, সহস্র, লক্ষ ও কোটির এলাকাকে স্পষ্ট

করে তুলবার জন্যও দরকার হয় কমার। দৃষ্টান্ত :

(ক) ২০,৫৯৩
(খ) ৩,৭০,৮০৫
(গ) ১,০৫,০৭,৬৬৮

এতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, প্রথম সংখ্যাটা কুড়ি হাজার পাঁচ শো তিরানব্বই, দ্বিতীয় সংখ্যাটা তিন লক্ষ সত্তর হাজার আট শো পাঁচ এবং তৃতীয় সংখ্যাটা এক কোটি পাঁচ লক্ষ সাত হাজার ছ' শো আটষট্টি। কমা না থাকলে চট করে সেটা বুঝতে অনেকেরই অসুবিধা হত।

(৫) বাক্যের মাঝখান থেকে যখন অন্য একটি বাক্যের উদ্ধৃতি শুরু হয়, তখন উদ্ধৃতির সূচনার ঠিক আগেই বসাতে হয় কমা। দৃষ্টান্ত :

(ক) রামবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "উপন্যাস যে লিখব, তার সময় পাচ্ছি কোথায় ?"
(খ) শ্যামবাবু তবু নাছোড় ; তিনি হাত কচলে বললেন, "সময় আপনাকে স্যার করে নিতেই হবে।"

(৬) বাক্যের মধ্যে অনেক সময় এমন একটি অংশ আমরা দেখতে পাই, বাক্যটির সঙ্গে যার ব্যাকরণগত কোনও সম্পর্ক নেই। ইংরেজিতে একে বলে প্যারেনথিসিস। প্যারেনথিসিসকে অনেকে প্রথম বন্ধনী বা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখেন ; আবার এর দু' দিকে কমা বসালেও অংশটির ব্যাকরণগত সংযোগহীনতার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত :

(ক) পরিশ্রান্ত যাত্রীরা যে যার ঘরে গিয়ে, খাবার অভুক্তই পড়ে রইল, ঘুমিয়ে পড়লেন।
(খ) পুলিশ কমিশনার তৎক্ষণাৎ তাঁর দফতর থেকে বেরিয়ে এসে, জিপ তৈরিই ছিল, ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে যান।

সেমিকোলন

সেমিকোলন-চিহ্নটি (;) যে বিরামকাল নির্দেশ করে, তা কমার বিরামের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি, এবং দাঁড়ির বিরামের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম। নানা প্রয়োজনে এই চিহ্নটি আমরা ব্যবহার করে থাকি।

(১) দুটি পৃথক বাক্যকে যে সংযোগসাধক অব্যয় দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়, সেমিকোলন অনেক সময় তারই বদলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরের পৃষ্ঠায় একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

প্রধানমন্ত্রী আজ কলকাতায় পৌঁছেছেন, এবং আজকের দিনটা কলকাতায় কাটিয়ে কালই তিনি দিল্লি রওনা হবেন।

দেখলেই বোঝা যায় যে, আসলে এখানে রয়েছে দুটি বাক্য। ক প্রধানমন্ত্রী আজ কলকাতায় পৌঁছেছেন। খ. আজকের দিনটা কলকাতায় কাটিয়ে কালই তিনি দিল্লি রওনা হবেন। সংযোগসাধক অব্যয় 'এবং'-এর সাহায্যে এই বাক্য দুটিকে আমরা জুড়ে দিয়েছি। এই যে জুড়ে দেওয়ার কাজ, 'এবং' শব্দটির বদলে একটি সেমিকোলন বসিয়েও তা করা চলে। সে-ক্ষেত্রে আমরা লিখব :

প্রধানমন্ত্রী আজ কলকাতায় পৌঁছেছেন ; আজকের দিনটা কলকাতায় কাটিয়ে কালই তিনি দিল্লি রওনা হবেন।

(২) বাক্যের একাধিক অংশের নিজ-নিজ এলাকার মধ্যেই যখন থাকে এক বা একাধিক কমা, বিভ্রম এড়াবার জন্যই তখন সেমিকোলন ব্যবহারের দরকার হয়। নীচের বাক্যটি লক্ষ করুন :

ক্যামেরুন এল, এল দালিয়েনও, অথচ, যা কিনা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার, ভাল খেলা এরা কেউই দেখাতে পারল না।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, এখানেও আমরা একটি অব্যয়ের সাহায্য নিয়ে দুটি বাক্যকে জুড়ে দিয়েছি। বাক্যে যে গঠনগত কোনও ত্রুটি ঘটেছে, তা নয়। তবু যে এই বাক্য ঈষৎ বিভ্রম জাগায়, তার কারণ এর দুই অংশেই রয়েছে একাধিক কমা। বিভ্রম জাগত না, যদি একটি সেমিকোলনের সাহায্য নিয়ে এই বাক্যের দুটি অংশকে আর-একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হত। সেমিকোলন এ-ক্ষেত্রে কোথায় বসবে, দেখুন :

ক্যামেরুন এল, এল দালিয়েনও ; অথচ, যা কিনা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার, ভাল খেলা এরা কেউই দেখাতে পারল না।

লক্ষণীয়, সংযোগসাধক অব্যয় 'অথচ'কে এখানে বিদায় দেওয়া হয়নি। তাকে তার স্বস্থানে রেখেই বসানো হয়েছে সেমিকোলন-চিহ্নটিকে। বাক্যের দুই অংশ তার ফলে স্পষ্টতর হয়েছে।

(৩) বিভিন্ন পদাধিকারীর নাম ও পদ কিংবা বিভিন্ন স্থানাধিকারীর নাম ও স্থান যখন একই বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি রেখে দেখানো হয়, তখনও দরকার হয় সেমিকোলন-চিহ্ন ব্যবহারের। দৃষ্টান্ত :

ক্লাবের নির্বাচনে এবারে বিভিন্ন পদ অধিকার করেছেন গোপালচন্দ্র সাঁতরা,

সভাপতি ; বিপিনবিহারী সামন্ত, সহ-সভাপতি ; অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক ; অসিতকান্তি হালদার, সহ-সম্পাদক, এবং সুরেন্দ্রনাথ গুহ, কোষাধ্যক্ষ।

সেমিকোলন ব্যবহারের দরকার হয় অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও। তবে একটা কথা স্বীকার্য। এই বিরামচিহ্ন ব্যবহারের দরকার ইংরেজি ভাষায় যত হয়, বাংলা ভাষায় তত হয় না। বস্তুত, বাংলায় যে-সব ক্ষেত্রে আমরা সেমিকোলন ব্যবহার করি, তার অনেকগুলিতে দাঁড়ি দিলেও চলে। (প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সেমিকোলন-চিহ্ন লক্ষ করুন, ওখানে দাঁড়ি দিলেও চলত।)

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ

সব ধরনের বাক্যের শেষেই যে দাঁড়ি বসে, তা নয়। দাঁড়ি বসে প্রধানত বিবৃতিমূলক ও অনুজ্ঞামূলক বাক্যের শেষে। নীচের বাক্য দুটি লক্ষ করুন :

(ক) এক্ষুনি আর বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না।
(খ) এই ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো।

প্রথম বাক্যটি বিবৃতিমূলক। দ্বিতীয়টি অনুজ্ঞামূলক। দুটি বাক্যেরই শেষে বসেছে দাঁড়ি। ('অনুজ্ঞা' বলতে 'আদেশ' বোঝায়। যে-বাক্যে আদেশ না করে অনুরোধ করা হয়, তার শেষেও দাঁড়ি বসবে।)

একটা কথা মনে রাখুন। বিবৃতিমূলক বাক্য অনেক সময় এমনভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে তাকে প্রশ্নাত্মক বাক্য বলে ভ্রম হতে পারে। নীচের বাক্যটি লক্ষ করুন :

অনেক চেষ্টা করেও জানা গেল না যে, ব্যাপারটা কী।

এই যে বাক্য, এতে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না। অথচ, এই বাক্যের শেষে যেহেতু প্রশ্নবোধক 'কী' শব্দটি রয়েছে, অনেকে তাই ভুল করে একে প্রশ্নাত্মক বাক্য ভাবতে পারেন, এবং বাক্যের শেষে দাঁড়ির বদলে বসাতে পারেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন। (বসিয়েও থাকেন। বিবৃতিমূলক বাক্যকে



ব

প্রশ্নাত্মক বাক্য ভেবে দাঁড়ির বদলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাবার দৃষ্টান্ত বাংলা পত্রপত্রিকায় বিস্তর চোখে পড়ে। আনন্দবাজার পত্রিকা এ-ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম নয়।) আসলে যে এটিও বিবৃতিমূলক বাক্য, বিন্যাস পালটে দিলেই সেটা ধরা পড়বে। তখন বাক্যটির চেহারা হবে এইরকম :

ব্যাপারটা কী, তা অনেক চেষ্টা করেও জানা গেল না।

একই ধরনের আরও তিনটি বাক্য এখানে দেওয়া হল :

(ক) পুরমন্ত্রী অনেক কথাই বললেন, শুধু জানালেন না যে, কাজটা হবে কীভাবে
(খ) বোঝা কঠিন নয় যে, কাজটা হয়নি কেন
(গ) ক্রীড়াজগতের কর্তারা সম্ভবত ধরতেই পারছেন না, ফুটবলে আমাদের আসল গণ্ডগোলটা কোথায়

ঘুরিয়ে বসানো হয়েছে বলে ভাববেন না যে, এগুলি প্রশ্নাত্মক বাক্য। তিনটি বাক্যই বিবৃতিমূলক। সুতরাং এদের কোনওটির শেষেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে না, প্রতিটির শেষেই বসবে দাঁড়ি। বিন্যাস পালটালে বাক্যগুলির চেহারা কী রকম হবে, তা নীচে দেখানো হল :

(ক) পুরমন্ত্রী অনেক কথাই বললেন, শুধু কাজটা যে কীভাবে হবে, তা জানালেন না।
(খ) কাজটা হয়নি কেন, তা বোঝা কঠিন নয়।
(গ) ফুটবলে আমাদের আসল গণ্ডগোলটা কোথায়, ক্রীড়াজগতের কর্তারা তা সম্ভবত ধরতেই পারছেন না।

বিবৃতিমূলক বাক্যকে যে কীভাবে প্রশ্নাত্মক বাক্য বলে ভুল করা হয়, কাগজ থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি :

"দেখা যাক, থানা কী করে ?"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মার্চ ১৯৯৪, পৃ ১১)

আসলে কিন্তু এটি বিবৃতিমূলক বাক্য। বিন্যাস পালটালেই সেটা বোঝা যাবে। তখন এর চেহারা হবে এই রকম :

"থানা কী করে, দেখা যাক।"

বাক্য যত দীর্ঘ হবে, পাঠকের অভিনিবেশ-ক্ষমতার উপরে তত বেশি চাপ পড়বে। ('ভাষা' দেখুন।) দাঁড়ির প্রাচুর্য আমাদের বাক্যগুলিকে দীর্ঘ হতে দেয় না। লেখায় তাই যত বেশি দাঁড়ি ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

ব

প্রশ্নচিহ্ন

যে বাক্য প্রশ্নাত্মক, তার শেষে একটি প্রশ্নচিহ্ন (?) বসাতে হয়। নীচের বাক্যগুলি দেখুন :

(ক) মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁর বাসস্থান পালটাচ্ছেন ?
(খ) মমতার সভায় কত লোক এসেছিল ?
(গ) প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ কেন বোম্বাই গেলেন ?
(ঘ) কথাটা তাঁকে কে বলল ?
(ঙ) শেষ কবে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ?
(চ) রোজ বিকেলে তিনি কোথায় যান ?

এই যে ছ'টি বাক্য, এদের প্রতিটিই প্রশ্নাত্মক। বাক্যগুলিকে যে-ভাবেই বিন্যস্ত করা হোক, তাতে এদের প্রশ্নাত্মক চরিত্রের কোনও হেরফের হবে না। সুতরাং এদের প্রতিটির শেষেই প্রশ্নচিহ্ন বসানো হয়েছে।

প্রশ্নচিহ্ন বাক্যের শেষে বসবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। কোনও ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থাকলে অবশ্য বাক্যের মাঝখানেও এই চিহ্নটিকে বসানো হয়। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্নটিকে রাখতে হয় একটি ব্র্যাকেটের মধ্যে। নীচের বাক্য দুটি দেখুন :

(ক) এক ব্রিটিশ (?) বিজ্ঞানী সম্প্রতি বলেছেন যে, মানুষের গড় আয়ুষ্কাল আগামী শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এক শো বছরে পৌঁছে যাবে।

(খ) মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল ; সেখানে ১৯৬৫ সালে (?) এর নিষ্পত্তি হয়।

বাক্য দুটির প্রথমটিতে 'ব্রিটিশ' শব্দের পরে ও দ্বিতীয়টিতে '১৯৬৫ সালে'র পরে ব্র্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে প্রশ্নচিহ্ন বসানো হয়েছে এই কারণে যে, বিজ্ঞানী ভদ্রলোক 'ব্রিটিশ' কি না ও সুপ্রিম কোর্টে মামলার নিষ্পত্তি হবার সালটা '১৯৬৫' কি না, লেখক সে-বিষয়ে নিশ্চিত নন।

(প্রকাশিত রচনায় যেমন কোনও ভুল থাকা উচিত নয়, তেমনই তাতে এমন কোনও তথ্য কিংবা তারিখ থাকাও অনুচিত, যার পরে ব্র্যাকেটে এইভাবে প্রশ্নচিহ্ন বসাবার দরকার হয়। লেখকের যদি কোনও ব্যাপারে কোনও সন্দেহ-সংশয় থাকে, তবে তা নিরসনের দায়িত্বও তাঁরই। সেই দায়িত্ব কোনও মতেই পাঠকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া চলে না।)



ব

বিস্ময়চিহ্ন

উক্তি যেখানে বিস্ময়সূচক, বিস্ময়চিহ্ন (!) শুধু সেখানেই যে ব্যবহার্য, তা নয়। উক্তির মধ্যে গভীর আবেদন, অবিশ্বাস কি জোরালো রকমের কোনও অনুভূতি প্রকাশ পেলেও এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কয় ধরনের উক্তির কথা এখানে বলা হল, তাতে বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :

(ক) "এ তো বড় ভয়ানক কাণ্ড !"
(খ) নিরাশ্রয় মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "বাঁচান আমাকে !"
(গ) "যাঃ, অমন দেবতুল্য মানুষের পক্ষে এমন কাজ করা অসম্ভব !"
(ঘ) রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিকৃত গলায় তিনি বললেন, "দূর হও !"

ঊর্ধ্বকমা

শব্দ থেকে এক বা একাধিক বর্ণ যে বর্জিত হয়েছে, এটা বোঝাবার জন্য ইংরেজি ভাষায় অ্যাপসট্রফি (') ব্যবহৃত হয়। *don't, can't* ইত্যাদি শব্দের অ্যাপসট্রফি সেই বর্জিত বর্ণের প্রতীক। পজেসিভ কেস বা সম্বন্ধপদের ক্ষেত্রেও *(my, our, your, his, their* ইত্যাদি কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে) অ্যাপসট্রফি চাই। বচনভেদে তার স্থান অবশ্য পালটে যায়। (যথা *boy's, boys'; girl's, girls'* ইত্যাদি।)

অ্যাপসট্রফিকে বাংলায় বলা হয় ঊর্ধ্বকমা। এ-ভাষায় সম্বন্ধপদে ঊর্ধ্বকমার দরকার হয় না। তবে, বর্জিত বর্ণের প্রতীক হিসাবে, এবং দুটি শব্দের বানান যেখানে একই, সেখানে একটি শব্দের সঙ্গে অন্যটির উচ্চারণের পার্থক্য বোঝাবার জন্য কেউ-কেউ ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁরা *ক'রে, ব'লে, ধ'রে* ইত্যাদি লিখে থাকেন। আমরা কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। আমাদের ধারণা, উচ্চারণটা *করে* হবে, না *কোরে* হবে ; *বলে* হবে, না *বোলে* হবে, অথবা *ধরে* হবে, না *ধোরে* হবে, পুরো বাক্যটি থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

তারিখ লেখার ব্যাপারে সংখ্যার একাংশ যে বর্জিত হয়েছে, সেটা বোঝাতে অবশ্য যেমন ইংরেজি তেমন বাংলাতেও ঊর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়। হওয়া উচিতও। সর্বদা আমরা পুরো তারিখটা লিখি না। দৃষ্টান্ত : ১৫ অগস্ট ১৯৪৭ না লিখে অনেক সময়ই আমরা লিখি ১৫ অগস্ট '৪৭। এ ক্ষেত্রে ১৯৪৭ থেকে ১৯ যে বাদ পড়ল, সেটা বোঝাবার জন্যই ৪৭-এর আগে বসাই ঊর্ধ্বকমা। (লক্ষ করুন, দিন কিংবা মাস নয়, শুধু বৎসরের সংখ্যাটারই প্রথমাংশ ছাঁটাই হয়ে যায়। কোপটা পড়ে সহস্র ও শতকের ঘাড়ে। অর্থাৎ আমরা ধরেই নিই যে, এই শতাব্দীর কথাই যে বলা হচ্ছে,

উল্লেখ না করলেও সবাই সেটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু চলতি শতাব্দীর ক্ষেত্রে খাটলেও অন্যান্য শতাব্দী সম্পর্কে এ-কথা খাটে না। সেখানে প্রথমাংশ ছাঁটাই না করে বৎসরের পুরো সংখ্যাটাই লিখতে হবে।)

সংখ্যাবাচক একাক্ষর শব্দের ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়। যেমন, **দু'** বছর **ন'** মাস **ছ'** দিন।

এ ছাড়া অন্য যেখানে আমরা ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করি, তা হল উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতি যেখানে শুরু হচ্ছে, সেখানে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বা দুটি উলটো ঊর্ধ্বকমা ('/"), এবং উদ্ধৃতি যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বা দুটি সোজা ঊর্ধ্বকমা ('/") বসাই। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য তিনটি ঊর্ধ্বকমারও দরকার হয়। ('উদ্ধৃতিচিহ্ন বা কোটেশন মার্ক' দেখুন।)

কোলন

কোলনচিহ্নের (:) বিশেষ কাজটা কী, সেটা বোঝাতে গিয়ে এইচ ডব্লু ফাউলার তাঁর 'মডার্ন ইংলিশ ইউসেজ'-এ বলছেন যে, কাজটা হল সরবরাহের। কী সরবরাহ? না "...delivering the goods that have been invoiced in the preceding words." কথাটাকে ভেঙে বলতে গেলে বলতে হয় যে, কোলনের পূর্ববর্তী অংশে যা সরবরাহের ইনভয়েস বা চালানপত্র লেখা হয়েছে, কোলনের পরবর্তী অংশে সেই বস্তুটাই আমরা পেয়ে যাই। সেটা আসলে কয়েকজন ব্যক্তির নাম হতে পারে ; কয়েকটি দেশ, গ্রন্থ ইত্যাদির তালিকা হতে পারে ; কোনও ঘোষণা কি কারও বক্তব্য বা বিবৃতির বয়ান হতে পারে ; বস্তুত, হতে পারে আরও অনেক-কিছুই। বিভিন্ন প্রয়োজনে কোলন ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল :

(ক) ভাল খেলা সত্ত্বেও, নিতান্তই কয়েকজন কর্মকর্তার আক্রোশের কারণে, বারবার যাঁরা উপেক্ষিত হচ্ছেন, তাঁরা হলেন : শ্রীকান্ত, অরুণলাল, সদানন্দ বিশ্বনাথ ও অশোক মালহোত্র।

(খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত যে সাতটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি প্যারিস সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের তালিকা এখানে দেওয়া হল : (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (২) পশ্চিম জার্মানি, (৩) জাপান, (৪) যুক্তরাজ্য, (৫) ইতালি, (৬) কানাডা। সপ্তম নামটি যে আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্র ফ্রান্সের, তা না-বললেও চলে।

(গ) উপন্যাস নিয়ে এই নিবন্ধটি যে খারাপ হয়েছে, এমন কথা আমরা বলব না। তবে তিনখানি গ্রন্থের কোনও উল্লেখই যে নিবন্ধকার করেননি তাতে ঈষৎ বিস্মিত হয়েছি। গ্রন্থ তিনখানি হল : (১) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', (২) রবীন্দ্রনাথের

'চোখের বালি' ও (৩) শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা'।

(ঘ) ঘোষণার পূর্ণ বয়ান নিম্নে প্রদত্ত হল :

সময়টা কত, অর্থাৎ ক'টা বেজে কত মিনিট, সেটা সংখ্যায় লিখে জানাবার ব্যাপারেও কোলন ব্যবহার করাই রীতি। যথা ৮ : ৫৭; ১০ : ০৪, ১৪ : ২৫, ১৭ : ১১ ইত্যাদি। বাংলা পত্রপত্রিকায় যে সময় নির্দেশ করা হয়, তাতে অবশ্য ঘণ্টার ক্ষেত্রে ১২র পরে সংখ্যাটাকে আর বাড়ানো হয় না, তার বদলে দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা কিংবা রাত্রির উল্লেখ করা হয়।

অসতর্কতার কারণে বাংলা পত্রপত্রিকায় কোলনচিহ্নটি (:) প্রায়ই বিসর্গ (ঃ) হয়ে দেখা দেয়। এই ত্রুটি যাতে কোনও মতেই ঘটতে না পারে, সেজন্য সতর্ক থাকা দরকার।

ড্যাশ

লেখালিখির ব্যাপারে যেমন কোলন, তেমন ড্যাশচিহ্নের (—) ভূমিকাও খুব বড় নয়। প্রধানত কোন কোন ক্ষেত্রে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা নীচে জানানো হল :

(১) প্যারেনথিসিসের ক্ষেত্রে অনেকে ড্যাশ ব্যবহার করেন। ইতিপূর্বে আমরা প্যারেনথিসিসের পরিচয় দিয়েছি। ('কমা' বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।) তবুও স্মরণ করিয়ে দিই যে, বাক্যের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে প্যারেনথিসিসের কোনও ব্যাকরণগত সম্পর্ক থাকে না। এই সম্পর্কহীনতার কারণেই দু' দিকে কমা বসিয়ে প্যারেনথিসিসকে আমরা মূল বাক্য থেকে একটু আলাদা করে রাখি। আলাদা করে রাখার এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ড্যাশের সাহায্যেও। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

সরকারিভাবে ঘোষিত না-হলেও পোল্যান্ডের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী দেশগুলির আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার সেই সোভিয়েত নীতি—যা কিনা ব্রেজনেভ ডকট্রিন হিসাবে আখ্যাত—এবারে পরিত্যক্ত হতে চলেছে।

প্যারেনথিসিসকে ড্যাশের সাহায্যে পৃথক করে রাখার আর-একটি দৃষ্টান্ত :

বরপক্ষীয় ভদ্রলোকেরা—এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁদের ছোটলোক বলাই উচিত—বায়না ধরলেন যে, মধ্যাহ্নভোজের সময় তাঁদের প্রত্যেকের পাতে একটি করে রুইমাছের মুড়ো দিতে হবে।

(২) যে-সব খবর বাইরে থেকে আসে, তাদের ডেটলাইনের ডানপাশে একটি ড্যাশ দেওয়াই রীতি। যথা :

(ক) নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর—
(খ) ওয়াশিংটন, ৮ ডিসেম্বর—

খবর শুরু হবে ওই ড্যাশচিহ্নের পর থেকে।

(৩) তাপাঙ্ক যেখানে শূন্যের নীচে নেমে যায়, সেখানেও সংখ্যার বাঁ পাশে ড্যাশচিহ্ন দিতে হয়। (বস্তুত, এটি ড্যাশ নয়, বিয়োগচিহ্ন।) দৃষ্টান্ত :

কাল মস্কোর তাপমাত্রা ছিল —১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সে-ক্ষেত্রে লেনিনগ্রাদের তাপমাত্রা আরও তিন ডিগ্রি কম, —১৫।

মনে রাখুন, কপি লিখবার সময় ড্যাশচিহ্ন সর্বদাই একটু স্পষ্ট করে দিতে হয়, নইলে হাইফেনচিহ্নের সঙ্গে ছাপাখানার কর্মীরা এটিকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। কথাটা আরও এইজন্য বলা হল যে, কাগজে প্রায়ই ড্যাশের জায়গায় হাইফেন বার হতে দেখি।

কপিতে ড্যাশচিহ্ন এইভাবে দিন : ⊢⊣

হাইফেন

হাইফেনচিহ্নটি (-) দেখতে যদিও ড্যাশের চেয়ে ছোট, এর ভূমিকা কিন্তু আদৌ ছোট নয়। দুটি শব্দকে, দুটি সংখ্যাকে, কিংবা একটি শব্দ ও একটি সংখ্যাকে পরস্পরের সঙ্গে গায়ে-গায়ে জুড়ে না দিয়েও যখন একটা সম্পর্কের সূত্রে তাদের আমরা বাঁধতে চাই, তখনই আমাদের দরকার হয় তাদের মধ্যে একটি হাইফেন বসাবার।

(১) সাধারণ দুটি বিশেষ্যপদের মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) অণু-পরমাণুর রহস্য আজ আর কারও অজ্ঞাত নয়।

(খ) এই সেদিনও এটা যে ছিল জল-জঙ্গলে ভরা জায়গা, চোর-ডাকাতের রাজত্ব, আজ আর তা বোঝা যাবে না।

(২) দুটি নাম-বিশেষ্যর মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) আজকাল যে আর শেলি-কিট্‌সের সেই সমাদর নেই, এটা খুবই আক্ষেপের কথা।

(খ) ভারত-সিংহলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

(৩) সমার্থক অথবা প্রায়-সমার্থক দুটি শব্দের মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) পয়সা-কড়ির জোর থাকলে ইয়ার-দোস্ত জুটতে দেরি হয় না।
(খ) রুজি-রোজগারের ধান্ধাতেই যাদের জীবন কাটে, সুকুমার শিল্পের চর্চা তাদের কাছে বিলাস মাত্র।
(গ) মান-সম্মান তো গেছেই, এবারে জান-প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

(৪) শব্দের দ্বিত্বের ক্ষেত্রে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) দেখতে-দেখতে কেটে গেল একটা যুগ।
(খ) এত আস্তে-আস্তে হাঁটলে তো হবে না, এবারে একটু জোরে-জোরে পা চালাও।
(গ) প্রথমটায় একটু কিন্তু-কিন্তু করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হয়ে গেলেন।
(ঘ) যা বলবার স্পষ্ট করে বলো, আমতা-আমতা করছ কেন ?

(৫) দফতর বা প্রতিষ্ঠান ও পদের মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) কৃষি-মন্ত্রী। (খ) স্বরাষ্ট্র-সচিব। (গ) বোর্ড-সদস্য।

(৬) দুটি শব্দের সমবায় অনেক ক্ষেত্রে বিশেষণের কাজ করে। সেখানে সেই শব্দ দুটির মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) লোকসভার নির্বাচনে এবারে যাদবপুর একটি নজর-কাড়া কেন্দ্র।
(খ) রাস্তা মেরামত করবার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে শিকেয় তুলে রেখে এখন একটা কাজ-চালানো ব্যবস্থা হওয়া দরকার।
(গ) এত গায়ে-পড়া ভাব ভাল নয়।

(৭) স্থান ও অনুষ্ঠানের মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) বার্লিন-ওলিম্পিক। (খ) প্যারিস-সম্মেলন। (গ) সিমলা-চুক্তি। (ঘ) দিল্লি-বৈঠক।

(৮) দুটি সংখ্যার মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) লেন্ডল ২-৩ সেটে হেরে গেলেন।
(খ) বেকার ৩-২ সেটে জয়ী।
(গ) ক্যামেরুন ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছে।
(ঘ) কাজ শেষ হতে আরও ১০-১৫ বছর লাগবে।

(৯) সংখ্যা ও শব্দের মধ্যে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) ৬-ফুট লম্বা। (খ) ১২-ফুট উঁচু।

(১০) দিক-নির্দেশের ব্যাপারে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আজ একটি নূতন তারা দেখা গেল।
(খ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থা এখন মোটামুটি শান্ত।

(১১) প্রকৃত পরিচয় গোপন করবার জন্য যখন সাংকেতিক একাক্ষর নাম ব্যবহার করা হয়, তখনও মাঝে-মাঝে দরকার হয় হাইফেনের। দৃষ্টান্ত :

(ক) খ-বাবু বললেন, "আজই হামলা চালাতে হবে।"
(খ) জ-বাবু বললেন, "খেয়াল রেখো, কথাটা যেন কেউ টের না পায়।"

(১২) অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে হাইফেন বসাবার দৃষ্টান্ত :

(ক) বাবা-বাছা বলে কাজ হবে না, শক্ত হওয়া চাই।
(খ) দিচ্ছি-দেব করে আর কত দিন চলবে ?
(গ) হচ্ছে-হবে করে আর মানুষকে শান্ত রাখা যাবে না।
(ঘ) কোনও শব্দকে ভেঙে দু' লাইনে বসাবার দরকার হলেও হাইফেন বসিয়ে তাকে দু' টুকরো করতে হয়। ধরা যাক, 'ঈশ্বরচন্দ্র' শব্দটি লাইনে আঁটছে না। সে ক্ষেত্রে প্রথম লাইনের শেষে বসবে 'ঈশ্বর-', দ্বিতীয় লাইনের গোড়ায় বসবে 'চন্দ্র'। এই শব্দ ভাঙার কাজটা হয় ছাপাখানায়। ছাপাখানার কর্মীকে তাই জানতে হয় যে, শব্দকে যত্রতত্র ভাঙা চলে না। যেমন, প্রথম লাইনের শেষে 'ঈশ্ব-' বসিয়ে পরের লাইনের গোড়ায় 'রচন্দ্র' বসালে বুঝতে হবে যে, শব্দটিকে ভুল জায়গায় ভাঙা হয়েছে।

(১৩) একই বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ যখন বারবার আসতে থাকে, বাক্যটি তখন ভারাক্রান্ত হয়। হাইফেনের সাহায্য নিলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই শব্দটিকে বারবার ব্যবহার করবার দরকার হয় না। অবশ্য সে-সব ক্ষেত্রে হাইফেন বসাবারও আছে একটা বিশেষ পদ্ধতি। নীচের বাক্যটি লক্ষ করুন :

বেকার সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা, পরিবহণ সমস্যা, খাদ্য সমস্যা ও বিদ্যুৎ সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন আজ বিপর্যস্ত।

এই যে বাক্যটি, 'সমস্যা' শব্দটা এতে বারবার আসছে। হাইফেনের সাহায্য নিলে কিন্তু শব্দটিকে একবারের বেশি ব্যবহার করতে হয় না। হাইফেন সে-ক্ষেত্রে কীভাবে বসবে, দেখুন :

বেকার-, শ্রমিক-, পরিবহণ-, খাদ্য- ও বিদ্যুৎ-সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন

আজ বিপর্যস্ত।

মনে রাখুন, কপি লিখবার সময় হাইফেনচিহ্নটি যেন স্পষ্ট হয়। কাগজে যেমন ড্যাশের জায়গায় প্রায়ই হাইফেন ছাপা হয়, তেমন হাইফেনের জায়গায় ড্যাশ কিছু কম ছাপা হয় না। ভুলটা যাতে না হয়, তার জন্য কপিতে হাইফেনচিহ্ন এইভাবে দিন : =

বিন্দুচিহ্ন বা ডট

বাংলায় সাধারণত অঙ্কের সংখ্যা ছাড়া অন্যত্র বিন্দুচিহ্ন (.) বা সিঙ্গল ডটের ব্যবহার দেখা যায় না। বিদেশি নানা ভাষায় কিন্তু শব্দ-সংক্ষেপণের জন্যও এই চিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার চোখে পড়ে। (দৃষ্টান্ত Lieutenant-এর সংক্ষেপিত রূপ Lt.) আমরা সে-ক্ষেত্রে বিসর্গ বর্ণের সাহায্যে সংক্ষেপণের কাজ চালাই। 'ডক্টর' শব্দটিকে সংক্ষেপে আমরা 'ডঃ' লিখি, যেমন 'মিস্টার' তেমন 'মিনিট' শব্দটিকেও সংক্ষেপে লিখি 'মিঃ' ; আর ফিল্মের বিজ্ঞাপনে অনেক শিল্পীর নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা হয় 'অ্যাঃ'। অর্থাৎ কিনা শিল্পীটি পেশাদার নন, 'অ্যামেচার'। এই একই পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম জার্মানিকে বাংলা সংবাদপত্রে অনেক কাল ধরেই 'পঃ বঙ্গ' ও 'পঃ জার্মানি' লেখা হচ্ছে।

অথচ, সংখ্যায় যেমন আমরা বিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করি, শব্দ-সংক্ষেপণেও এই চিহ্নটিকে তেমন সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। অনেকে যে লাগান না, তাও নয়। লাগান বহু প্রতিষ্ঠানও। নামের পূর্বে তাঁরা 'ডঃ' না লিখে 'ড.' লেখেন। (যথা ড. সুকুমার সেন, ড. ভবতোষ দত্ত।) এই পদ্ধতিতে 'পঃ বঙ্গ' ও 'পঃ জার্মানি' না লিখে 'প. বঙ্গ' ও 'প. জার্মানি' লিখলে ক্ষতি নেই। বস্তুত, শব্দ-সংক্ষেপণের কাজে বিসর্গের তুলনায় বিন্দুচিহ্নের ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসংগত।

ত্রিবিন্দুচিহ্ন বা এলিপসিস

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, বিশিষ্ট এই বাঙালি কথাসাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাসে থাকত ত্রিবিন্দুচিহ্নের (...) ছড়াছড়ি। তিনি অবশ্য ব্যতিক্রম। তাঁর কথা যদি বাদ দিই, তা হলে দেখা যাবে, বাংলা লেখায় মূলত দুটি কারণে ত্রিবিন্দুচিহ্ন বা এলিপসিস ব্যবহার করা হয়।

প্রথমত, কেউ যখন আমতা-আমতা করে কথা বলেন, কিংবা বাক্য শুরু করেও কেউ যখন তা শেষ করেন না কিংবা শেষ করবার সুযোগ পান না,

তখন আমরা এই চিহ্ন ব্যবহার করি।

দ্বিতীয়ত, কারও বক্তব্য বা কোনও রচনা সর্বাংশে উদ্ধার না করে যখন আমরা তার কোনও-কোনও অংশ বাদ দিই, তখন বর্জিত অংশগুলির স্থানে আমরা ব্যবহার করি এই চিহ্ন। বর্জনের ব্যাপারটা তার ফলে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়।

প্রথম কারণে ত্রিবিন্দুচিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :

(ক) মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে যিনি বলছিলেন, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল যে, প্রকাশ্যে তা হলে তিনি সুপারিশগুলির বিরোধিতা করছেন না কেন, তখন তিনি বললেন, "না, মানে...আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে...অর্থাৎ কিনা আমি তো এ-সব সুপারিশের পুরোপুরি বিরোধীও নই...তবে হ্যাঁ, সুপারিশগুলি গ্রহণ করবার আগে সমস্ত দিক...মানে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সেটা ভেবে দেখলে ভাল হত।"

(খ) যাত্রীটি বিস্মিত হয়ে বললেন, "তার মানে..."

স্টেশন মাস্টার তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "মানে আর কী, কালকের আগে তো আর ট্রেন পাচ্ছেন না, সুতরাং রাতটা আপনাকে স্টেশনেই কাটাতে হবে।"

দ্বিতীয় কারণে ত্রিবিন্দুচিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :

(ক) "...আমাদের ঐক্য বাহিরের।...এ ঐক্য জড় অকর্মক, ইহা সজীব সকর্মক নয়।"

(খ) "পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি।...যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যতলে...গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।"

উপরের দুটি উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে। উদ্ধৃতিতে কিছু অংশ যে বাদ পড়েছে, ত্রিবিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করে তা বোঝানো হল।

বুদ্ধিজীবী। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন, প্রখ্যাত কোনও সাহিত্যিক যখন সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কিছু বলেন, তখন তাঁকে কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসাবেই উল্লেখ করা হয়, অথচ সেই একই মানুষ যখন অন্য কোনও বিষয়ে—ধরা যাক উপসাগরীয় যুদ্ধ কিংবা 'সিটি অব জয়' নিয়ে—কোনও মন্তব্য করেন, কিংবা স্বাক্ষর করেন কোনও বিবৃতিতে, তখনই হঠাৎ পালটে যায় তাঁর পরিচয়—তিনি তখন বুদ্ধিজীবী! পরিচয়ের এই যে অযৌক্তিক ও আকস্মিক পরিবর্তন, সর্বত্র এটা কৌতুকাবহ ব্যাপার বলে গণ্য হয়ে থাকে। বস্তুত, ইংরেজি intellectual শব্দটা আজকাল ব্রিটেনেও হাসির খোরাক জোগায়, সম্ভ্রম উৎপাদন করে না। এই সহজ সত্যটা মনে রাখুন, এবং

ব

অনর্থক 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটা ব্যবহার না করে যে-বিষয়ে যাঁর অধিকার ও চর্চা, তারই সূত্রে তাঁর পরিচয় দিন। যথা, অর্থনীতিবিদ ড. ভবতোষ দত্ত, ঐতিহাসিক ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

লিখুন	লিখবেন না
বাগিচা	বাগীচা
বাঙালি	বাঙালী
বাজি (অশ্ব ছাড়া অন্যান্য অর্থে)	বাজী
বাজী (অশ্ব অর্থে)	বাজি
বাণ (শর বা শায়ক)	বান
বাদশাহি	বাদশাহী
বাঁদি	বাঁদী
বাদুড়	বাদুর
বাধা (১. বিঘ্ন, ব্যাঘাত ইত্যাদি। ২. ঘটা, লাগা বা শুরু হওয়া। যথা ঝগড়া বাধা, দাঙ্গা বাধা, যুদ্ধ বাধা।)	বাঁধা
বাঁধা (বন্ধন করা হয়েছে এমন অথবা বন্ধন করা। যথা বাঁধা গোরু, চুল বাঁধা, বই বাঁধা।)	বাধা
বান (বন্যা অর্থে)	বাণ
বানি (গহনা তৈরি করবার মজুরি অর্থে)	বাণি, বাণী, বানী
বার ('তারিখ, বার' দেখুন)	—
বারো	বার
বাল্‌ব	বাল্ব
বালাপোশ	বালাপোষ
বাঁশি	বাঁশী

ব

লিখুন	লিখবেন না
বাস স্টপ (বাস থামার জায়গা)	বাস স্টপেজ
বাসী	বাসি
বাসুকি	বাসুকী
বি. এসসি.	বি. এস. সি.
বিকিরণ	বিকীরণ
বিকীর্ণ	বিকির্ণ
বিক্রীত	বিক্রিত
বিজলি	বিজলী
বিদেশি	বিদেশী
বিন্দুচিহ্ন ('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
বিন্ধ্যেশ্বরী	বিন্ধেশ্বরী
বিপণন	বিপনন
বিপণি	বিপণী, বিপনি, বিপনী
বিবৃতি ('বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষণ' দেখুন)	—
বিমা	বীমা
বিস্ময়চিহ্ন ('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
বিশদভাবে	বিশদে
বিশ্বজিৎ	বিশ্বজিত
বিশ্রী	বিশ্রি
বিস্ফারিত	বিষ্ফারিত
বিস্ফোরক	বিষ্ফোরক
বিস্ফোরণ	বিষ্ফোরণ
বিস্ময়চিহ্ন ('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
বেআইনি	বেআইনী
বেকারি	বেকারী
বেঙ্কট	ভেঙ্কট

ব

লিখুন	লিখবেন না
বেজবরুয়া (অসমিয়া পদবি। 'নাম' দেখুন)	বেজবড়ুয়া
বেলোয়ারি	বেলোয়ারী
বেশি	বেশী
বেসরকারি	বেসরকারী
বেহারি	বেহারী
ব্যাহত	ব্যহত
ব্রিটিশ	বৃটিশ
ব্রিটেন	বৃটেন

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

বলছ (বলিতেছ)	বলছো
বলছিল (বলিতেছিল)	বলছিলো
বলত (বলিত)	বলতো
বলব (বলিব)	বলবো
বলল (বলিল)	বললো
বলাও (বলাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে বলাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
বলাচ্ছ (বলাইতেছ)	বলাচ্ছো
বলাচ্ছিল (বলাইতেছিল)	বলাচ্ছিল
বলাত (বলাইত)	বলাতো
বলান (বলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে বলাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—

ব

লিখুন	লিখবেন না
বলানো (বলাইবার কাজ)	বলান
বলাব (বলাইব)	বলাবো
বলাল (বলাইল)	বলালো
বলিয়েছিল (বলাইয়াছিল)	বলিয়েছিলো
বলিয়ো (বলাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	বলিও
বলেছিল (বলিয়াছিল)	বলেছিলো
বলো (বলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে বলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	বল
বোলো (বলিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	বোল



ভ

ভগবৎ। **'ভগবত'** লিখবেন না।

ভঙ্গি। অনেকে **'ভঙ্গী'** লেখেন, ছাপাও হয়। কিন্তু ঈ-কার দেবেন না।

ভবিষ্যৎ। কাগজে মাঝে-মাঝে **'ভবিষ্যত'** বানান বার হয়। এ-কালের এক বিখ্যাত বাঙালি কবির গ্রন্থের প্রচ্ছদে (ও অন্যত্র) আমরা 'ভবিষ্যৎ' শব্দের এই বানান ('ভবিষ্যত') ছাপা হতে দেখেছি। কিন্তু বানানটা ভুল। 'খণ্ড ত' এ-ক্ষেত্রে অপরিহার্য। নইলে (সন্ধির নিয়মে) 'ভবিষ্যদ্বাণী' মিলবে না।

ভস্মসাৎ। 'নস্যাৎ'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে অনেকে বানান লেখেন 'ভস্মস্যাৎ'। তাঁরা ভুল লেখেন। মনে রাখুন 'আত্মসাৎ', 'ভস্মসাৎ', 'ভূমিসাৎ'। য-ফলা নেই।

ভাজা। যথা, 'মাছ ভাজা'। এ 'ভাজা'য় চন্দ্রবিন্দু নেই।

ভাঁজা। অর্থ: 'ভাঁজ করা'। তা ছাড়া, কসরত করা; যথা, 'মুগুর ভাঁজা'। সুরের অভ্যাস কি আলাপ করা; যথা, 'সুর ভাঁজা'। এ-সব অর্থে ব্যবহারের সময় চন্দ্রবিন্দু লাগবে।

ভাটা, ভাটি। অর্থ: (১) 'নদীতে জোয়ারের বিপরীত অবস্থা', (২) 'ইট পোড়াবার চুল্লি', (৩) 'চুন তৈরি করবার জায়গা', (৪) 'রজক যাতে বস্ত্রাদি সিদ্ধ করে, সেই জায়গা কিংবা পাত্র'। এ-সব অর্থে ব্যবহারের সময় চন্দ্রবিন্দু লাগাবেন না।

ভাঁটা। অর্থ: 'গোলক'। যথা, **'ভাঁটার** মতো চোখ'। এই অর্থে ব্যবহারের সময় চন্দ্রবিন্দু চাই।

ভারী। অর্থ: 'ভারযুক্ত'। অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হলেও (যথা, **'ভারী** সুন্দর') শব্দটির সঙ্গে মূল অর্থের একটা ক্ষীণ যোগসম্পর্ক থাকেই। তৎসম শব্দ, সুতরাং বানান পালটে **'ভারি'** লিখবেন না।

ভাল। **'ভালো'** লিখবেন না। ললাট-অর্থে 'ভাল' শব্দের ব্যবহার, এমন কী, পদ্যেও আজকাল বিশেষ চোখে পড়ে না। সুতরাং ও-কার না দিলেই যে সেই **'ভাল'**-এর সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা হবে, এমন আশঙ্কার কারণ নেই।

ভালবাসা। **'ভালোবাসা'** লিখবেন না।

ভাষণ। 'বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষণ' দেখুন।

ভাষা। যাঁরা লেখালিখির কাজ করেন, একটা কথা তাঁদের মনে রাখা দরকার। সেটা এই যে, নানা দেশে যেমন নানা ভাষা রয়েছে, তেমন আবার প্রতিটি ভাষাতেই রয়েছে বিভিন্ন স্তর। এ-ব্যাপারে বঙ্গভাষা কোনও ব্যতিক্রম নয়, স্তরের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সেখানেও সকলের চোখে পড়ে।

ভাষার স্তরগুলিকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। আমরা এখানে দু' ভাগে

ভাগ করে নিচ্ছি। কঠিন ও সরল।

যিনি বঙ্গভাষী, তিনি যে এই দুই স্তরের বাংলাই বুঝতে পারবেন, এমন কোনও কথা নেই। কঠিন স্তরের বাংলা কে কতটা বুঝবেন, তা নির্ভর করে সেই স্তরের বঙ্গভাষার সঙ্গে কার পরিচয় কতটা ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক, তার উপরে। ভাষা আর কিছুই নয়, মাধ্যম মাত্র। বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। বক্তব্য যখন কঠিন ভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, কিছু মানুষ তখনও তা ঠিকই বুঝতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই তা বোধগম্য হয় না।

কঠিন ভাষা যে এই কারণেই একেবারে সর্বথা পরিত্যাজ্য, এমন কথা বলা হচ্ছে না। বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রবন্ধে কি আলোচনায় তারও প্রয়োজন থাকতেই পারে। বিশেষত সেই সব প্রবন্ধে ও আলোচনায়, যার লক্ষ্য প্রধানত পণ্ডিতসমাজ। খবরের কাগজের পাঠকদের মধ্যে পণ্ডিতসমাজও আছেন বই কী। কিন্তু তাঁদের তুলনায় এমন পাঠকের সংখ্যা অবশ্যই অনেক বেশি, ভাষার স্তর কঠিন হলে বিষয় বা বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করতে যাঁদের অসুবিধা হয়। আমরা যখন সংবাদপত্রের জন্য কিছু লিখি, অর্থাৎ তর্জমা করি কোনও খবর, অথবা রচনা করি কোনও প্রতিবেদন কি নিবন্ধ, তখন তাঁদের কথাটাই সর্বাগ্রে আমাদের চিন্তা করা দরকার। ভাবা দরকার, ভাষার কোন স্তর নির্বাচন করে নিলে আমাদের রচনার বিষয় বা বক্তব্য সেই বৃহত্তর পাঠকসমাজ সহজে বুঝতে পারবেন।

স্তর নির্বাচনের প্রসঙ্গে যা নিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই, তা এই যে, সরল ভাষার তুলনায় কঠিন ভাষার নাগাল অনেক সীমাবদ্ধ। বস্তুত, সংবাদপত্রে যা ছাপা হয়, তার ভাষা যদি হয় কঠিন স্তরের, এই সীমাবদ্ধতার কারণেই তা বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছতে পারে না।

সংবাদপত্রকে কিন্তু বৃহত্তর পাঠকসমাজের কথা ভাবতেই হয়। ফলে, কঠিন স্তরের ভাষাকে প্রশ্রয় দেবার কোনও উপায়ই তার নেই। এই সহজ কথাটা আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, খবরের কাগজের জন্য যা-কিছুই আমরা লিখি, তার ভাষা সহজ-সরল হওয়াই চাই।

আমরা সরল ভাষার পক্ষপাতী। কিন্তু সরল ভাষা বলতে তরল ভাষা বোঝায় না। যেমন, আবেগ বলতে বোঝায় না উচ্ছ্বাস। ভাষা সম্পূর্ণ নিরাবেগ হবে, এমন দাবি অনুচিত। কেননা, যা নিতান্ত নিরাবেগ, সেই শুকনো 'কেঠো' ভাষা একই জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকে, আবেগের ছোঁয়া না লাগা পর্যন্ত তাতে গতির স্পন্দন জাগে না। কিন্তু আবেগ নামক ব্যাপারটাকে যে সংযমের লাগাম পরিয়ে রাখা চাই, সেটাও মনে রাখুন। যে

আবেগ সংযত নয়, উচ্ছ্বসিত, ভাষাকে তা অনর্থক আবিল করে মাত্র। রচনার স্বচ্ছতা তাতে নষ্ট হয় ; লেখকের যা বক্তব্য, তা উচ্ছ্বাসের ফেনার তলায় চাপা পড়ে যায়।

যাকে আমরা কাব্যগুণ বলি, বক্তব্য বিষয়ের দাবি অনুযায়ী, গদ্যভাষাতেও অনেকে মাঝে-মাঝে তার ছোঁয়া লাগিয়ে দেন। সেটা নিন্দনীয় নয়। তবে, *'বক্তব্য বিষয়ের দাবি অনুযায়ী'* বাক্যাংশটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিষয়বস্তু যদি দাবি করে, তবেই গদ্যভাষা ঈষৎ কাব্যগুণান্বিত হবে, নইলে হবে না। অন্য দিকে, ঠাট্টা করে যাকে 'কাব্যিকতা' বলা হয়, এবং নির্ভেজাল কবিতাও যার স্পর্শ আদৌ পছন্দ করে না, গদ্যভাষায় তাকে প্রশ্রয় দেওয়া একান্ত অনুচিত। কথাটা এইজন্য বলছি যে, কাব্যিকতাকে প্রশ্রয় দিলে গদ্যভাষা এলিয়ে যায়, এবং ভাষার মধ্যে এমন এক ধরনের মেরুদণ্ডহীনতা প্রকট হয়, যা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র।

আর একটা ব্যাপারেও সতর্ক থাকা দরকার। যখন খুব গরম পড়ে, বা একটানা গরমের পরে হঠাৎ যখন নামে বৃষ্টি, তখন সেটা প্রতিবেদনের বিষয়

> *'নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত'* বলে কোনও খবরকে চিহ্নিত করবেন না। করলে প্রশ্ন উঠবে, অন্যান্য খবরের সূত্র কি তা হলে নির্ভরযোগ্য নয় ? *'পরিশেষে বলি'*, *'প্রসঙ্গত বলি'* ইত্যাদিও যথাসম্ভব বর্জনীয়। কোনও কথা পরিশেষে অথবা প্রসঙ্গত বলা হচ্ছে কি না, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। *'বলা বাহুল্য'*ও লেখা উচিত নয়। বাহুল্যই যদি হবে, তা হলে বলছেন কেন ?

হতেই পারে, কিন্তু সেই প্রতিবেদনে 'প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে', 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে' ইত্যাদি সব পঙ্‌ক্তি যে লাগাতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। আবহাওয়া-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই ধরনের পঙ্‌ক্তি ব্যবহার এক-আধ বারই চলতে পারে, ক্রমাগত চালালে ব্যাপারটা ক্রমশ হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী কি কবিতার সঙ্গে কারও পরিচয় অবশ্য যারপরনাই ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব, কিন্তু খবরের কাগজের প্রতিবেদন যে তার প্রমাণ দাখিল করবার আদর্শ জায়গা নয়, এটা মনে রাখুন।

নিরলঙ্কার গদ্যই সংবাদপত্রের পক্ষে আদর্শ গদ্য। যা বলবার, সরাসরি বলুন, এবং এমন ভাষায় বলুন, আপনার বক্তব্য যাতে সহজেই আপনার

পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। আপনার বক্তব্য নিয়ে যেন কোনও সংশয় দেখা না দেয়।

রূপকালঙ্কারকে বিদায় দিন। কারও মৃত্যু ঘটলে সেই ভাষায় সেটা লিখুন, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। 'প্রাণপাখি খাঁচা থেকে উড়ে গেল', 'জীবনদীপ নির্বাপিত হল' ইত্যাদি লিখবেন না। মনে রাখুন, 'বুধবার প্রত্যুষ পাঁচ ঘটিকায় তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়' না লিখে 'বুধবার ভোর পাঁচটায় তিনি মারা যান' লেখাই ভাল। তাতে মৃতের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা সূচিত হয় না।

যে-ভাষা জীবন্ত, বরাবর তা এক জায়গায় একই চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বঙ্গভাষা একটি জীবন্ত ভাষা। সেও তাই আজন্ম দাঁড়িয়ে থাকেনি একই জায়গায় অথবা একই চেহারায়। আমাদের প্রয়োজনের সূত্র ধরে যেমন-যেমন সে এগিয়েছে, তেমন-তেমন তার রূপেরও কিছু কম পরিবর্তন ঘটেনি। এক দিকে যেমন অন্য নানা ভাষা থেকে নতুন-নতুন শব্দ গ্রহণ ও আত্মস্থ করে সে বাড়িয়ে নিয়েছে তার শব্দভাণ্ডার, অন্য দিকে তেমন ধীরে-ধীরে তার প্রকাশরীতিও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রকাশরীতি ধীরে-ধীরেই পালটায়। গায়ের জোরে রাতারাতি তাকে পালটানো যায় না। বিশেষত, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যা আপনি রচনা করছেন, তাতে তেমন জোর খাটাবার চেষ্টা না করাই ভাল। বাংলা ভাষার এখনকার যেটা স্বাভাবিক প্রকাশরীতি, কোথাও কোনও বাক্যের সঙ্গে তার কোনও বিরোধ ঘটছে কি না, সেটা ভেবে দেখুন। যদি মনে হয়, ঘটছে, তা হলে সেই বাক্যটিকে এমনভাবে লিখুন, যাতে রীতিগত বিরোধ দেখা না দেয়। বিরোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'দাবি রাখা', 'বক্তব্য রাখা', 'পদক্ষেপ নেওয়া', 'প্রস্তুতি নেওয়া' ইত্যাদির কথা বলা যায়। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশরীতির সঙ্গে যিনি সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষপাতী, এ-সব কথা তিনি এইভাবে বলবেন না বা লিখবেন না। তিনি চাইবেন, দাবি না রেখে সেটা তোলা হোক বা পেশ করা হোক। বক্তব্যও না রেখে সেটা জানানো যেতে পারে বা পেশ করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে, পদক্ষেপ না নিয়ে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া চাই, তেমনই প্রস্তুতি না নিয়ে বরং প্রস্তুত হওয়াই ভাল।

প্রতিটি ভাষাতেই আছে তার নিজস্ব নানা প্রতীকী বাগ্‌ভঙ্গিমা ও অভিব্যক্তি। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী যোগাযোগের কারণে এই ধরনের কিছু-না-কিছু ইংরেজি অভিব্যক্তি যে বাংলাতেও ঢুকে পড়বে, এটা অস্বাভাবিক নয়। তাদের মধ্যে যেগুলি বেশ কিছু কাল ধরে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি আর এখন কারও অস্বস্তি উৎপাদন করে

না। বস্তুত, দুর্দিনের মধ্যেও যে থাকে সুদিনের শুভ ইঙ্গিত, এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে আমরা যখন বলি, 'প্রতিটি মেঘেরই থাকে রুপালি রেখা,' তখন আমাদের অনেকের হয়তো মনেও পড়ে না যে, প্রতীকী এই বাগ্‌ভঙ্গিমা আসলে 'এভ্‌রি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং'-এরই বঙ্গানুবাদ মাত্র। পক্ষান্তরে, এমন ইংরেজি অভিব্যক্তির সংখ্যাও কম হবে না, আমাদের স্বাভাবিক প্রকাশরীতির সঙ্গে যা মিশে যেতে পারেনি, এবং মিশে যাওয়া হয়তো সম্ভবও নয়। বাংলা লেখায় সেগুলির উপস্থিতিও তাই আমাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ৫ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার ছয়ের পাতায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের এক জায়গায় লেখা হয়েছে, '...পূর্ণ সাফল্য এখন করমর্দনের দূরত্বে।' কিন্তু, কোনও কিছু যে খুবই নিকটবর্তী, তা ইংরেজিতে এইভাবে বোঝানো হলেও বঙ্গভাষা এখনও এই বাগ্‌ভঙ্গিমাকে আপন জ্ঞানে গ্রহণ করেনি। সুতরাং 'পূর্ণ সাফল্য'কে এ-ক্ষেত্রে 'করমর্দনের দূরত্বে' না রেখে 'হাতের নাগালে' রাখলে সেটাই সংগত হত। ('তর্জমা' দেখুন।)

প্রকাশরীতি আড়ষ্ট বা অস্বাভাবিক হওয়া অনুচিত। বাংলা সংবাদপত্রের জন্য যখনই যা-কিছু আপনি লিখবেন, তা যথাসম্ভব সহজ-সরল বাংলায় তো আপনি লিখবেনই, সেইসঙ্গে এই জরুরি কথাটাও আপনার ভুললে চলবে না যে, বাংলা ভাষার এখনকার যা স্বাভাবিক প্রকাশরীতি, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তা আপনাকে লিখতে হবে।

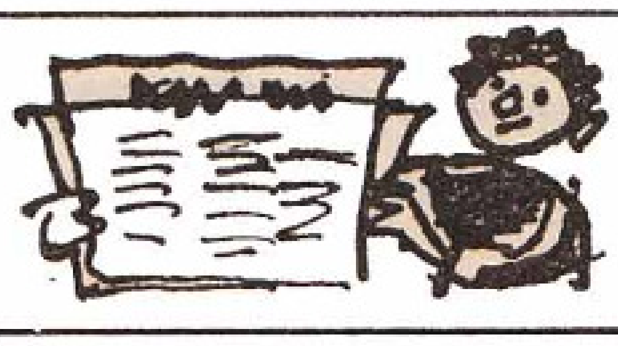
মনে রাখুন

(১) সংবাদপত্রকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কথা ভাবতেই হয়। তাঁরা যাতে অক্লেশে বুঝতে পারেন, তারই জন্য সংবাদপত্রের ভাষা সহজ-সরল হওয়া চাই।

(২) সরল ভাষা বলতে কিন্তু তরল ভাষা বোঝায় না। উচ্ছ্বাস ও কাব্যিকতা পরিহার্য। উচ্ছ্বাস ভাষাকে আবিল করে। কাব্যিকতা পাঠকের বিরক্তি ঘটায়।

(৩) সংবাদপত্রের পক্ষে নিরলঙ্কার গদ্যই আদর্শ গদ্য।

(৪) বক্তব্যকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে, যাতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশরীতির সঙ্গে তার কোনও বিরোধ না ঘটে।



ভ

লিখুন	লিখবেন না
ভিখারি	ভিখারী
ভিড়	ভীড়
ভিতু	ভীতু
ভিমরুল	ভীমরুল
ভীরু	ভিরু
ভুজ (হাত অর্থে)	ভূজ
ভুটান	ভূটান
ভুঁড়ি (স্ফীত উদর অর্থে)	ভূড়ি, ভূঁড়ি
ভুল	ভূল
ভূমিসাৎ	ভূমিস্যাৎ
ভূরি (প্রচুর অর্থে, যথা ভূরিভোজন)	ভুড়ি, ভুড়ী, ভুরী
ভূর্জপত্র	ভুর্জপত্র
ভৌগোলিক	ভৌগলিক
ভ্রাম্যমাণ	ভ্রাম্যমান

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

ভাসছ (ভাসিতেছ)	ভাসছো
ভাসছিল (ভাসিতেছিল)	ভাসছিলো
ভাসত (ভাসিত)	ভাসতো
ভাসব (ভাসিব)	ভাসবো
ভাসল (ভাসিল)	ভাসলো
ভাসাও (ভাসাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ভাসাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—

ভ

লিখুন	লিখবেন না
ভাসাচ্ছ (ভাসাইতেছ)	ভাসাচ্ছো
ভাসাচ্ছিল (ভাসাইতেছিল)	ভাসাচ্ছিলো
ভাসাত (ভাসাইত)	ভাসাতো
ভাসান (ভাসাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে ভাসাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
ভাসানো (ভাসাইবার কাজ)	ভাসান
ভাসাব (ভাসাইব)	ভাসাবো
ভাসাল (ভাসাইল)	ভাসালো
ভাসিয়েছিল (ভাসাইয়াছিল)	ভাসিয়েছিলো
ভাসিয়ো (ভাসাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ভাসিও
ভেসে ছিল (ভাসমান অবস্থায় ছিল)	ভেসে ছিলো, ভেসেছিল, ভেসেছিলো
ভেসেছিল (ভাসিয়াছিল)	ভেসেছিলো
ভাসো (ভাসিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে ভাসিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ভাস
ভেসো (ভাসিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	ভেস



ম

মজুরি । অর্থ : (১) 'মজুরবৃত্তি', (২) 'পারিশ্রমিক' । **'মজুরী'** লিখবেন না ।

মণি । **'মনি'** লিখবেন না ।

মণীন্দ্র, মণীশ । এই শব্দ দুটি প্রায়ই ভুল বানানে কাগজে বার হয় (**'মনীন্দ্র', 'মনীশ'**) । 'মূর্ধন্য ণ' যে অপরিহার্য, সেটা মনে রাখুন ।

মৎস্য । 'বৎস' বানানে য-ফলা লাগে না, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে লাগবে ।

মদতে পুষ্ট । **'মদতপুষ্ট'** লিখবেন না । 'মদত' শব্দে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু এই ধরনের সমাসে আছে । কথাটাকে ভেঙে অতএব 'মদতে পুষ্ট' লিখুন । আরও ভাল হয় 'সাহায্যপুষ্ট' লিখলে । 'মদত'-এর দাপটে 'সাহায্য' না ঘরছাড়া হয়, সেদিকে নজর রাখার সময় এসেছে ।

মধ্যাহ্ন । **'মধ্যাহ্ণ'** লিখবেন না ।

মনীষা । **'মণি'**র সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেটা ভুলে গিয়ে অনেকে লেখেন **'মণীষা'**, কাগজে এই ভুল বানান ছাপা হতেও দেখি । এ-ক্ষেত্রে 'দন্ত্য ন' চাই ।

মনীষী । **'মণীষী'** লিখবেন না ।

মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিপদ, মন্ত্রিমণ্ডলী, মন্ত্রিসভা । **'মন্ত্রী'** । কিন্তু তাই বলে 'মন্ত্রীত্ব', 'মন্ত্রীপদ', 'মন্ত্রীমণ্ডলী', 'মন্ত্রীসভা' লিখবেন না ।

মরাঠি । **মরাঠী, মারাঠি** বা **মারাঠী** লিখবেন না ।

মরিচ । 'মরীচ' লিখবেন না ।

মরূদ্যান । **মরু** । কিন্তু মরু+উদ্যান=**মরূদ্যান** । ভুল করে **'মরুদ্যান'** বানান করবেন না । ঊ-কার লাগবে, এটা মনে রাখুন ।

মশারি । **'মশারী'** লিখবেন না ।

মহীয়সী । **'মহিয়সী'** লিখবেন না । (তুলনীয় : 'গরীয়সী', 'পটীয়সী' 'পাপীয়সী', 'ভাগীরথী', 'হরীতকী' ।)

মাকড়ি । **'মাকড়ী'** লিখবেন না ।

মাণিক্য । **'মানিক্য'** লিখবেন না । কিন্তু **'মানিক'** ।



ম

মাদ্রাজি। '**মাদ্রাজী**' লিখবেন না।

মার্কিন। '**মার্কিণ**' লিখবেন না। তা ছাড়া, মনে রাখুন, '**মার্কিন**' বিশেষণ পদ, সুতরাং এ থেকে আবার বিশেষণ বানাবার জন্য '**মার্কিনি**' অথবা '**মার্কিনী**' লিখবার দরকার হয় না।

মারফত। '**মারফৎ**' লিখবেন না।

মারীচ। '**মারিচ**' লিখবেন না।

মারোয়াড়ি। '**মাড়োয়ারি**', '**মাড়োয়ারী**' বা '**মারোয়াড়ী**' লিখবেন না।

মাসি। '**মাসী**' লিখবেন না। স্ত্রী-বাচক শব্দ বটে, তবে অ-তৎসম, তাই ঈ-কার দেবার দরকার নেই। (তুলনীয় : 'খুড়ি', 'দিদি', 'পিসি' ইত্যাদি।)

মিতালি। '**মিতালী**' লিখবেন না।

মির্জা। '**মীর্জা**' লিখবেন না।

মিলিজুলি। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মিলিজুলি সরকার' বলতে (১৫ জুন ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১) কী বোঝানো হয়েছে ? কোয়ালিশন সরকার ? একাধিক দল মিলে যে সরকার গড়ে, তাকে '**যৌথ সরকার**' লিখুন। 'মিলিজুলি' শব্দটিকে জোর করে বাংলা ভাষায় চালাবেন না।

মিলেমিশে। এই অর্থে অনেক সময় 'মিলেজুলে' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি। 'মিলেমিশে' লেখাই ভাল।

মুখস্থ। কথাটা '**মুখস্ত**' নয়, এটা মনে রাখুন।

মুখার্জি। '**মুখোপাধ্যায়**' লিখুন। 'মুখার্জি' বা 'মুখার্জী' লিখবেন না।

মুখোশ। '**মুখোস**' লিখবেন না।

মুদ্রা। কয়েকটি প্রধান দেশের মুদ্রার নাম আমরা জানি অবশ্যই, কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশেরই মুদ্রার নাম জানি না। ফলে, মাঝে-মাঝে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয়। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেই বিভিন্ন দেশের নাম এখানে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল, এবং প্রতিটি দেশের নামের পাশে রইল সেখানকার মুদ্রার নাম ও পরিচয়-প্রতীক।

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	পরিচয়-প্রতীক
অস্ট্রিয়া	শিলিং	ASch
অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	AS
আইসল্যান্ড	আইসল্যান্ড নিউ ক্রোনা	Ikr
আফগানিস্তান	আফগানি	Af
আবু ধাবি	দিরহাম	Dh
আয়ার্ল্যান্ড	আইরিশ পাউন্ড (পান্ট)	IR£

ম

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	পরিচয়-প্রতীক
আর্জেন্টিনা	অস্ট্রাল	A
আলজেরিয়া	আলজেরিয়ান দিনার	AD
আলবানিয়া	লেক	Lk
অ্যাংগোলা	কোয়াঞ্জা	Kz
ইউগোস্লাভিয়া	ইউগোস্লাভ দিনার	YuD
ইকুয়েডর	সুক্র	Su
ইজরায়েল	শেকেল	IS
ইতালি	লিরা	L
ইথিওপিয়া	বির	Birr
ইন্দোনেশিয়া	রুপিয়া	Rh
ইরাক	ইরাকি দিনার	ID
ইরান	রিয়াল	IR
উগান্ডা	উগান্ডান শিলিং	USh
উরুগুয়ে	উরুগুয়েইয়ান নিউ পেসো	peso
ওমান	ওমানি রিয়াল	OR
কঙ্গো	ফ্রাঁ	CFAfr
কলম্বিয়া	কলম্বিয়ান পেসো	peso
কস্টা রিকা	কস্টা রিকান কোলন	¢
কাতার	কাতারি রিয়াল	QR
কানাডা	কানাডিয়ান ডলার	C$
কাম্বোডিয়া	রিয়েল	CRI
কিউবা	কিউবান পেসো	peso
কুয়েত	কুয়েতি দিনার	KD
কেনিয়া	কেনিয়া শিলিং	KSh
কোরিয়া (উত্তর)	ওয়ন	Won
কোরিয়া (দক্ষিণ)	ওয়ন	W
ক্যামেরুন	ফ্রাঁ	CFAfr
গায়েনা	গায়েনিজ ডলার	G$
গ্রিস	ড্রাকমা	Dr
ঘানা	সেডি	¢
চিন	রেনমিনবি	Rmb

ম

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	পরিচয়-প্রতীক
চেকোস্লোভাকিয়া	কোরুনা	Kcs
জর্ডন	জর্ডন দিনার	JD
জাইরে	জাইরে	Z
জাপান	ইয়েন	Y
জামাইকা	জামাইকান ডলার	J$
জাম্বিয়া	কোয়াচা	K
জার্মানি	মার্ক	DM
জিম্বাবোয়ে	জিম্বাবোয়ে ডলার	Z$
ডেনমার্ক	ড্যানিশ ক্রোন	DKr
ডোমিনিকান রিপাবলিক	ডোমিনিকান রিপাবলিক পেসো	peso
তাইওয়ান	নিউ তাইওয়ান ডলার	NT$
তানজানিয়া	তানজানিয়ান শিলিং	TSh
তিউনিসিয়া	তিউনিসিয়ান দিনার	TD
তুরস্ক	টার্কিশ লিরা	TL
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	টি টি ডলার	TT$
থাইল্যান্ড	বাট	Bt
দক্ষিণ আফ্রিকা	র‍্যান্ড	R
দুবাই	দিরহাম	Dh
নরওয়ে	নরওয়েজিয়ান ক্রোন	NKr
নাইজেরিয়া	নাইরা	N
নামিবিয়া	সাউথ আফ্রিকান র‍্যান্ড	R
নিউজিল্যান্ড	নিউজিল্যান্ড ডলার	NZ$
নিকারাগুয়া	কর্ডোবা	C
নেদারল্যান্ডস	গিল্ডার	G/FI
নেপাল	নেপালি রুপি	NRs
পাকিস্তান	পাকিস্তানি রুপি	PRs
পানামা	বলবোয়া	B
পেরু	সোল	sol
পোর্তুগাল	এস্কুডো	Esc
পোল্যান্ড	জ্লোটি	Zl
প্যারাগুয়ে	গুয়েরানি	G

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	পরিচয়-প্রতীক
ফিজি	ফিজি ডলার	F$
ফিনল্যান্ড	মারকা	Fmk
ফিলিপিনস	ফিলিপিন পেসো	P
ফ্রান্স	ফ্রাঁ	FFr
বটসোয়ানা	পুলা	P
বলিভিয়া	বলিভিয়ান পেসো	peso
বাংলাদেশ	টাকা	Tk
বাহরিন	বাহরিন দিনার	BD
বাহামা	বাহামিয়ান ডলার	B$
বুরুন্ডি	বুরুন্ডি ফ্রাঁ	Bufr
বুলগারিয়া	লেভ	Lv
বেলজিয়াম	বেলজিয়ান ফ্রাঁ	Bfr
ব্রহ্মদেশ	কিয়াত	Kt
ব্রাজিল	ক্রুজাডো	Cz
ব্রিটেন	পাউন্ড/স্টার্লিং	£
ব্রুনেই	ব্রুনেই ডলার	Br$
ভারতবর্ষ	রুপি	Rs
ভিয়েতনাম	দং	D
ভেনেজুয়েলা	বলিভার	Bs
মরক্কো	দিরহাম	Dh
মরিশাস	মরিশাস রুপি	MRs
মাদাগাস্কার	মাদাগাস্কার ফ্রাঁ	Mgfr
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ডলার	$
মালটা	মালটিজ লিরা	Lm
মালয়েশিয়া	ম্যালেশিয়ান ডলার/রিঙ্গিট	M$
মিশর	ইজিপশিয়ান পাউন্ড	£E
মেক্সিকো	মেক্সিকান পেসো	peso
মোজাম্বিক	মেটিকাল	MT
ম্যাকাও	পাতাকা	MPtc
রোমানিয়া	লিউ	Lei
লাইবেরিয়া	লাইবেরিয়ান ডলার	L$

ম

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	পরিচয়-প্রতীক
লাওস	কিপ	K
লিবিয়া	লিবিয়ান দিনার	LD
লুক্সেমবুর্গ	লুক্সেমবুর্গ ফ্রাঁ	Luxfr
লেবানন	লেবানিজ পাউন্ড	L£
শ্রীলঙ্কা	শ্রীলঙ্কা রুপি	SLRs
সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	ইউ. এ. ই. দিরহাম	Dh
সাইপ্রাস	সাইপ্রাস পাউন্ড/টার্কিশ লিরা	C£/TL
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর ডলার	S$
সিরিয়া	সিরিয়ান পাউন্ড	S£
সুইজারল্যান্ড	সুইস ফ্রাঁ	SFr
সুদান	সুদানিজ পাউন্ড	S£
সুরিনাম	সুরিনাম গিল্ডার	SG
সেনেগাল	ফ্রাঁ	CFAfr
সোভিয়েত ইউনিয়ন	রুবল	Rb
সোয়াজিল্যান্ড	এমালেনজেনি	E
সৌদি আরব	সৌদি রিয়াল	SR
স্পেন	পেসেতা	Pta
হংকং	হংকং ডলার	HK$
হণ্ডুরাস	লেম্পিরা	La
হাইতি	গুর্ড	Gourde
হাঙ্গারি	ফোরিন্ট	Ft

মনে রাখুন

আন্তর্জাতিক বিনিময়-হার অনুযায়ী সব দেশের ডলার তুল্যমূল্য নয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের তুলনায় হংকং ডলারের মূল্য অনেক কম। ঠিক তেমনই, তুল্যমূল্য নয় সব দেশের ফ্রাঁও। যেমন, ফ্রান্সের ফ্রা'র তুলনায় বেলজিয়ামের ফ্রা'র মূল্য অনেক কম। একই নামের মুদ্রা নানান দেশে চলে বটে, কিন্তু তাই বলে তাদের মূল্যও যে একই হবে, এমন কোনও কথা নেই।

ম

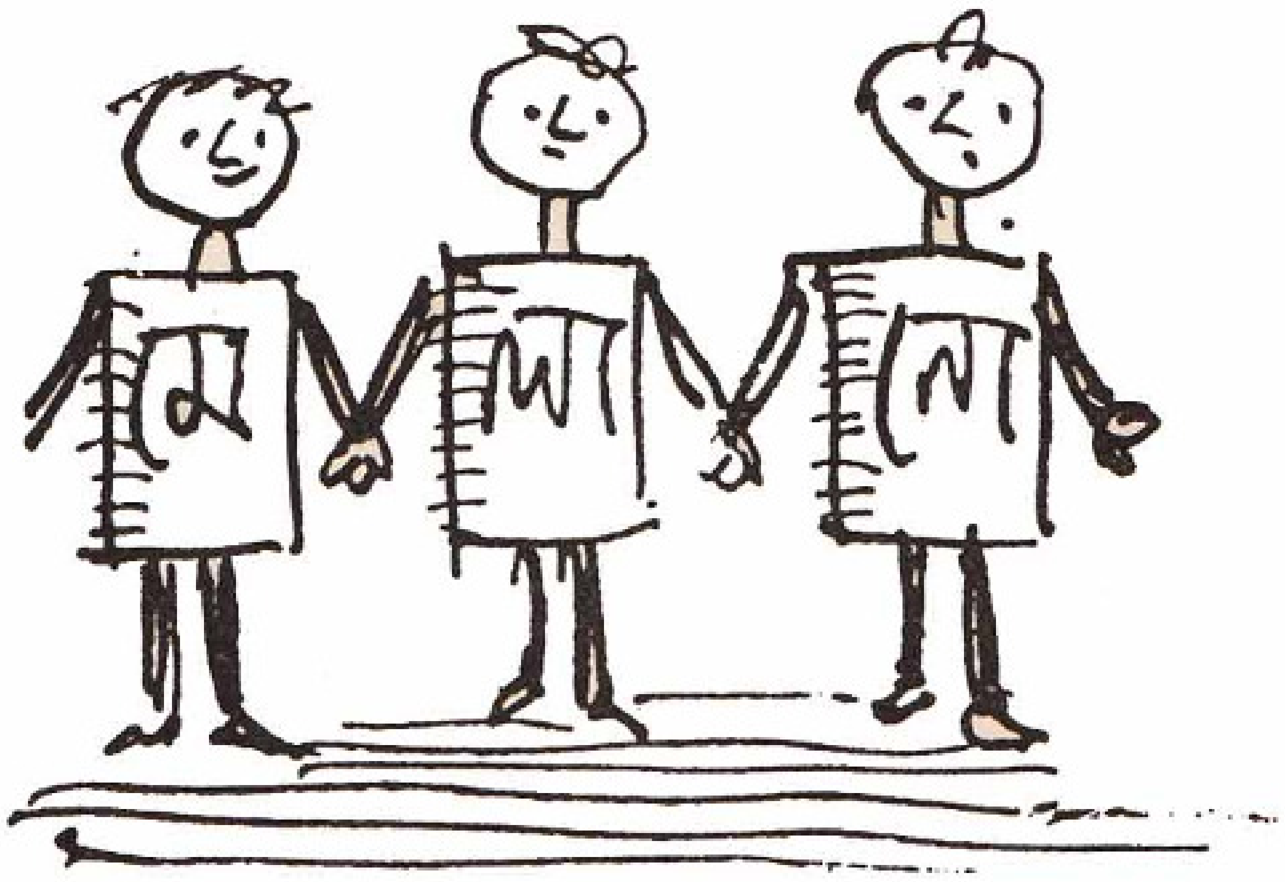
লিখুন	লিখবেন না
মুনশি	মুনশী, মুনসি, মুন্সি, মুনসী, মুন্সী
মুনি	মুণি
মুরগি	মুরগী, মুর্গী
মুরারি	মুরারী
মুহরি, মুহুরি	মুহরী, মুহুরী
মূল্যায়ন	মূল্যায়ণ
মেনকা	মানেকা
মেশিন	মেসিন
মৌসুমি	মৌসুমী
ম্রিয়মাণ	মৃয়মাণ, মৃয়মান, ম্রিয়মান

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

মিলছ (মিলিতেছ)	মিলছো
মিলছিল (মিলিতেছিল)	মিলছিলো
মিলত (মিলিত)	মিলতো
মিলব (মিলিব)	মিলবো
মিলল (মিলিল)	মিললো
মিলিয়েছিল (মিলাইয়াছিল)	মিলিয়েছিলো
মিলিয়ো (মিলাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	মিলিও
মিলেছিল (মিলিয়াছিল)	মিলেছিলো
মিলো (মিলিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	মিল

ম

লিখুন	লিখবেন না
মেলাও (মিলাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে মিলাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
মেলাচ্ছ (মিলাইতেছ)	মেলাচ্ছো
মেলাচ্ছিল (মিলাইতেছিল)	মেলাচ্ছিলো
মেলাত (মিলাইত)	মেলাতো
মেলান (মিলাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে মিলাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
মেলানো (মিলাইবার কাজ)	মেলান
মেলাব (মিলাইব)	মেলাবো
মেলাল (মিলাইল)	মেলালো
মেলো (মিলিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে মিলিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—



য

যক্ষ্মা। **'যক্ষা'** লিখবেন না।

যখনই। **'যখনি'** লিখবেন না।

যথেষ্ট। **'যথেষ্ঠ'** লিখবেন না। শব্দটির প্রচলিত অর্থ : 'প্রচুর'। মূল অর্থ কী, শব্দটিকে বিশ্লিষ্ট করলেই (যথা+ইষ্ট) তা বোঝা যায়। তখন অর্থ দাঁড়ায় 'যতটা ইচ্ছা' বা 'ইচ্ছানুরূপ'।

যষ্টি। অর্থ : 'ছড়ি' বা 'লাঠি'। **'যষ্ঠি'** লিখবেন না।

যাত্রিবাহী। 'যাত্রী'। কিন্তু 'যাত্রিবাহী', 'যাত্রিসাধারণ'।

যাবৎ। **'যাবত'** লিখবেন না। 'খণ্ড ত' অপরিহার্য। তার জায়গায় 'ত' বসালে একে তো বানান ভুল হবে, তার উপরে (সন্ধির নিয়মে) 'যাবজ্জীবন' ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যাবে না।

যুগোপযোগী। অর্থ : 'যুগের উপযোগী'। শব্দটিকে বিশ্লিষ্ট করলে দাঁড়ায় যুগ+উপযোগী। সন্ধির নিয়মে 'উ' হয়ে যাচ্ছে 'ও', এবং সেটি ও-কার হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হচ্ছে। এই কথাটা যাঁরা মনে রাখেন না, তাঁরা ভুল করে বানান লেখেন **'যুগপোযোগী'**।

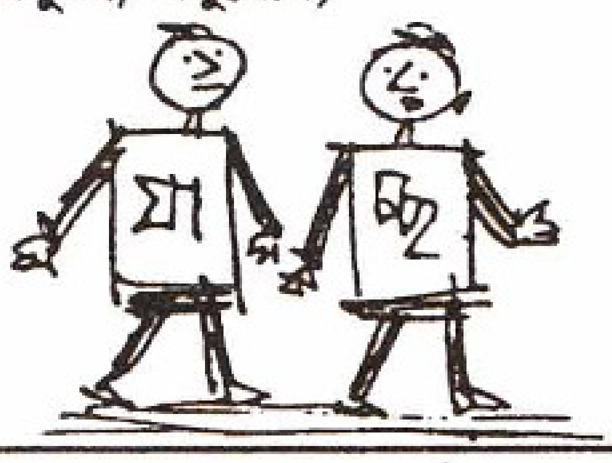
যেখানকার। কদাচ 'যেখানের' লিখবেন না। ('এখানকার', 'ওখানকার' ও 'সেখানকার' দ্রষ্টব্য।)

যোগসাজশ। **'যোগসাজস'** লিখবেন না।

লিখুন	**লিখবেন না**
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
গিয়েছিল (গিয়াছিল)	গিয়েছিলো
গেল (গমন করিল)	গেলো
যাইয়েছিল (যাওয়াইয়াছিল)	যাইয়েছিলো
যাইয়ো (যাওয়াইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	যাইও
যাও (গমন করো, ক্ষেত্র বিশেষে গিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—

য

লিখুন	লিখবেন না
যাওয়াও (যাওয়াইয়া থাকো, অথবা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
যাওয়াচ্ছ (যাওয়াইতেছ)	যাওয়াচ্ছো
যাওয়াচ্ছিল (যাওয়াইতেছিল)	যাওয়াচ্ছিলো
যাওয়াত (যাওয়াইত)	যাওয়াতো
যাওয়ান (যাওয়াইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে যাওয়াইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
যাওয়ানো (যাওয়াইবার কাজ)	যাওয়ান
যাওয়াব (যাওয়াইব)	যাওয়াবো
যাওয়াল (যাওয়াইল)	যাওয়ালো
যাচ্ছ (যাইতেছ)	যাচ্ছো
যাচ্ছিল (যাইতেছিল)	যাচ্ছিলো
যাব (যাইব)	যাবো
যেত (যাইত)	যেতো
যেয়ো (যাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	যেও



র

রং। **'রঙ'** লিখবেন না। তবে 'রঙিন', 'রঙের'।
রক্ষিবাহিনী। **'রক্ষী'**। কিন্তু **'রক্ষিবাহিনী'**। (তুলনীয় : 'মন্ত্রী'। কিন্তু 'মন্ত্রিসভা'।)
রঞ্জিত। 'রঞ্জন'-এর বিশেষণ। **'রঞ্জিৎ'** লিখবেন না।
রণজিৎ। অর্থ : 'রণজয়ী'। এখানে কিন্তু 'খণ্ড ত' অপরিহার্য ; **'রণজিত'** লিখবেন না। (তুলনীয় : 'বিশ্বজিৎ', 'সত্যজিৎ'।)
রথী। **'রথি'** লিখবেন না। কিন্তু **'সারথি'**, **'দাশরথি'**। পার্থক্যটা মনে রাখুন।
রাঁধুনি। **'রাধুনী'** লিখবেন না।

লিখুন	**লিখবেন না**
রানা	রাণা
রানি	রাণি, রাণী, রানী
রিকশা	রিকশো, রিকসা, রিক্সা
রিভলভার	রিভলবার
রুচিমান	রুচিবান
রুপা (রৌপ্য অর্থে)	রূপা
রুপালি	রুপালী, রুপুলি, রূপালি, রূপালী
রূপা (রূপময়ী অর্থে)	রুপা
রেজকি	রেজকী
রেণু	রেনু
রেণুকা	রেনুকা
রেফারি	রেফারী
রোপণ (বৃক্ষ কিংবা চারাগাছের ক্ষেত্রে)	বপন



ব

লিখুন	লিখবেন না
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
রাগছ (রাগিতেছ)	রাগছো
রাগছিল (রাগিতেছিল)	রাগছিলো
রাগত (রাগিত)	রাগতো
রাগব (রাগিব)	রাগবো
রাগল (রাগিল)	রাগলো
রাগাও (রাগাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে রাগাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
রাগাচ্ছ (রাগাইতেছ)	রাগাচ্ছো
রাগাচ্ছিল (রাগাইতেছিল)	রাগাচ্ছিলো
রাগাত (রাগাইত)	রাগাতো
রাগান (রাগাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে রাগাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
রাগানো (রাগাইবার কাজ)	রাগান
রাগাব (রাগাইব)	রাগাবো
রাগাল (রাগাইল)	রাগালো
রাগিয়েছিল (রাগাইয়াছিল)	রাগিয়েছিলো

র

লিখুন	লিখবেন না
রাগিয়ো (রাগাইয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	রাগিও
রেগে ছিল (রাগত অবস্থায় ছিল)	রেগে ছিলো, রেগেছিল, রেগেছিলো
রেগেছিল (রাগিয়াছিল)	রেগেছিলো
রাগো (রাগ করিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে রাগিয়াছিলে । বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	রাগ
রেগো (রাগ করিয়ো । ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	রেগ



ল

লক্ষ । **'লাখ'** অর্থে কিংবা ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহারের সময় (যথা, **'লক্ষ** করা') এই বানান রাখুন । তখন **'লক্ষ্য'** বানান করবেন না ।

লক্ষণ । অর্থ : 'চিহ্ন' । এই অর্থে **'লক্ষ্মণ'** লিখবেন না ।

লক্ষণীয় । **'লক্ষ্যণীয়'** লিখবেন না ।

লক্ষ্মণ । রামানুজ । এ-ক্ষেত্রে ম-ফলা চাই, **'লক্ষণ'** চলবে না ।

লক্ষ্য । অর্থ : 'লক্ষণীয়', 'goal', 'target' । এই অর্থে য-ফলা চাই ।

লখনউ । অনেকে **'লক্ষ্মৌ'** লেখেন । কিন্তু আমরা 'লখনউ' লেখার পক্ষপাতী ।

লাইনস্পেসিং । দুটি শব্দের মধ্যে যেমন ফাঁক থাকে, তেমন ফাঁক থাকে দুটি লাইনের মধ্যেও । একে বলে লাইনস্পেসিং বা লেডিং । এই যে ফাঁক বা স্পেস, এটা না থাকলে লাইন দুটির হরফ গায়ে-গায়ে লেগে যায় । এই ফাঁকটুকুরও হিসাব হয় পয়েন্ট দিয়ে । সর্বনিম্ন লাইনস্পেসিং হতে পারে $\frac{১}{২}$ পয়েন্টের । ধরা যাক, কোনও লেখা আমরা ১০ পয়েন্ট হরফে কম্পোজ করাতে চাই ; সেইসঙ্গে চাই যে, তাতে লাইনে-লাইনে $\frac{১}{২}$ পয়েন্টের ফাঁক থাকবে । সে-ক্ষেত্রে প্রেসে পাঠাবার সময় কপির উপরে আমাদের লিখে দিতে হবে ১০/১০$\frac{১}{২}$ (অর্থাৎ ১০ পয়েন্ট টাইপ অন ১০$\frac{১}{২}$ পয়েন্ট বডি) । যদি লাইনে-লাইনে ফাঁক রাখতে চাই ১ পয়েন্টের, তা হলে লিখব ১০/১১ (অর্থাৎ ১০ পয়েন্ট টাইপ অন ১১ পয়েন্ট বডি) । এই যে লেখা আপনি পড়ছেন, এটা ১২ পয়েন্ট টাইপে কম্পোজ করা হয়েছে, লাইনে-লাইনে ফাঁক রাখা হয়েছে $\frac{১}{২}$ পয়েন্টের । এর জন্য কপির উপরে আমাদের লিখতে হয়েছিল ১২/১২$\frac{১}{২}$ ।

লাতিন শব্দ ও শব্দবন্ধ । ইংরেজিতে লেখা সংবাদ বা অন্যবিধ রচনার মধ্যে অনেক সময় কিছু-কিছু লাতিন শব্দ বা শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । তর্জমা-কর্মের সুবিধার জন্য সেই রকম কিছু শব্দবন্ধের বাংলা এখানে দেওয়া হল :

আলট্রা ভাইরিস *(ultra vires)* । বিধিবহির্ভূত ।

অ্যাড লিব., অ্যাড লিবিটাম *(ad lib., ad libitum)* । ইচ্ছানুরূপ, যথেষ্ট, যদৃচ্ছ ।

ইন অ্যাবসেনশিয়া *(in absentia)* । অনুপস্থিতিতে । (কোথাও) উপস্থিত না থাকার কালে ।

ইন ক্যামেরা *(in camera)* । অপ্রকাশ্য স্থানে । যথা, সর্বসাধারণের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই এমন কোনও স্থানে মামলার শুনানি হলে বা সাক্ষ্যগ্রহণের ব্যবস্থা হলে সেটা 'ইন ক্যামেরা' শুনানি বা সাক্ষ্য ।

ল

এক্স অফিশিয়ো (ex officio)। 'এক্স অফিশিয়ো মেম্বার' বলতে (কোনও কমিটি, কমিশন, কাউন্সিল ইত্যাদির) এমন সদস্যকে বোঝায়, যিনি বিশেষ কোনও পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলেই সদস্য হিসাবে গণ্য হন। তিনি পদাধিকারবলে সদস্য।

এক্স পার্টি (ex parte)। একতরফা। এক পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা এক পক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত (রায়)। অথবা, যিনি কোনও পক্ষভুক্ত নন, তাঁর দিক থেকে দাখিল করা হয়েছে, এমন (আবেদন)।

ডি জুরি (de jure)। আইনত, আইনানুমোদিত, ন্যায়ত।

ডি ফ্যাকটো (de facto)। বস্তুত, বাস্তবিক পক্ষে, কার্যত, প্রকৃতপক্ষে। 'ডি ফ্যাকটো রুলার' বলতে তাঁকেই বোঝায়, শাসনক্ষমতা বস্তুত যাঁর করায়ত্ত, তাতে আইনের অনুমোদন থাক আর না-ই থাক।

পোস্ট মর্টেম (post mortem)। ময়না তদন্ত। কোনও ঘটনার পরবর্তিকালীন (বিচার-বিশ্লেষণ)।

প্রাইমা ফেসি (prima facie)। প্রথম দর্শনে উদ্ভূত বা লব্ধ (ধারণা)। সাধারণ অর্থে : আপাতদৃষ্টিতে।

প্রো টেম., প্রো টেমপোর (pro tem., pro tempore)। অস্থায়ী, সাময়িক। যথা, প্রো টেম. স্পিকার।

সাইনে ডাই (sine die)। অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

সাব জুডিসি (sub judice)। বিচারাধীন।

স্ট্যাটাস কুয়ো (status quo)। স্থিতাবস্থা।

স্ট্যাটাস কুয়ো অ্যান্টি (status quo ante)। পূর্বাবস্থা। সাধারণত, কোনও যুদ্ধ বা সংঘর্ষ যখন আরম্ভ হয়েছিল, ঠিক সেই সময়কার অবস্থা।

লিখুন	লিখবেন না
লগ্নি	লগ্নী
লঘূকরণ	লঘুকরণ
লবণ	লবন
লহরি	লহরী
লাইব্রেরি	লাইব্রেরী
লাবণ্য	লাবন্য
লাশ	লাস
লিগ	লীগ

ল

লিখুন	লিখবেন না

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

লাগছ (লাগিতেছ)	লাগছো
লাগছিল (লাগিতেছিল)	লাগছিলো
লাগত (লাগিত)	লাগতো
লাগব (লাগিব)	লাগবো
লাগল (লাগিল)	লাগলো
লাগাও (লাগাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে লাগাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
লাগাচ্ছ (লাগাইতেছ)	লাগাচ্ছো
লাগাচ্ছিল (লাগাইতেছিল)	লাগাচ্ছিলো
লাগাত (লাগাইত)	লাগাতো
লাগান (লাগাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে লাগাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
লাগানো (লাগাইবার কাজ)	লাগান
লাগাব (লাগাইব)	লাগাবো
লাগাল (লাগাইল)	লাগালো
লাগিয়েছিল (লাগাইয়াছিল)	লাগিয়েছিলো

ল • ব

লিখুন	লিখবেন না
লাগিয়ো (লাগাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	লাগিও
লাগো (লাগিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে লাগিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	লাগ
লেগে ছিল (সংলগ্ন অবস্থায় ছিল)	লেগেছিল
লেগেছিল (লাগিয়াছিল)	লেগেছিলো
লেগো (লাগিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	লেগ

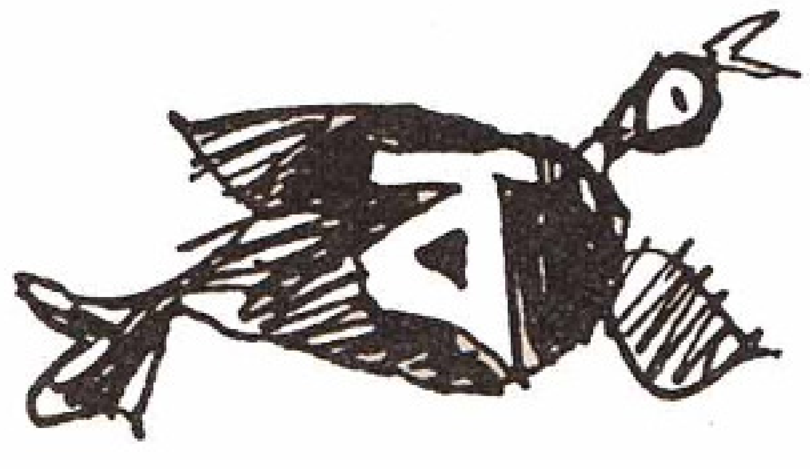
•

অন্তঃস্থ ব। বাংলা বর্ণমালা থেকে এই প্রয়োজনীয় বর্ণটি বাদ পড়ে যাওয়ায় অ-বঙ্গীয় নানা ভারতীয় নামের লিপ্যন্তরকরণে সমস্যা ঘটে। এই সব নামের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে যে নিয়ম মেনে চলব, তা এই :

(১) শব্দের সূচনায় অন্তঃস্থ ব থাকলে আমরা বর্গীয় ব-ই লিখব। যথা : বিজয়, বিদ্যা, বিবেকানন্দ।

(২) অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব-এর ক্ষেত্রেও বর্গীয় ব-ই ব্যবহার করব, যদিও পল্বল বিল্ব ইত্যাদি শব্দে বর্গীয় ব-এর ধ্বনি আসে না। কিন্তু

(৩) শব্দের মধ্যে অন্তঃস্থ ব থাকলে লিখব ও। যথা : গাওস্কর, চাওলা। ('নাম' দেখুন।)



শ

শকুনি। দুর্যোধনের মামা। সাধারণ অর্থ : 'খল ব্যক্তি'। **'শকুনী'** লিখবেন না।

শখ। **'সখ'** লিখবেন না।

শজারু। **'সজারু'** লিখবেন না।

শটি। **'শটী'** লিখবেন না।

শণ। ক্ষুদ্র এক রকমের গাছ ; এর আঁশ থেকে রজ্জু তৈরি হয়। **'শন'** লিখবেন না।

শতচ্ছিন্ন। ছিন্ন ; কিন্তু 'শতছিন্ন' নয়, 'শতচ্ছিন্ন'।

শতরঞ্চি। 'শতরঞ্চী' লিখবেন না।

শনশন। ধ্বন্যাত্মক বা ধ্বনির অনুকারী (onomatopoetic) শব্দ। যথা, **'শনশন'** করে বাতাস বইছে'। **'শণশণ'** বা **'সনসন'** লিখবেন না।

শনাক্ত। কাগজে এই শব্দটির বানান প্রায়ই দেখা যায় **'সনাক্ত'**। 'দন্ত্য স' ব্যবহার করবেন না।

শব্দনির্বাচন। কঠিন-কঠিন শব্দ প্রয়োগ করলে ভাষা কঠিন হয়। কতটা কঠিন, দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা বোঝানো যায়, কিন্তু তার আগে সাধারণভাবে দু-একটা কথা বলা দরকার। আমাদের মনে রাখা দরকার, "ভাষা আর কিছুই নয়, মাধ্যম মাত্র। বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। বক্তব্য যখন কঠিন ভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, কিছু মানুষ তখনও তা ঠিকই বুঝতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই তা বোধগম্য হয় না।" ('ভাষা' দেখুন।)

যেমন অন্যান্য ভাষা, তেমন বাংলা ভাষা সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। যে-বক্তব্য কঠিন বাংলায় পরিবেশিত হবে, কিছু বঙ্গভাষী তা বুঝবেন অবশ্যই, কিন্তু অধিকাংশ বঙ্গভাষীই তা বুঝবেন না।

আর-একটা কথাও মনে রাখতে বলি। "কঠিন স্তরের বাংলা কে কতটা বুঝবেন, তা নির্ভর করে সেই স্তরের বঙ্গভাষার সঙ্গে কার পরিচয় কতটা ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক, তার উপরে।" ('ভাষা' দেখুন।) এখন বলি, যে-ভাষায় আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করি, অধিকাংশ মানুষের কাছে তা কঠিন ঠেকবে, অথবা সরল, প্রধানত তা শব্দ ও বাক্যের উপরে নির্ভরশীল। ('বাক্যগঠন' দেখুন।) অর্থাৎ, কী রকম শব্দ আমরা নির্বাচন করব ও কীভাবে গঠন করব আমাদের বাক্য, প্রধানত তারই উপরে সেটা নির্ভর করছে।

এখানে প্রধানত শব্দের উপরেই আমরা চোখ রাখছি। শব্দ নির্বাচনে ভুল হলে এই একটা বিপত্তি ঘটা সম্ভব যে, আমাদের বক্তব্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, জায়গামতো গিয়ে পৌঁছবে না।

গল্পের পাদরিসাহেবের কথা স্মরণ করুন। ভদ্রলোক খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখলেন, ঘাটে নৌকো নেই, মাঝি মাঝদরিয়ায়। অথচ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি নামবে, তাড়াতাড়ি নদী পার হওয়া দরকার। মাঝির উদ্দেশে তাই তিনি চেঁচিয়ে বলেছিলেন, "ওহে কাণ্ডারী, সত্বর তরণী তীরে আনয়ন করো।" এও তো বাংলা-ই, কিন্তু কথাটা যাঁর উদ্দেশে বলা, বঙ্গভাষী হওয়া সত্ত্বেও সেই মাঝিটি বুঝলেন না যে, বক্তা এখানে তাঁকে ঠিক কী বলতে চাইছেন। কথাটা যে তাঁকেই বলা হচ্ছে, তাও হয়তো তিনি বোঝেননি।

না বুঝবার কারণ এই নয় যে, তিনি বাংলা জানেন না। তা তিনি জানেন ঠিকই, কিন্তু পাদরিসাহেবটি যে-স্তরের বাংলায় তাঁকে নৌকোটা নিয়ে আসবার কথা বলেছিলেন, সেই স্তরের বাংলায় তিনি সড়গড় নন। 'কাণ্ডারী', 'সত্বর', 'তরণী', 'তীরে', 'আনয়ন' ইত্যাদি সব কঠিন শব্দের সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় ইতিপূর্বে ঘটেনি ; এগুলির মানে তাঁর জানা নেই। তা হলে কি পাদরিসাহেবের কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলা যাবে না ? যাবে। শুধু ওই কঠিন শব্দগুলির বদলে ব্যবহার করতে হবে সমার্থক সহজ আটপৌরে শব্দ। বলতে হবে, "ওহে মাঝি, নৌকোটা তাড়াতাড়ি পাড়ে আনো।" সত্যি বলতে কী, 'পাড়ে আনো' না-বলে 'ঘাটে এনে ভেড়াও' বললে আরও ভাল হয়।

শুধু কঠিন-কঠিন তৎসম শব্দই যে ভাষাকে কঠিন করে তোলে, তা নয়। যা নিতান্তই আঞ্চলিক শব্দ, তার প্রতি লেখকের অত্যধিক আসক্তির কারণেও ভাষা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক কী বলতে চান, একমাত্র সেই বিশেষ অঞ্চলের পাঠকরা তা বোঝেন হয়তো, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই তার মর্মোদ্ধার করতে পারেন না, যেহেতু ওই আঞ্চলিক শব্দগুলির অর্থ তাঁদের জানা নেই। (দৃষ্টান্ত : 'মাদুরডা লাজো' বলতে যে মাদুরটাকে বিছোবার কথা বলা হচ্ছে, অথবা 'ডিংলে' বলতে কুমড়োর কথা, যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোনও-কোনও অঞ্চলের মানুষ ছাড়া তা অন্য কারও বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়।)

খবরের কাগজের তাবৎ লেখা থেকে আঞ্চলিক শব্দকে যে সর্বৈব বর্জন করা যাবে, এমন অবশ্য মনে হয় না। সর্বৈব বর্জন সংগতও হবে না হয়তো। কথাটা এইজন্য বলছি যে, প্রতিবেদনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার প্রয়োজনেই অনেক সময় তার মধ্যে কিছু-কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করবার দরকার হয়। যেমন, ধরা যাক, যে-প্রতিবেদন বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার খরা সম্পর্কে, তাতে সেখানকার চাষি কিংবা গ্রামীণ গৃহস্থদের সঙ্গে প্রতিবেদকের কথাবার্তার বিবরণ তো মাঝে-মাঝে থাকতেই পারে।

সেইসব স্থানীয় মানুষের মুখে কিছু-কিছু আঞ্চলিক শব্দ বসালে তাতে প্রতিবেদনের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং গোটা রচনাটি তারই ফলে খানিকটা বাড়তি জোর পেয়ে যায়, এবং আরও জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারটাকে একটা মাত্রার মধ্যে রাখা চাই। মাত্রা ছাড়ালে ব্যাপারটা বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

কিছু শব্দ আছে, ঠাট্টা করে যাকে 'কাব্যিক শব্দ' বলা হয়। যথা 'সাথে', 'পানে', 'পরান' ইত্যাদি। এ-সব শব্দ কবিতাতেও আজকাল আর ব্যবহৃত হয় না, গদ্যে তো একেবারেই পরিত্যাজ্য।

অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে কাগজে কিছু-না-কিছু লেখা ছাপা হয়। তারও উদ্দেশ্য কিন্তু বৃহত্তর পাঠকসাধারণের কাছে পৌঁছনো, এবং জটিল বিষয়কেও কিছুটা অন্তত সহজ করে তাঁদের সব বুঝিয়ে বলা। সুতরাং সে-সব লেখায় খটোমটো পরিভাষা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভাল। যাকে জার্গন বলে, তা বর্জন করুন। মনে রাখুন, কোনও কিছু বুঝিয়ে বলবার দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, পাণ্ডিত্যের আস্ফালন তাঁকে মানায় না।

যে-সব শব্দ তাদের মূল অর্থের আশ্রয় ছেড়ে দ্বিতীয় কোনও অর্থের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেই সব শব্দকে তাদের মূল অর্থে প্রয়োগ করতে গেলেও অনেক সময় ভাষার কঠিনতা বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্ত : 'সচরাচর'। শব্দটি সংস্কৃত। অর্থ 'চর- ও অচর-সহ' বা 'জঙ্গম- ও স্থাবর-সহ'। বাংলায় কিন্তু 'সচরাচর' বলতে আমরা 'সাধারণত' বা 'প্রায়শ' বুঝি। বস্তুত, এই অর্থেই শব্দটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় চলছে। একে আর এখন ভুল-অর্থ বলা যাবে না, এটাই এখন প্রচলসিদ্ধ বা ব্যবহারসিদ্ধ। এই যে ব্যবহারসিদ্ধতা, বহুজনপাঠ্য বাংলা রচনায় একে অমান্য করা বিপজ্জনক ; বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রে এই ব্যবহারসিদ্ধ প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে যদি এখন আবার কেউ মূল অর্থে 'সচরাচর' শব্দটি প্রয়োগ করেন, ভাষার কঠিনতা তাতে বাড়বে মাত্র। অন্তত, বৃহত্তর পাঠকসমাজ যে তাতে বিভ্রান্ত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

কালক্রমে অর্থান্তর ঘটেছে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনেক বিদেশি শব্দেরও। দৃষ্টান্ত : 'খুন' ও 'খুব'। দুটিই ফারসি শব্দ। প্রথমটির অর্থ 'রক্ত', দ্বিতীয়টির অর্থ 'সুন্দর'। বাংলায় কিন্তু অনেক কাল ধরেই প্রথম শব্দটি 'হত্যা'-অর্থে ও দ্বিতীয় শব্দটি 'অত্যন্ত'-অর্থে চলছে। আমরা যখন বাংলা-ই লিখছি, তখন এই ধরনের নানা বিদেশি শব্দকেও সেই অর্থে প্রয়োগ করাই সংগত হবে, যা বাংলায় প্রচলিত।

বঙ্গভাষা একটি জীবন্ত ভাষা বলেই '...অন্য নানা ভাষা থেকে নূতন-নূতন

শব্দ গ্রহণ ও আত্মস্থ করে সে বাড়িয়ে নিয়েছে তার শব্দভাণ্ডার... ।' কথাটা মিথ্যা নয়, অগৌরবেরও নয়। বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও কারণে দুই ভাষার দুই মানবগোষ্ঠী যখন পরস্পরের কাছে আসে, একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হয়, তখন আর-পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও চলতে থাকে লেনদেনের খেলা। এটাই স্বাভাবিক। বাঙালি জনসমাজের সঙ্গে নানা বিদেশি ভাষার মানুষের মেলামেশা তো নেহাত কম হয়নি। ফলে, যেমন আমাদের পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য আর সংবাদপত্রের ভাষা, তেমন আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষাতেও ছড়িয়ে রয়েছে এমন অজস্র বিদেশি শব্দ, যা একদা আহৃত হয়েছিল আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি, ওলন্দাজ, পোর্তুগিজ ও অন্যান্য বিদেশি ভাষা থেকে।

কিন্তু কোন বিদেশি শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকবার ও স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে থেকে যাবার ছাড়পত্র পাবে, আর কোন বিদেশি শব্দ তা পাবে না, ফলে আচমকা ঢুকে পড়লেও সেখান থেকে ফের বেরিয়ে যেতে বাধ্য হবে, আগে থাকতে সেটা বুঝবার জো নেই। নানা সময়ে নানা বিদেশি শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকেছে, তারপর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে থেকেও গিয়েছে। অন্য দিকে, এমন বিদেশি শব্দের সংখ্যাও কম হবে না, নানা সময়ে যেগুলি আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছিল বটে, কিন্তু খুব বেশি দিন সেখানে থাকতে পারেনি। (দৃষ্টান্ত : 'তোক'। আমাদের মঙ্গলকাব্যে 'শিকল' বা 'হাতকড়ি' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মূলত আরবি এই শব্দটিকে এখন আর এই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না।)

কোন বিদেশি শব্দ থাকবে আর কোন বিদেশি শব্দ থাকবে না, আসলে সেটা স্থির হয় এমন এক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যার উপরে কোনও পণ্ডিত, বৈয়াকরণ, সাহিত্যস্রষ্টা কি সাংবাদিকের হাত নেই। বড় মাপের একটা সময়-সীমার ভিতর দিয়ে জনরুচিই সেটা ঠিক করে দেয়।

যে-সব বিদেশি শব্দকে জনরুচি গ্রহণ করেছে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় আকছার সে-সব বিদেশি শব্দ আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। কালক্রমে সেগুলি আমাদের শব্দ-ভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সংবাদপত্রের ভাষায় বিনা দ্বিধায় সেগুলি ব্যবহার করুন। আপনার ভাষার শক্তি তাতে বাড়বে বই কমবে না।

পরিচিত এই সব বিদেশি শব্দের বৃত্তের বাইরেও অবশ্য সাংবাদিককে মাঝে-মাঝে পা বাড়াতে হয়। তিনি ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হন এমন কোনও কোনও বিদেশি শব্দ, যা এখনও বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হওয়া তো দূরের কথা, সেখানে ঢুকতেই পারেনি। বিনা দ্বিধায় বা নির্বিচারে

সেগুলি ব্যবহার করবেন না। বরং একটু সতর্ক হোন ; ভাবুন, আপনার রচনার যা বক্তব্য, তাকে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করবার জন্য আদৌ সে-সব শব্দ ব্যবহারের দরকার আছে কি না। যদি মনে হয়, আছে, একমাত্র তা হলেই আপনার রচনায় সেগুলি ব্যবহার করুন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তার অর্থ উদ্ধারের ভার পাঠকের উপরে ছেড়ে দেবেন না। অমন কোনও শব্দ যখন আপনার লেখায় প্রথমবার ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন শব্দটির পাশে ব্র্যাকেটে তার অর্থ লিখে দিন। পাঠক আপনার শত্রু নন ; তাঁকে বোকা বানাবার কোনও অধিকারই যে আপনার নেই, এই সহজ কথাটা ভুলে যাবেন না।

মনে রাখুন

(১) কঠিন শব্দের বদলে সমার্থক সহজ শব্দ ব্যবহার করলে বোঝা যাবে যে, বৃহত্তর পাঠকসমাজের কথা আপনি ভুলে যাননি। সে-ক্ষেত্রে 'শার্দূল' তো নয়ই, এমন কী 'ব্যাঘ্র'ও নয়, সরাসরি 'বাঘ'ই আপনি লিখবেন। বস্তুত, শার্দূল কি ব্যাঘ্রের গর্জনের তুলনায় বাঘের হালুমও কিছু কম ভয়ঙ্কর নয়।

(২) আঞ্চলিক শব্দ সর্বৈব বর্জন করা যাবে না ; কিন্তু তাকে একটা মাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।

(৩) খটোমটো পরিভাষা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই ভাল। জার্গন পরিত্যাজ্য।

(৪) শব্দকে তার প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করাই নিরাপদ।

(৫) যে-সব বিদেশি শব্দ এখনও বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়নি, পারতপক্ষে সেগুলি ব্যবহার করবেন না। একান্তই যদি করতে হয়, তা হলে প্রথমবার ব্যবহারের সময় পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে তার অর্থ লিখে দিতে হবে।

শম্ভু। 'সম্ভূত' ও 'স্বয়ম্ভূ' শব্দের বানানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে '**শম্ভূ**' লিখবেন না। এ-ক্ষেত্রে '**ঊ-কার**' নয়, 'উ-কার' চাই।

শরবত। '**শরবৎ**' লিখবেন না।

শরিক। '**শরীক**' লিখবেন না।

শরিয়ত। মুসলিম ধর্মশাস্ত্র। বিশেষণ : 'শরিয়তি'। যথা, 'শরিয়তি বিধান'। '**শরিয়ৎ**' বা '**শরিয়তী**' লিখবেন না।

শহর, শহরতলি। '**সহর**', '**শহরতলী**', '**সহরতলি**' বা '**সহরতলী**' লিখবেন না।

শাড়ি। '**শাড়ী**' লিখবেন না। যেমন 'গাড়ি', 'বাড়ি', তেমনই 'শাড়ি'।

শারীরিক। অর্থ : 'শরীর-সম্পর্কিত'। প্রথমে ঈ-কার, পরে ই-কার, এটা মনে রাখুন।

শাল্মলি। অর্থ : 'শিমুলগাছ'। '**শাল্মলী**' অশুদ্ধ নয়, কিন্তু ই-কারযুক্ত বানানও সমান শুদ্ধ। সুতরাং ঈ-কার লাগাবেন না।

শ

শিমুল। 'শিমূল' লিখবেন না।

শিরোনাম বা হেডলাইন। খবরের শিরোনাম যেমন ভাল হয়, তেমন মন্দও হয়। কিন্তু সে তো পরের কথা ; আগে যা বিবেচ্য, তা হল হেডলাইনটা ঠিক হয়েছে, না ভুল হয়েছে।

সেই হেডলাইনকেই ভুল বলা হয়, খবরের সবচেয়ে জরুরি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে যা তুলে ধরে না। যে হেডলাইন তা তুলে ধরে, তাকেই বলি নির্ভুল।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। গ্রামাঞ্চলে, নিতান্তই পারিবারিক বিবাদের ফলে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন, এবং খুনের ব্যাপারটা নিয়ে দারোগাবাবু গিয়েছেন তদন্ত করতে। মফস্বল থেকে আসা এই যে খবর, এতে খুনটাই হেডলাইনে আসবে ; তবে সেটা বড় হরফের হেডলাইন নিশ্চয়ই হবে না। আবার খুনটা যদি হয়ে থাকে রাজনৈতিক বিবাদের পরিণামে, আর তার উপরে আবার তদন্তে গিয়ে দারোগাবাবুটি যদি বিরাট এক জনতার দ্বারা ঘেরাও হয়ে যান, তা হলে খুনের বদলে সেই ঘটনাই চলে আসবে হেডলাইনে। হেডলাইনের হরফও তখন হবে বড়। এমনিতে যে-খবর ভিতরের পাতায় যেত, তার তখন প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা পেয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

ছোটখাটো ঘটনার খবর নিয়ে কোনও ঝামেলা হয় না। তার হেডলাইন নিয়েও না। ঝামেলা হয় বড় মাপের খবর ও তার হেডলাইন নিয়ে। প্রায়ই দেখা যায়, সে-সব খবর নানা শাখাপ্রশাখায়, নানা অংশে ছড়ানো। তার মধ্যে কোন অংশটার গুরুত্ব কতখানি, সেটা বোঝা দরকার। কেননা যে-অংশটা সবচেয়ে জরুরি, তারই উপরে করতে হবে হেডলাইন। এ হল ডালপালা সরিয়ে একটা গাছের মূল কাণ্ডটিকে খুঁজে নেওয়া। খবরেরও তেমনই থাকে একটি মূল কাণ্ড। ইংরেজিতে যাকে 'নিউজ সেন্স' বলে, সেটা যাঁর পাকা, ওই মূল কাণ্ডটিকে তিনি খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারেন। ফলে তাঁর হেডলাইনও হয় নির্ভুল।

তাতেই অবশ্য কাজ ফুরোচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, যার উপরে হেডলাইন করা হল, খবরের বয়ানে সেই অংশটাকে একেবারে প্রথম দিকেই নিয়ে আসা চাই। অনেক পাঠকই খবরের পুরো বয়ান পড়েন না ; যে অংশের উপরে হেডলাইন, খবরের প্রথম দিকেই তা যদি না থাকে, তা হলে তাঁরা বিভ্রান্ত হন। সবচেয়ে বিভ্রান্ত হন তখন, সেই অংশটি যখন খবরের শেষাংশে থাকে, আর সেই শেষাংশ যখন অন্য পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।

আর এক দিক থেকেও এটা বিপজ্জনক। জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে অনেক খবরেরই পুরোটা অনেক সময় ছাপা যায় না, তখন খবরের

বয়ানের ওই শেষাংশই সাধারণত ছাঁটাই হয়। যে-অংশের উপরে হেডলাইন করা হয়েছে, খবর থেকে সেটাই ছাঁটাই হয়ে গেল, এমন ঘটনাও মাঝেমধ্যে ঘটে বই কী!

হেডলাইন সম্পর্কে আর দুটি কথা। প্রথমত, উদ্ধৃতি দিয়ে মাঝেমধ্যে হেডলাইন করবার দরকার হয় ঠিকই, কিন্তু এই ধরনের হেডলাইন যত কম করা যায়, ততই ভাল। দ্বিতীয়ত, যেমন সংবাদপত্রের ভাষায় ফেনিল উচ্ছ্বাস অথবা কাব্যিকতা চলে না, হেডলাইনকেও তেমন ও-দুটির ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

মনে রাখুন

(১) খবরের যেটা সবচেয়ে জরুরি অংশ, তারই উপরে করা উচিত হেডলাইন।

(২) উদ্ধৃতি দিয়ে হেডলাইন যত কম করা যায়, ততই ভাল।

লিখুন	লিখবেন না
শিহরন	শিহরণ
শুরু	সুরু
শুরুয়া	সুরুয়া
শূন্য	শূণ্য
শোণিত	শোনিত
শোরগোল	সোরগোল
শৌখিন	শৌখীন, সৌখিন, সৌখীন
শ্রীমতী	শ্রীমতি
ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত	
শুনছ (শুনিতেছ)	শুনছো
শুনছিল (শুনিতেছিল)	শুনছিলো
শুনত (শুনিত)	শুনতো
শুনব (শুনিব)	শুনবো

শ

লিখুন	লিখবেন না
শুনল (শুনিল)	শুনলো
শুনিয়েছিল (শুনাইয়াছিল)	শুনিয়েছিলো
শুনিয়ো (শুনাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	শুনিও
শুনেছিল (শুনিয়াছিল)	শুনেছিলো
শুনো (শুনিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	শুন
শোনাও (শুনাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে শুনাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
শোনাচ্ছ (শুনাইতেছ)	শোনাচ্ছো
শোনাচ্ছিল (শুনাইতেছিল)	শোনাচ্ছিলো
শোনাত (শুনাইত)	শোনাতো
শোনান (শুনাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে শুনাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
শোনানো (শুনাইবার কাজ)	শোনান
শোনাব (শুনাইব)	শোনাবো
শোনাল (শুনাইল)	শোনালো
শোনো (শুনিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে শুনিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	শোন

ষ

ষড়ানন । অর্থ : 'কার্তিক' ।

ষড়যন্ত্র । অর্থ : 'চক্রান্ত' । শুদ্ধ বানান **'ষড়্‌যন্ত্র'** । তবে **'ষড়যন্ত্র'** বানান চলিত, সুতরাং গ্রাহ্য ।

ষণ্ডামর্ক । শুক্রাচার্যের দুই ছেলে ষণ্ড ও অমর্ক । ভুল করে অনেকে লেখেন **'ষণ্ডামার্ক'** । **'ষণ্ডামার্কা'** বলতে অবশ্য 'বলিষ্ঠ' বোঝায় ।

ষণ্ণবতি । অর্থ : 'ছিয়ানব্বই' । **'ষণ্ণবতী'** বা **'ষন্নবতি'** লিখবেন না ।

ষণ্মাস । অর্থ : 'ছয় মাস' । **'ষন্মাস'** লিখবেন না ।

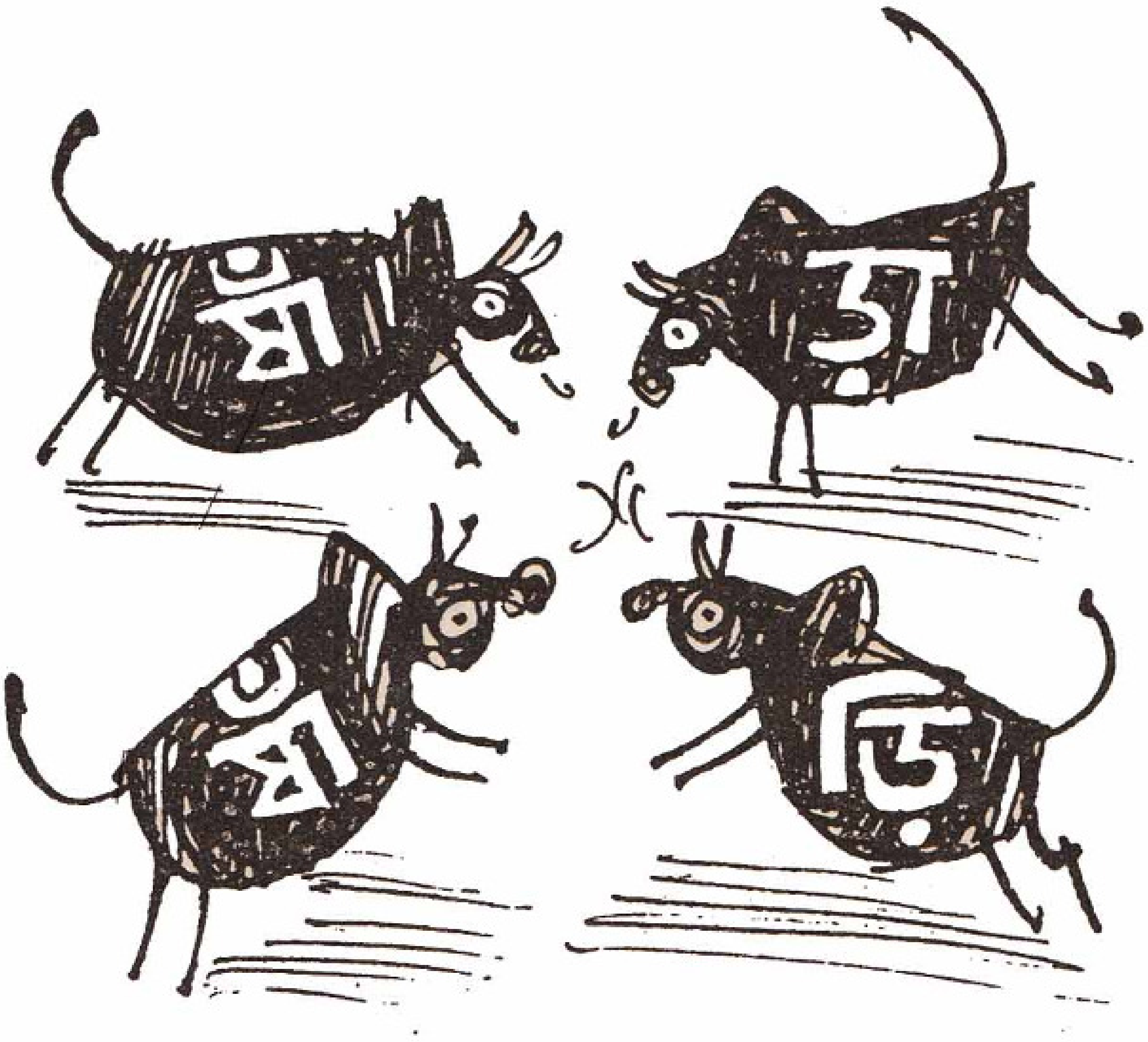
ষষ্টি । অর্থ : 'ষাট' । **'ষষ্ঠি'** বা **'ষষ্ঠী'** লিখবেন না ।

ষষ্ঠী । অর্থ : 'ষষ্ঠ-স্থানীয়া', বা এই নামের দেবী । **'ষষ্ঠি'** লিখবেন না ।

ষাঁড়াষাঁড়ি । অর্থ : 'ষাঁড়ের লড়াই' । এর থেকেই প্রবল জোয়ারকে বলা হয় **'ষাঁড়াষাঁড়ির বান'** ।

ষাণ্মাসিক । অর্থ : 'ছয় মাসকালীন' বা 'ছয় মাস অন্তর অন্তর' । যথা, 'ষাণ্মাসিক খরচা' বা 'ষাণ্মাসিক পরীক্ষা' । **'ষান্মাসিক'** লিখবেন না ।

ষোলো । **'ষোল'** লিখবেন না ।



স

সওদাগরি। অর্থ : (১) 'সওদাগর-বৃত্তি' বা 'ব্যবসায়-বাণিজ্য' ; (২) 'বণিক/বাণিজ্য সংক্রান্ত'। merchant office = সওদাগরি অফিস। **'সওদাগরী'** বা **'সওদাগিরি'** লিখবেন না।

সংকর। অর্থ : 'বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ বা বস্তুর সংমিশ্রণে জাত বা উৎপন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ বা বস্তু'। **'শংকর'** বা **'শঙ্কর'** লিখবেন না।

সংক্ষোভ। অর্থ : 'বিক্ষোভ, আলোড়ন'।

সংখ্যার সমস্যা। সাধারণ সংবাদে, প্রতিবেদনে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে ও অন্যান্য আলোচনায় বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করা হয়। এই সংখ্যাগুলি নানা কাগজে নানা ভাবে লেখা হয়। আমরা কীভাবে লিখব, তা নিম্নে জানানো হল :

(১) এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কে লিখুন (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯)।

(২) দশ থেকে শুরু করে তদূর্ধ্ব যাবতীয় সংখ্যা শব্দে লিখুন (যথা : দশ, আশি, নব্বই, তিন শো বারো, এক হাজার পাঁচ শো বিরাশি ইত্যাদি)।

যেমন ছোট তেমন বড়-বড় সংখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে (যথা, সারণিতে ও অন্যত্র) অঙ্কে লিখবার দরকার হয়। তখন ইংরেজি মতে যেখানে কমা বসানো হয়, বাংলা মতে যে সেখানে বসানো যায় না, এটা মনে রাখুন। ইংরেজি মতে পাঁচ লক্ষ আট হাজার তিন শো চৌত্রিশকে অঙ্কে লেখা হয় ৫০৮,৩৩৪। আর বাংলা মতে এই একই সংখ্যা অঙ্কে লিখতে হলে আমরা লিখি ৫,০৮৩৩৪।

লক্ষ করুন, ইংরেজি মতে বাঁ দিক থেকে তৃতীয় রাশির পরে কমা বসেছে। বাংলা মতে সেখানে কমা বসেছে বাঁ দিক থেকে প্রথম রাশির পরে।

মিলিয়ন বলতে দশ লাখ বোঝায়। নিযুতও দশ লাখ। তবে নানা নিবন্ধে নিযুত শব্দটা ব্যবহার করলেও সংবাদে দশ লাখই লিখুন। যত মিলিয়ন তত দশ লাখ, এটা মনে রাখলে হিসাবের সুবিধা হবে, তর্জমা করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে না।

ঝামেলা আছে 'বিলিয়ন' ও 'ট্রিলিয়ন'কে নিয়েও। তার একটা কারণ এই যে, 'বিলিয়ন' ও 'ট্রিলিয়ন' বলতে কত বড় সংখ্যা বোঝায়, তা নিয়ে নানা দেশের নানা মত। তবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে-হিসাব স্বীকৃত ও গ্রাহ্য, তা এই :

১ বিলিয়ন = ১ হাজার মিলিয়ন = ১ শত কোটি
১ ট্রিলিয়ন = ১ হাজার বিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি

এই হিসাবই আমরা মান্য করব।

স

সংশোধন, প্রুফ। প্রুফ কীভাবে সংশোধন করতে হয়, তা বলবার আগে আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভাল। গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে নূতন-শিক্ষার্থীদের ধারণা তাতে স্পষ্ট হতে পারে।

পশ্চাৎপট

হাতে-লেখা কিংবা টাইপ-করা যে-সব রচনা প্রেসে পাঠানো হয়, ছাপাখানার জগতে তার চলতি নাম *কপি*। প্রেসে সেই কপি দেখে হরফ সাজানো হয়। কত পয়েন্টের হরফ ব্যবহার করতে হবে ও লাইনগুলির মেজার বা প্রস্থ হবে কত, কপিতেই তার নির্দেশ থাকে। হাত দিয়ে এই হরফ সাজানোর কাজটা যাঁরা করেন, তাঁদের বলা হয় *কম্পোজিটর*; অন্য দিকে, যাঁরা লাইনোটাইপ, মনোটাইপ বা ফোটো-টাইপসেটিং যন্ত্রের সাহায্যে এ-কাজ করেন, তাঁদের বলা হয় *অপারেটর*।

পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, কাজটা আসলে *কম্পোজ* করার। কপি অনুযায়ী যা সজ্জিত বা বিন্যস্ত হয়েছে, ছাপাখানার কর্মীদের কাছে সেই হরফ-সমষ্টির চলতি নাম *ম্যাটার*। ম্যাটার দু' রকমের হতে পারে। যে-ম্যাটার হাতে-সাজানো, অথবা লাইনোটাইপ ও মনোটাইপ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্যস্ত, তা সিসার ম্যাটার। সে-ক্ষেত্রে ফোটো-টাইপসেটিং যন্ত্রের সাহায্যে বিন্যস্ত যে ম্যাটার, তা ব্রোমাইড-কাগজে ছাপা ফোটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিসার হরফ সাজিয়ে কম্পোজ করার ব্যাপারটাকে আমরা *হট কম্পোজিশন* বলি। অন্য দিকে, ফোটো-টাইপসেটিং যন্ত্রের সাহায্যে যে হরফবিন্যাসের ব্যবস্থা, তাকে বলা হয় *কোল্ড কম্পোজিশন*। সিসা কিংবা অন্য কোনও ধাতুর কোনও ভূমিকাই তাতে নেই।

হট কম্পোজিশন পদ্ধতিতে প্রস্তুত ম্যাটার যেহেতু সিসার ম্যাটার, তাই সরাসরি তার ছাপ তোলা যায়। ম্যাটারে কালি মাখিয়ে, তার উপরে সাদা কাগজ রেখে একটু চাপ দিলেই কাগজে উঠে যাবে ম্যাটারের ছাপ। এই ছাপটাকেই বলে *প্রুফ*। এটি যেহেতু ম্যাটারের অবিকল প্রতিলিপি, তাই এই ধরনের প্রুফ দেখলেই বোঝা যায় যে, ম্যাটারটিকে কত পয়েন্ট হরফে ও কোন মেজারে কম্পোজ করা হয়েছে।

পয়েন্ট শব্দটা ব্যবহার করা হয় হরফের সাইজ বোঝাবার জন্য। পয়েন্ট যত বেশি, হরফের সাইজও তত বড়। খবরের কাগজের হেডলাইন দেখলেই বোঝা যায় যে, তাতে বেশি পয়েন্টের হরফ ব্যবহার করা হয়েছে।

হেডলাইনের তলায় থাকে খবর। তাতে কম পয়েন্টের হরফ ব্যবহার করা হয়।

মেজার বলা হয় লাইনগুলির প্রস্থকে। কোনও কপি যদি ১৪ পয়েন্ট হরফে ২২ পাইকা মেজারে কম্পোজ করতে বলা হয়, তা হলে বুঝতে হবে, ১৪ পয়েন্ট হরফে যা কম্পোজ করতে বলা হচ্ছে, তাতে লাইনের প্রস্থ হতে হবে ২২ পাইকা। এই পাইকাকে অনেকে 'এম'ও বলেন। তবে পাইকা বলাই ঠিক।

ফোটো-টাইপসেটিং যন্ত্রের সাহায্যে যে হরফবিন্যাস বা কম্পোজিশন, তারও প্রুফ পাওয়া যায়। তবে তা ম্যাটারের প্রতিলিপি নয়। বিভিন্ন কপি থেকে বিভিন্ন পয়েন্টের হরফে ও বিভিন্ন মেজারে ম্যাটার প্রস্তুত হতে পারে, কিন্তু কোল্ড কম্পোজিশনের এই প্রুফে সেই বিভিন্নতার কোনও হদিশ মেলে না। তাতে অবশ্য ক্ষতিও হয় না কিছু। কেননা, ম্যাটারটি কত পয়েন্টের হরফে ও কোন মেজারে প্রস্তুত হয়েছে, প্রুফের কাগজে তার উল্লেখ থাকে। কপিতে লেখা নির্দেশের সঙ্গে সেটা মিলিয়ে নিলেই হল।

ছাপাখানা থেকে প্রুফ চলে আসে *প্রুফ-রিডিং* বিভাগে। *প্রুফ-রিডাররা* তা সংশোধন করে দেন। অতঃপর সংশোধিত প্রুফ-শিট ফের ছাপাখানায় চলে আসে। সেখানে প্রুফের সংশোধন অনুযায়ী ম্যাটারের সংশোধন হয়।

এত সব কাণ্ডের পরেও যদি কাগজে কিছু-কিছু ভুলত্রুটি থেকে যায়, তা হলে বুঝতে হবে, কোনও-না-কোনও স্তরে কেউ-না-কেউ যে-ভুল করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা আর সংশোধিত হয়নি।

লক্ষ করুন, একটি লেখা তৈরি হওয়া থেকে পত্রিকায় সেটি ছাপা হওয়া—এই যে কর্মকাণ্ড, এর মধ্যে রয়েছে মোটামুটি চারটি স্তর।

(১) লেখক তাঁর লেখাটি তৈরি করে প্রেসে পাঠালেন।

(২) প্রেস সে-লেখা কম্পোজ করে তার প্রুফ পাঠালেন প্রুফ-রিডারদের কাছে।

(৩) প্রুফ-রিডার সেই প্রুফ সংশোধন করবার পরে সেটি ফের প্রেসে এল।

(৪) প্রুফে যে সংশোধনের নির্দেশ রয়েছে, সেই অনুযায়ী প্রেসে এবারে ম্যাটারটি সংশোধিত হল।

এই যে চারটি স্তর, এর প্রতিটিতেই রয়েছে ভুলত্রুটি ঘটবার আশঙ্কা। (১) গোড়াতেই গলদ থাকতে পারে। অর্থাৎ, যে-লেখা প্রেসে পাঠানো হল, তার মধ্যেই থাকতে পারে ভুল। (২) কম্পোজ করার কাজের সময় ভুলত্রুটি ঘটে যেতে পারে। (৩) প্রুফ-সংশোধনের কাজটা নির্ভুল না হতে

পারে। (৪) প্রুফে যে সংশোধনের নির্দেশ রয়েছে, সেই অনুযায়ী না-ও হতে পারে ম্যাটারের সংশোধন।

ম্যাটার সংশোধনের পরেও যদি আর-একবার প্রুফ দেখানো সম্ভব হত, তা হলে বোঝা যেত, সংশোধনের কাজটা ঠিকমতো হয়েছে কি না। মুশকিল এই যে, গ্রন্থের ক্ষেত্রে (এবং কিছু-কিছু সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রেও) এই দ্বিতীয় বার প্রুফ দেখাবার ব্যবস্থা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে সর্বাংশে এটা সম্ভব হয় না। কারণ আর কিছুই নয়, সময়াভাব। গ্রন্থের ক্ষেত্রে নিতান্ত দুটি কেন, চাইলে হয়তো তিনটি প্রুফও পাওয়া যায় ; উপরন্তু পাওয়া যায় পেজ-প্রুফও। কিন্তু, মনে রাখুন, দৈনিক পত্রিকায় (পূর্বে-বিন্যস্ত দুটি-একটি রচনা কিংবা পৃষ্ঠা ছাড়া) মাত্র একটি প্রুফই লভ্য। সেটি ঠিকমতো সংশোধন করা-না-করার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করছে যে, পরের দিনের কাগজখানি ভুলত্রুটিহীন হবে কি হবে না। 'অনেকাংশে' কথাটা ব্যবহার করা হল এইজন্য যে, ভুলত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব একা প্রুফ-রিডারের নয়, নানা স্তরের। তিনি না হয় প্রুফের তাবৎ ভুল শুধরে দিলেন, কিন্তু তার পরেও থাকছে ম্যাটার সংশোধনের কাজ। সে-কাজ প্রেসের করবার কথা। অথচ প্রেসের কর্মীরা যে—তাঁদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও—সর্বদা সে-কাজ ঠিকমতো করে উঠতে পারেন না, তা-ই বা কে না জানে। তাঁরাও দৌড়চ্ছেন ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ; তাঁদেরও বড় সময়াভাব। প্রিন্টার যখন ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন কাগজ ছাড়বার জন্য, অন্তত কিছু-কিছু ম্যাটার তখন অসংশোধিত অবস্থাতেই তাঁদের ছেড়ে দিতে হয়।

সন্দেহ নেই যে, কপি লেখা, কম্পোজ করা ও সংশোধন করার এই যে প্রক্রিয়াটি ছড়িয়ে রয়েছে একটি প্রতিষ্ঠানের নানা স্তরে, তার প্রতিটি কাজ নির্ভুলভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাধা হলে তবেই একখানি কাগজ নির্ভুল হয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

প্রথম স্তরে রয়েছেন লেখক। গোড়াতেই যদি তিনি গলদ ঘটান, অর্থাৎ তাঁর কপিতেই যদি ভুলত্রুটি থাকে, তা হলে মুশকিল, কেননা শেষ স্তর পর্যন্ত সেই ভুলের জেরই চলতে থাকবে। ভুল নানা রকমের হওয়া সম্ভব। বানানের ভুল, ভাষার ভুল, তথ্যের ভুল। লেখককে সতর্ক থাকতে হবে, কোনও রকমের ভুলই তাঁর কপিতে যেন না থাকে। তাঁর হাতের লেখাও স্পষ্ট হওয়া দরকার। সৌন্দর্যের চেয়ে স্পষ্টতার দাম এ-ক্ষেত্রে অনেক বেশি। হস্তাক্ষর যত অস্পষ্ট হবে, কম্পোজিশনে ভুল হবার আশঙ্কা ততই বেড়ে যাবে। লেখার মধ্যে যদি এমন কোনও শব্দ থাকে যা হয়তো

অনেকজনের অপরিচিত (যথা বিদেশি স্থান-নাম কি ব্যক্তি-নাম), তা হলে সেটা গোট-গোট অক্ষরে লেখা উচিত। প্রেসের তাতে সুবিধা হয়।

দ্বিতীয় স্তরে আছেন কম্পোজিটর/অপারেটর। কপির মধ্যেই যদি ভুল থাকে, তবে তার দায়িত্ব কম্পোজিটর কিংবা অপারেটরের নয়। লেখাটি তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনই কম্পোজ করবেন। কিন্তু তেমনটাই কি সর্বদা হয় ? না, তাও হয় না। তার একটা কারণ অবশ্যই অসতর্কতা। সর্বদা তিনি সতর্ক থাকেন না বলেই মূল কপি ও কম্পোজিশনে অনেক সময় পার্থক্য ঘটে যায়। কোনও-কোনও শব্দ হয়তো একবারের জায়গায় দু' বার কম্পোজ করা হয়, আবার কপির উপরে নজর ঠিকমতো রাখতে পারেননি বলে কোনও শব্দ কি বাক্যাংশ হয়তো আদৌ কম্পোজ করা হয় না। হয়তো ছাড় পড়ে যায় পুরো একটি বাক্য অথবা অনুচ্ছেদ। বানানের হেরফেরও ঘটে বই কী। ফোটো-টাইপসেটিং যন্ত্রে ভুল-চাবি টেপার ফলে ঘটে যুক্তাক্ষরের বিভ্রাট। কপি যিনি কম্পোজ করছেন, সারাক্ষণই তাঁরও অতএব সতর্ক থাকা চাই। তিনি জানেন নিশ্চয় যে, যাঁরা পাকা কম্পোজিটর কিংবা অপারেটর, উপরন্তু সদাসতর্ক, তাঁদের কম্পোজ-করা ম্যাটারে যৎসামান্য ভুল বার হয় ; অনেক ক্ষেত্রে আদৌ বার হয় না।

তৃতীয় স্তরে আছেন প্রুফ-রিডার। অনেকের ধারণা, প্রুফ সংশোধনের কাজটা খুবই সহজ। ভারী তো লেখার সঙ্গে প্রুফটাকে মিলিয়ে নেওয়া, এ আর এমন শক্ত কী ! এমন ধারণা গ্রাহ্য হবার যোগ্য নয়। বিশেষ করে সেই প্রুফ-রিডারদের ক্ষেত্রে তো এমন কথা আদৌ খাটে না, যাঁরা চাইছেন যে, যে-লেখাটির প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন, ছাপা হবার পরে তাতে একটিও ভুল থাকবে না। না বানানের ভুল, না ভাষার ভুল, না তথ্যের ভুল। এটা যাঁদের কাম্য, আশা করা স্বাভাবিক যে, বানানে তাঁরা দক্ষ হবেন, এবং নির্ভুল ভাষা ও বাক্যগঠন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকবে তাঁদের। (সেইসঙ্গে, যে-প্রতিষ্ঠানের তাঁরা কর্মী, বানান সম্পর্কে তার যদি কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে, তবে সেটাও তাঁরা মান্য করে চলবেন।)

এর পরেও অবশ্য একটা কর্তব্য তাঁদের থেকে যায়। এ-কথা ঠিকই যে, কপির মধ্যেই যদি ভুল থাকে, তবে তার দায়িত্ব কিছুতেই প্রুফ-রিডারের উপরে অর্শায় না। তবু বলি, কপির মধ্যে তথ্যের কোনও ভুল যদি তাঁদের চোখে ধরা পড়ে, তবে বিনা দ্বিধায় সে সম্পর্কে তাঁরা লেখকের অথবা (লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তা হলে) বিভাগীয় সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ভুল ধরিয়ে দিলে কোনও লেখকেরই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। তা তাঁরা হনও না। বরং এই ভেবে

খুশি হন যে, যাক, পাঠকের চোখে ধরা পড়বার আগেই ভুলটা সংশোধিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রুফ ফেলে রাখা বিপজ্জনক। প্রেস থেকে প্রুফ আসবার পরে যথাসম্ভব দ্রুত তা সংশোধন করে আবার প্রেসে ফেরত পাঠানো দরকার। মনে রাখুন, প্রুফ সংশোধনে এবং সংশোধিত প্রুফ প্রেসে ফেরত পাঠাতে দেরি হলে ম্যাটার সংশোধনের কাজটাও পিছিয়ে যায়।

চতুর্থ স্তরে আছেন ম্যাটার-সংশোধক। তিনি একজন কম্পোজিটর অথবা অপারেটর। সংশোধিত প্রুফ প্রেসে ফিরে আসার পরে ম্যাটার সংশোধনের কাজ দ্রুত শুরু হবে, এটাই প্রত্যাশিত। প্রুফ-রিডিং বিভাগে যেমন প্রুফ জমে যাওয়া উচিত নয়, প্রেসেও তেমন সংশোধিত প্রুফ জমে যাওয়া অনুচিত। সংশোধিত প্রুফ যখন একটু বেশি মাত্রায় জমে ওঠে, নিতান্ত সময়াভাবের দরুনই তখন ম্যাটার সংশোধনের কাজটা অবহেলিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। অথচ ভুলত্রুটি সংশোধনের এটাই শেষ ধাপ।

সংশোধন, হাতে-কলমে

প্রুফ সংশোধনের কাজটা একা-একা না-করাই ভাল। আসলে এটা দু'জন প্রুফ-রিডারের যৌথ উদ্যোগের কাজ। একজন প্রুফ দেখবেন ও দরকারমতো সংশোধন করবেন, অন্যজন ধরবেন কপি। একজন প্রুফ-রিডার, অন্যজন কপি-হোলডার।

যিনি এ-ক্ষেত্রে কপি-হোলডার, কপিটা তিনি পড়ে যাবেন। তাড়াহুড়ো করে পড়লে চলবে না। ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে তাঁকে পড়তে হবে।

যিনি এ-ক্ষেত্রে প্রুফ-রিডার, তাঁর চোখ থাকবে প্রুফের দিকে, আর কান থাকবে কপি-হোলডার কী পড়ছেন, সেই দিকে। কপি-হোলডার যা পড়ছেন, প্রুফ তার সঙ্গে মিলছে কি না, সেটা দেখাই প্রুফ-রিডারের কাজ। যেখানে যেখানে মিলবে না, সেখানে সেখানে প্রুফ সংশোধিত হবে।

কপি-হোলডার এই যে কপি পড়ছেন, এই পড়ারও আছে একটা নিজস্ব নিয়ম। সেটা কী ? না কপি পড়বার সময় বিরাম-চিহ্ন দেখে-দেখে স্রেফ একটু থামলেই তাঁর চলবে না, প্রতিটি পাংচুয়েশন-মার্কের নামও তাঁকে উচ্চারণ করে যেতে হবে। নীচের সংবাদটি লক্ষ করুন :

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১ জুলাই—জয়পুর ও শিয়ালদহের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চালু হচ্ছে আগামী পরশু থেকে। জয়পুর থেকে সাওয়াই-মাধোপুরের মধ্যে লাইন ব্রডগেজ হয়ে যাওয়ার ফলে এই ট্রেনটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে। জয়পুর ও

শিয়ালদহের মধ্যে ১৬৯৭ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে ট্রেনটি ছত্রিশ ঘণ্টা সময় নেবে। জয়পুর থেকে পরশু রেলমন্ত্রী জাফর শরিফ ট্রেনটি উদ্বোধন করবেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ জুলাই ১৯৯৪)

আমরা আন্দাজ করতে পারি, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রুফ-রিডিং বিভাগে যখন এই কপির প্রুফ সংশোধন করা হচ্ছিল, কপি-হোলডার তখন তাঁর হাতের কপিটি ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে এইভাবে পড়ছিলেন :

স্টার্ট বোল্ড টাইপ স্টাফ রিপোর্টার কমা নয়াদিল্লি কমা অঙ্কে ১ জুলাই বোল্ড টাইপ এন্ডস ড্যাশ জয়পুর ও শিয়ালদহের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চালু হচ্ছে আগামী পরশু থেকে দাঁড়ি জয়পুর থেকে সাওয়াই হাইফেন মাধোপুরের মধ্যে লাইন ব্রডগেজ হয়ে যাওয়ার ফলে এই ট্রেনটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে দাঁড়ি জয়পুর ও শিয়ালদহের মধ্যে অঙ্কে ১৬৯৭ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে ট্রেনটি ছত্রিশ ঘণ্টা সময় নেবে দাঁড়ি জয়পুর থেকে পরশু রেলমন্ত্রী জাফর শরিফ ট্রেনটি উদ্বোধন করবেন দাঁড়ি

সত্যিই তিনি এইভাবে পড়েছিলেন কি না, তা আমাদের জানা নেই। তবে পাশ্চাত্য প্রকাশনা-মহলের বিশ্বাস, প্রুফ সংশোধনের সময় এইভাবে কপি পড়াটাই আদর্শ হওয়া উচিত। কপি-হোলডার যখন কপি পড়ছেন,



কমা থেকে উদ্ধৃতি-চিহ্ন, সবই তখন তিনি পড়ে শোনাবেন। এমন কী, ব্র্যাকেট ও মোটা-হরফ কোথায় শুরু হয়ে কোথায় শেষ হল, তাও তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে জানিয়ে দেবেন। কিছুই তাঁর বাদ দেওয়া বা প্রুফ-রিডারের অনুমানের উপরে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

যিনি এ-ক্ষেত্রে প্রুফ-রিডার, কপি-হোলডারের উচ্চারিত পাঠ শুনতে-শুনতেই তিনি দেখে যাবেন প্রুফ। যেখানে দেখবেন, উচ্চারিত পাঠের সঙ্গে প্রুফ মিলছে না (যেমন, ধরা যাক, কপি-হোলডার কোনও পাংচুয়েশন-মার্কের কথা বললেন, অথচ দেখা গেল প্রুফে সেটা নেই, কিংবা দেখা গেল প্রুফে কোনও শব্দ কিংবা কপির আরও বড় কোনও অংশ বাদ পড়েছে, অর্থাৎ সেটা আদৌ কম্পোজ করা হয়নি, কিংবা ভুল করে কোনও কথা বা লেখার কোনও অংশ একাধিকবার কম্পোজ করা হয়েছে, কিংবা রয়েছে বানানের গণ্ডগোল), সেখানেই তিনি প্রুফে সেই ত্রুটি শুধরে দেবেন। প্রুফে যখন সংশোধনের কাজ চলছে, কপি-হোলডারকে তখন তাঁর পাঠ বন্ধ রাখতে হবে। সংশোধন শেষ হবার পরে, তিনি আবার কপি পড়তে শুরু করবেন।

প্রুফের উপরে সংশোধনের কাজ কীভাবে চলে, একটু বাদেই তার দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরব। ইতিমধ্যে কয়েকটি চিহ্নের কথা জেনে রাখুন। প্রতিটি চিহ্নের পাশে দেখুন তার অর্থ।

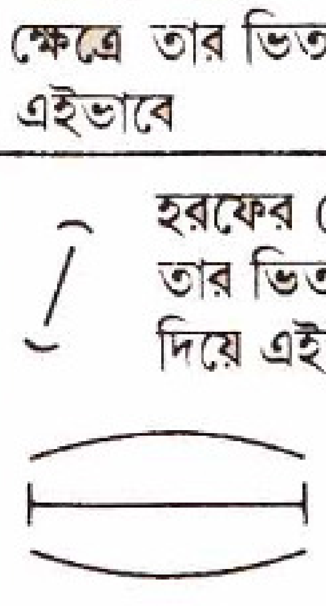


প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন চিহ্ন

সাধারণ

নির্দেশ	লেখার মধ্যে চিহ্ন	মার্জিনে চিহ্ন	মন্তব্য
সংশোধন শেষ		/	প্রতি সংশোধনের পরে দিন
পালটাবেন না	------ যা পালটাবেন না, তার নীচে দিন	(√)	
দাগ হটান	অবাঞ্ছিত দাগ ঘিরে বৃত্ত আঁকুন	×	যথা, ব্রোমাইড কিংবা দিয়াজো প্রুফে দুই লাইনের মধ্যবর্তী জায়গায় ফিল্ম কিংবা কাগজের ধারের দাগ পড়ে
স্পেসিং উঁচু হয়ে থাকায় দাগ পড়েছে, চেপে বসান	দাগ ঘিরে বৃত্ত আঁকুন	⊥	
লেখায় ভুল আছে বলে সন্দেহ হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনুন	যা ভুল বলে মনে হচ্ছে, সেই অংশটুকু ঘিরে বৃত্ত আঁকুন	(?)	

বর্জন, সংযোজন ও পরিবর্তন

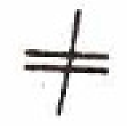
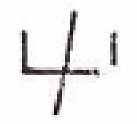
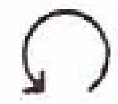
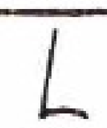
মার্জিনে লেখা ম্যাটার সংযোজিত হবে	ʎ	নূতন ম্যাটারের পরে এই চিহ্ন বসান ʎ	
বরফি-নকশার মধ্যে একটি বর্ণ বসিয়ে অতিরিক্ত ম্যাটার চিহ্নিত করুন	ʎ	ʎ এর পরে ক-চিহ্নিত ম্যাটার বসবে ◇ক	কপির সংশ্লিষ্ট অংশের উপরে ক-চিহ্ন বসান ◇ক
বর্জন করুন	/ হরফের ক্ষেত্রে তার ভিতর দিয়ে এইভাবে কাটুন অথবা ├──┤ এক বা একাধিক শব্দের ক্ষেত্রে তার ভিতর দিয়ে এইভাবে		
বর্জন করে জুড়ে দিন	হরফের ক্ষেত্রে তার ভিতর দিয়ে এইভাবে  একাধিক হরফের ক্ষেত্রে তার ভিতর দিয়ে এইভাবে		

সাধারণ

নির্দেশ	লেখার মধ্যে চিহ্ন	মার্জিনে চিহ্ন	মন্তব্য
হরফ পালটান কিংবা এক বা একাধিক শব্দের অংশবিশেষ পালটান	/ হরফের ক্ষেত্রে তার ভিতর দিয়ে এইভাবে কাটুন কিংবা ├────┤ এক বা একাধিক শব্দের ক্ষেত্রে তার ভিতর দিয়ে এইভাবে		নূতন হরফ অথবা নূতন শব্দ (এক বা একাধিক)
ভুল ফাউন্ট। পালটে ঠিক-ফাউন্টের হরফ বসান	ভুল ফাউন্টের হরফ ঘিরে বৃত্ত আঁকুন	⊗	
ভাঙা হরফ পালটান	ভাঙা হরফটি ঘিরে বৃত্ত আঁকুন		
ইটালিক হরফে কম্পোজ করুন, বা হরফ পালটে ইটালিক করুন	──── যা ইটালিক হরফে কম্পোজ হবে, বা যে-সব হরফ পালটে ইটালিক করতে হবে, তার নীচে এইভাবে লাইন টানুন	⊔⊔	প্রুফের মধ্যে এইভাবে চিহ্নিত করার জায়গা না পেলে সংশ্লিষ্ট অংশ ঘিরে বৃত্ত আঁকুন
বড়-হাতের হরফে কম্পোজ করুন, বা হরফ পালটে বড়-হাতের হরফ করুন	≡ যে-সব হরফ ওইভাবে কম্পোজ বা পালটানো হবে, তার তলায় এইভাবে তিনটি লাইন টানুন	≡	
ছোট-মাপের বড়-হাতের হরফে কম্পোজ করুন, বা হরফ পালটে ছোট-মাপের বড়-হাতের হরফ করুন	═ যে-সব হরফ ওইভাবে কম্পোজ বা পালটানো হবে, তার তলায় এইভাবে দুটি লাইন টানুন	═	
শব্দের প্রথম হরফটি বড়-হাতের হবে ও পরবর্তী হরফগুলি হবে ছোট-মাপের বড়-হাতের	≡ সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রথম হরফের তলায় এইভাবে তিনটি লাইন টানুন ═ পরবর্তী হরফগুলির তলায় এইভাবে দুটি লাইন টানতে হবে	≡═	
মোটা-হরফে কম্পোজ হবে	∼∼∼∼ যে-সব হরফ মোটা হবে, তার তলায় এই চিহ্ন দিন	∼	
মোটা ইটালিক হরফে কম্পোজ হবে	∼∼∼∼ মোটা ইটালিক হরফে যা কম্পোজ হবে, তার তলায় এই চিহ্ন দিন	⊔⊔ ∼	
বড়-হাতের হরফ পালটে ছোট-হাতের হরফ করুন	যা পালটাতে চান, তাকে ঘিরে একটি বৃত্ত আঁকুন	≢	

প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন চিহ্ন

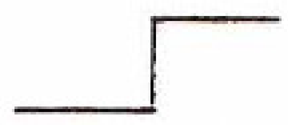
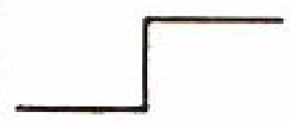
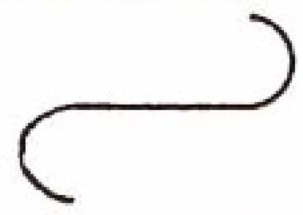
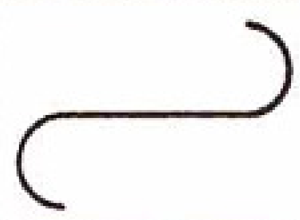
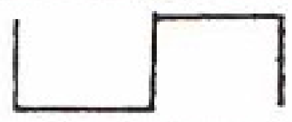
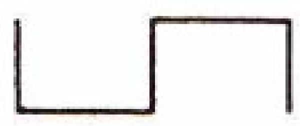
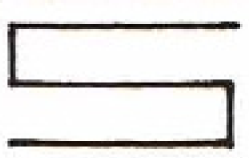
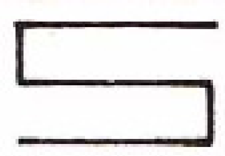
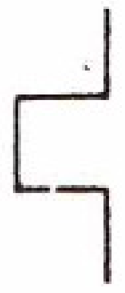
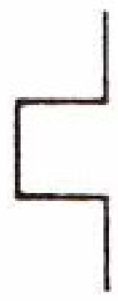
সাধারণ

নির্দেশ	লেখার মধ্যে চিহ্ন	মার্জিনে চিহ্ন	মন্তব্য
ছোট-মাপের বড়-হাতের হরফ পালটে ছোট-হাতের হরফ করুন	যা পালটাতে চান, তাকে ঘিরে একটি বৃত্ত আঁকুন		
ইটালিক পালটে সোজা হরফ করুন	যা পালটাতে চান, তাকে ঘিরে একটি বৃত্ত আঁকুন		
হরফ উল্টে বসান	সংশ্লিষ্ট হরফটিকে ঘিরে একটি বৃত্ত আঁকুন		
হরফটিকে উপরে তুলে দিন	/ সংশ্লিষ্ট হরফটিকে এইভাবে চিহ্নিত করুন অথবা λ যেখানে দরকার	 সংশ্লিষ্ট হরফের তলায় যথা 	
হরফটিকে নীচে নামিয়ে দিন	/ সংশ্লিষ্ট হরফটিকে এইভাবে চিহ্নিত করুন অথবা λ যেখানে দরকার	 সংশ্লিষ্ট হরফের উপরে যথা 	
ফাঁক-ফাঁক-হয়ে-বসা হরফগুলিকে জুড়ে দিন (রোমান হরফে লিগেচার চাইলেও এই একই নির্দেশ প্রযোজ্য)	├──┤ সংশ্লিষ্ট হরফগুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করুন		
জুড়ে না দিয়ে হরফগুলিকে আলাদা করে বসান (লিগেচারের বদলে আলাদা হরফ চাইলেও এই একই নির্দেশ প্রযোজ্য)	├──┤ সংশ্লিষ্ট হরফগুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করুন	হরফগুলিকে আলাদা করে লিখুন	
অন্য চিহ্নের পরিবর্তে ফুল স্টপ বা দশমিক-বিন্দু বসান, বা এমনিতেই ফুল স্টপ/দশমিক-বিন্দু বসান	/ অন্য চিহ্নটিকে এইভাবে কাটুন বা λ যখন কিছু না-কেটে বসবে, তখন এই চিহ্ন দিন	⊙	
অন্য চিহ্ন কেটে (বা না-কেটে) কোলন বসান	/ অন্য চিহ্নটিকে এইভাবে কাটুন বা λ যখন কিছু না-কেটে বসবে, তখন এই চিহ্ন দিন	(:)	
অন্য চিহ্ন কেটে (বা না-কেটে) সেমিকোলন বসান	/ অন্য চিহ্নটিকে এইভাবে কাটুন বা λ যখন কিছু না-কেটে বসবে, তখন এই চিহ্ন দিন	;	

সাধারণ

নির্দেশ	**লেখার মধ্যে চিহ্ন**	**মার্জিনে চিহ্ন**	**মন্তব্য**
এখানে অবলিক হবে	/ কিছু পালটে অবলিক বসাতে হলে বর্জনীয় হরফটিকে এইভাবে কাটুন অথবা, কোনও-কিছু না-পালটে বসাতে হলে এই চিহ্ন দিন ⋏		

বিন্যাস-বিষয়ক নির্দেশ

নূতন অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ) শুরু করুন			
আগের অনুচ্ছেদই চল্‌ছে, এখানে নূতন অনুচ্ছেদ শুরু হবে না			
হরফ (অথবা শব্দ) উল্টোপাল্টা বসেছে, ঠিক করে বসান	 হরফ (অথবা শব্দ) যাতে ঠিক জায়গায় বসে, তার চিহ্ন। প্রয়োজনবোধে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করুন		
উল্টোপাল্টা বসেছে, এমন একাধিক হরফ (অথবা শব্দ) নম্বর অনুযায়ী ঠিক-ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিন	৩ ২ ১ | | |	১ ২ ৩	উল্টোপাল্টা বসেছে, এমন হরফ অথবা শব্দকে প্রুফের মধ্যেই খাড়াই দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে নম্বরের ক্রম অনুযায়ী বসানো হয়
লাইন উল্টোপাল্টা বসেছে, ঠিক করে বসান			
	———— ৩ ———— ২ ———— ১		যে যে লাইন ভুল-জায়গায় বসেছে, মার্জিন থেকে এইভাবে তার উপর দিয়ে রুল টানুন, যাতে নম্বরের ক্রম অনুযায়ী লাইনগুলিকে যথাস্থানে বসানো হয়
মাঝখানে বসান	এই ম্যাটারটিকে মাঝখানে (সেন্টার করে) বসাতে হবে	[ ]	
মাপ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। ভিতরে ঢুকবে			যদি কলমের রেঞ্জ বরাবর না বসিয়ে আরও ভিতরে ঢোকাতে হয়, তা হলে ঠিক কতটা ভিতরে, মার্জিনে তার উল্লেখ করুন

সংশোধনের নমুনা

আগ্রা, ১৯ ডিসেম্বর মরসুমের এইসময়ে প্রতি বছরই হাজারহাজার দেশিবিদেশি দর্শনার্থীর ভীড়ে তাজমহল গমগম করে আজ সেখানে হাতে গোনা কয়েকজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
দুতিনটি বাঙালি পরিবার, বাকি সবই বিদেশি।

★

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর—বাংলারদেশের প্রধানমন্ত্রী কাজি জাফর আহমেদ এখন প্রাক্তন রাজধানী ঢালাতেই রয়েছেন। পুলিস আজ তার খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাস চালায়। ইনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ ইউ এন বি আজ এই খবর দিয়েছে।

★

প্রশ্ন আনন্দবাজারে প্রকাশিত খবর দুখে অপনি কী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন
মন্ত্রী হ্যাঁ। সকালে টেলিফোকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলম।

★

মস্কো, ১৯ ডিসেম্বর—বার্তাসংস্থা টাস জানাচ্ছে, কবে নাগাদ প্রথথি গণভোট হতে পারে, প্রশ্ন করা হলে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ড মিখাইল গোরবাচেভ বলেন, মনে হয় এই শীতেই।

★

The police immediately cordoned of the area Fire Brigade personel faced with an acute shortage of water, installed 13 portable Pumps to bring water from victoria square.
The crisis in the DMK-Janata Dal coalision ministry deepended today with the state minister for social welfare Mr P. Rajavelu and two of his party colleague Mr A Bakthavachalam Deputy speaker and Mr K. Deivanayagam quitting the Janata Dal and joining The Janata Dal (S) Reports PTI.

স

লিখুন	লিখবেন না
স্ট্রিট	স্ট্রীট
স্পৃষ্ট	স্পৃষ্ঠ
স্ফুরণ	স্ফূরণ
স্ফূর্ত	স্ফুর্ত
স্বতঃস্ফূর্ত	স্বতস্ফূর্ত
স্বত্ব (মালিকানা অর্থে। যথা গ্রন্থস্বত্ব)	সত্ব, সত্ত্ব, স্বত্ত্ব
স্বপক্ষে (নিজ পক্ষে অর্থে)	সপক্ষে
স্বাক্ষর (সহি বা দস্তখত অর্থে)	সাক্ষর
স্বামিত্ব	স্বামীত্ব
স্বামীজি	স্বামীজী
স্লো	শ্লো
স্লোগান	শ্লোগান

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

লিখুন	লিখবেন না
সাজছ (সাজিতেছ)	সাজছো
সাজছিল (সাজিতেছিল)	সাজছিলো
সাজত (সাজিত)	সাজতো
সাজব (সাজিব)	সাজবো
সাজল (সাজিল)	সাজলো
সাজাও (সাজাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে সাজাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
সাজাচ্ছ (সাজাইতেছ)	সাজাচ্ছো

সংশোধনের পর

আগ্রা, ১৯ ডিসেম্বর—মরসুমের এই সময়ে প্রতি বছরই হাজার-হাজার দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীর ভিড়ে তাজমহল গমগম করে। আজ সেখানে হাতে গোনা কয়েকজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দু'তিনটি বাঙালি পরিবার, বাকি সবই বিদেশি।

★

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাজি জাফর আহমেদ এখন রাজধানী ঢাকাতেই রয়েছেন। পুলিশ আজ তাঁর খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাশ চালায়। ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউ এন বি) আজ এই খবর দিয়েছে।

★

প্রশ্ন : আনন্দবাজারে প্রকাশিত খবর দেখে আপনি কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ?

মন্ত্রী : হ্যাঁ। সকালে টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলুম।

★

মস্কো, ১৯ ডিসেম্বর—বার্তাসংস্থা টাস জানাচ্ছে, কবে নাগাদ প্রথম গণভোট হতে পারে, প্রশ্ন করা হলে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গোরবাচেভ বলেন, "মনে হয়, এই শীতেই।"

★

The police immediately cordoned off the area. Fire Brigade personnel, faced with an acute shortage of water, installed 13 portable pumps to bring water from Victoria Square.

★

The crisis in the DMK-Janata Dal coalition ministry deepened today with the State Minister for Social Welfare, Mr P. Rajavelu, and two of his party colleagues, Mr A. Bakthavachalam, Deputy Speaker, and Mr K. Deivanaygam quitting the Janata Dal and joining the Janata Dal (S.), reports PTI.

স

সংস্কৃতিমান। অর্থ : 'সংস্কৃতিসম্পন্ন'। কাগজে মাঝে-মাঝে **'সংস্কৃতিবান'** বানান বার হয়। ওটা ভুল বানান। কোথায় 'বান' ও 'বতী' হবে, এবং কোথায় 'মান' ও 'মতী', তার একটা নিয়ম আছে। মোটামুটিভাবে জেনে রাখুন, যে-সব শব্দ 'অ' কিংবা 'আ' স্বরে শেষ হচ্ছে, তার সঙ্গে 'বান' অথবা 'বতী' বসবে (যথা, **'ধনবান'**, **'রূপবান'** **'দয়াবতী'**, **'বিদ্যাবতী'**)। অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে 'মান' অথবা 'মতী' (যথা **'কীর্তিমান'**, **'রুচিমান'**, **'বুদ্ধিমতী'**, **'শ্রীমতী'**)।

সখ্য। অর্থ : 'বন্ধুত্ব, মৈত্রী'। বিশেষ্যপদ। সুতরাং একে আর বিশেষ্যপদ বানাবার জন্য 'তা' যোগ করবার দরকার নেই। কাগজে মাঝে-মাঝে **'সখ্যতা'** বার হয়। ভুল। (তুলনীয় : 'কৃচ্ছ্র' শব্দ। এটিও বিশেষ্যপদ। সুতরাং 'কৃচ্ছ্রতা' লিখবেন না। লিখলে ভুল হবে।)

সঙ্গিন। **'সঙিণ'**, **'সঙিন'**, **'সঙ্গীণ'**, **'সঙ্গীন'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না।

সঙ্গে। **'সাথে'** লিখবেন না। পদ্যেও আজকাল বড় কাউকে 'সাথে' লিখতে দেখা যায় না, গদ্যে তো একেবারেই 'অচল'।

সচ্ছল। অর্থ : 'সঙ্গতিপন্ন'। **'স্বচ্ছল'** লিখবেন না।

সতিন। অর্থ : 'সপত্নী'। **'সতীন'** লিখবেন না।

সতেরো। **'সতের'** লিখবেন না।

সত্তা। অর্থ : 'অস্তিত্ব ; বিদ্যমান অবস্থা'। এই অর্থে **'সত্বা'**, **'সত্ত্বা'**, **'স্বত্বা'**, **'স্বত্ত্বা'** ইত্যাদি বানান লিখবেন না।

সত্ত্ব। ত্রিগুণের এটি প্রথম। অন্য দুটি হল 'রজঃ' ও 'তমঃ'। 'সত্ব', 'স্বত্ব', 'স্বত্ত্ব' ইত্যাদি বানান লিখবেন না।

সত্ত্বেও। **'সত্বেও'** লিখবেন না। কিছুদিন আগেই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই ভুল বানান বেরিয়েছিল। তাও মোটা হরফের হেডলাইনে।

সত্বর। অর্থ : 'তাড়াতাড়ি, দ্রুত, শীঘ্র'। **'সত্ত্বর'** লিখবেন না।

সত্যজিৎ। **'সত্যজিত'** লিখবেন না। (তুলনীয় : 'ইন্দ্রজিৎ', 'বিশ্বজিৎ', 'রণজিৎ'।

সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী। **'সন্যাস'**, **'সন্যাসী'** লিখবেন না।

সপক্ষে। **অর্থ : 'অনুকূলে, সমর্থনে'। এই অর্থে 'স্বপক্ষে'** লিখবেন না। 'স্বপক্ষে' বলতে 'নিজ পক্ষে' বোঝায়।

সবজি। **'সবজী'**, **'সব্জী'** লিখবেন না।

সমীচীন। অর্থ : 'উচিত', 'সঙ্গত'। **'সমিচীন'**, **'সমীচিন'** লিখবেন না।

সম্পাদক। মহিলাদের ক্ষেত্রেও **'সম্পাদিকা'** লিখবেন না, আনন্দবাজার পত্রিকা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে 'সম্পাদক' লেখার পক্ষপাতী।

স

সম্ভূত। অর্থ : 'উৎপন্ন', 'জাত'। **'সম্ভুত'** লিখবেন না।

সম্মান। **'সন্মান'** লিখবেন না।

সম্মাননীয়। ভুল করে অনেকেই লেখেন **'সম্মানীয়'**। কাগজে তা ছাপা হতেও দেখি। এই অশুদ্ধ বানানটি পরিহার করুন।

সম্রাজ্ঞী। **'সাম্রাজ্ঞী'** লিখবেন না।

সরকারি। **'সরকারী'** লিখবেন না।

সরণি। 'সরণী'ও শুদ্ধ বানান। কিন্তু ই-কারেই যখন কাজ চলছে, তখন ঈ-কার বর্জনীয়।

সর্বজনীন। বারোয়ারি পুজোর শালুতে **'সার্বজনীন'** লেখা হোক, আমরা **'সর্বজনীন'** লিখব।

সর্বনাম। বিশেষ্যর পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ। দৃষ্টান্ত : 'আমি', 'আমার', 'আমাকে', 'সে', 'তার', 'তাকে' ইত্যাদি। সর্বনামে-ক্রিয়াপদে সংগতি থাকা চাই। দৃষ্টান্ত : 'সে করেছে', কিন্তু 'তিনি করেছেন'। সম্মানসূচক কিছু সর্বনামের কয়েকটি রূপে চন্দ্রবিন্দু লাগাবার দরকার হয়। দৃষ্টান্ত : 'তাঁর', 'তাঁদের', 'তাঁকে', 'তাঁরা'। এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

সংবাদ অথবা প্রতিবেদনের সূচনায় সাধারণত সর্বনাম ব্যবহার করবেন না। ('খবর, সূচনা' দেখুন।)

সহারা, সাহারা। আফ্রিকার মরুভূমির নামের বানান **'সাহারা'**। কিন্তু ভারতীয় বিমান-কোম্পানির নাম লিখবেন **'সহারা'**। এই **'সহারা'** নাম একটি হিন্দি দৈনিক পত্রিকারও।

সার খেতাব। হয় খেতাবধারীদের পুরো নাম লিখুন, অথবা সার-এর সঙ্গে লিখুন শুধুই প্রথম নাম। যথা, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার উইনস্টন চার্চিল, সার গারফিল্ড সোবার্স, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার জগদীশচন্দ্র বসু। অথবা সার আশুতোষ, সার উইনস্টন, সার গারফিল্ড, সার গুরুদাস, সার জগদীশচন্দ্র। মনে রাখুন : সার মুখোপাধ্যায়, সার চার্চিল, সার সোবার্স, সার বন্দ্যোপাধ্যায় বা সার বসু লেখার নিয়ম নেই।

লর্ডদের বেলায় অন্য নিয়ম। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে সংক্ষেপে লর্ড সিংহ লিখতেই পারেন। তাতে নিয়মভঙ্গ হবে না।

সিং, সিংহ, সিনহা, সিমহা। আমাদের কাছে সবাই **'সিংহ'**। ব্যতিক্রম একমাত্র প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা। ('যশোবন্ত' শব্দেরও তিনি এই বানানই লেখেন।) সিংহরা ক্ষত্রিয়, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কায়স্থ। নিজের পদবির বানান লিখতে গিয়ে সম্ভবত সেইজন্যই তিনি নাগরী লিপিতেও **'সিনহা'** লেখেন।

সেখানকার। কদাচ 'সেখানের' লিখবেন না। ('এখানকার', 'ওখানকার' ও 'যেখানকার' দ্রষ্টব্য।)

স

লিখুন	লিখবেন না
সর্বাঙ্গীণ	সর্বাঙ্গীন
সহকারিগণ	সহকারীগণ
সহকারিবৃন্দ	সহকারীবৃন্দ
সহকারী	সহকারি
সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন)	স্বাক্ষর
সাক্ষিগোপাল	সাক্ষীগোপাল
সাঙ্গোপাঙ্গ	সাঙ্গপাঙ্গ, সাঙ্গপাঙ্গো, সাঙ্গোপাঙ্গো
সাচ্ছল্য	স্বাচ্ছল্য
সান্ত্বনা	সান্তনা
সান্ত্রি	সান্ত্রী
সাবেক	সাবেকি, সাবেকী
সারণি (ছোট নদী, তালিকা, নির্ঘণ্ট)	সারণী
সাঁড়াশি	সাঁড়াশী
সিংহলি	সিংহলী
সিন্ধি	সিন্ধী
সিসা	সীসা
সুইডিশ	সুইডিস
সুচ	সূচ
সুজনি	সুজনী
সুধাংশু	শুধাংশু
সুন্নি	সুন্নী
সুপ্রিম	সুপ্রীম
সুরজিৎ	সুরজিত
সুরভি	সুরভী
সূচি	সুচি, সূচী
সেকশন	সেকসন
সেমিকোলন ('বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন)	—
সেশন	সেসন
সৌম্যেন্দ্র	সৌমেন্দ্র

স

লিখুন	লিখবেন না
সাজাচ্ছিল (সাজাইতেছিল)	সাজাচ্ছিলো
সাজাত (সাজাইত)	সাজাতো
সাজান (সাজাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে সাজাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
সাজানো (সাজাইবার কাজ)	সাজান
সাজাব (সাজাইব)	সাজাবো
সাজাল (সাজাইল)	সাজালো
সাজিয়েছিল (সাজাইয়াছিল)	সাজিয়েছিলো
সাজিয়ো (সাজাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	সাজিও
সাজো (সজ্জিত হও, ক্ষেত্র বিশেষে সজ্জিত হইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	সাজ
সেজে ছিল (সজ্জিত অবস্থায় ছিল)	সেজেছিল
সেজেছিল (সাজিয়াছিল)	সেজেছিলো
সেজো (সজ্জিত হইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	সেজ



হ

হইচই, হইহই। 'হৈচৈ', হৈহৈ' লিখবেন না।

হত। 'নিহত' ও 'হইত' দুই অর্থেই এই বানান লিখুন। দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহারের সময় 'হতো' 'হোত' 'হোতো' ইত্যাদি বানান লিখবেন না।

হয়রান, হয়রানি। **'হয়রাণ', 'হয়রাণি'** লিখবেন না।

হরতুকি, হর্তুকি। **'হরতুকী', 'হর্তুকী'** লিখবেন না।

হরফ। শব্দটির দ্বারা শুধুই বর্ণ (যথা A B C, a b c, ক খ গ ইত্যাদি) বোঝায় না। যেমন বর্ণ, তেমন আ-কার ই-কার ইত্যাদি, য-ফলা র-ফলা ইত্যাদি, এবং বিভিন্ন বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য সংকেতচিহ্ন, সবই হরফ-পর্যায়ভুক্ত।

হরফের মাপ। গজ ফুট কি ইঞ্চির (ইদানীং মিটার সেন্টিমিটার কি মিলিমিটারের) হিসাব দিয়ে যেমন হরেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের কথা বোঝানো হয়, পয়েন্ট ও পাইকার হিসাব দিয়ে তেমনই বোঝানো হয় হরফের মাপ। ('পয়েন্ট ও পাইকা' দেখুন।)

হরফের বৈচিত্র্য। হরফ নানা বিচিত্র ধাঁচ ও ধরনের হতে পারে। তবে মূল শ্রেণী দুটি : টেক্সট টাইপ ও ডিসপ্লে টাইপ। গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদির পাঠ্যাংশ বা বডি-ম্যাটার ছাপা হয় টেক্সট টাইপে। এটা সাধারণ হরফ, যে-হরফে আমরা খবর, প্রতিবেদন, নিবন্ধ ইত্যাদি ছাপা হতে দেখি। ডিসপ্লে টাইপ হল অলঙ্কৃত হরফ। পত্রপত্রিকার হেডলাইনে কি নানা ধরনের বিজ্ঞাপনে অলঙ্কৃত হরফ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ফোটোটাইপসেটিং পদ্ধতি চালু হবার পর বাংলা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে অলঙ্কৃত হরফ বিদায় নিয়েছিল বললেই হয়। প্রায় সবই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিরলঙ্কার সাধারণ টাইপ। যা কিছু পার্থক্য, তা শুধু আকারের। কিন্তু বৈচিত্র্যের দাবি মেটাতে বাংলা কাগজেও যে ডিসপ্লে টাইপ আবার দেখা দেবে, তাতে সন্দেহ নেই।

ইউনিট। এক-একটি হরফের জন্য প্রস্থে কতটা জায়গা দরকার, তার হিসাব হয় ইউনিট দিয়ে। সব হরফ সমান মাপের নয়। কোনও হরফ বেশি ইউনিট জায়গা নেয়, কোনওটা কম। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, বড় হাতের M যে-ক্ষেত্রে প্রস্থে হয়তো ১৮ ইউনিট জায়গা নেবে, ছোট হাতের a সে-ক্ষেত্রে হয়তো ১০ ইউনিটের বেশি জায়গা নেবে না। ছোট হাতের t যদি নেয় ৬ ইউনিট, তো একটি ফুলস্টপ হয়তো ৩ ইউনিট জায়গা নেবে। হরফের মাপের সঙ্গে ইউনিটের এই যে সম্পর্ক, এটা বোঝার জন্যই জানা দরকার, এম (em) বলতে কী বোঝায়। ('এম' দেখুন।)

পয়েন্ট ও পাইকা। হরফের মাপের প্রসঙ্গে পয়েন্ট ও পাইকার কথা মনে রাখা দরকার। পয়েন্ট হচ্ছে পাইকার ১২ ভাগের ১ ভাগ, আর পাইকা

হচ্ছে ইঞ্চির ৬ ভাগের ১ ভাগ। আনুপাতিক হিসাবটা তা হলে এই রকম দাঁড়াচ্ছে : ১ ইঞ্চি = ৬ পাইকা = ৭২ পয়েন্ট। তবে হরফের সাইজ বা আকারের কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন ইদানীং সেটা ইঞ্চি কিংবা পাইকা নয়, সাধারণত পয়েন্ট দিয়েই বোঝানো হয়। যথা ১০ পয়েন্ট, ১২ পয়েন্ট বা ১৪ পয়েন্ট। হরফ এর চেয়ে বেশি পয়েন্টেরও হতে পারে, কম পয়েন্টেরও হতে পারে।

পয়েন্ট সাইজ। হরফের উচ্চতম অংশ থেকে নিম্নতম অংশ পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য, তাকেই বলা হয় হরফের পয়েন্ট সাইজ বা বডি সাইজ। এর উপরে-নীচে সামান্য একটু জায়গা ছাড়তে হয়।

এম (em)। 'এম' হচ্ছে হরফের দৈর্ঘ্য×প্রস্থ। অর্থাৎ বর্গ বা স্কোয়ার। আমরা যখন '৩৬ পয়েন্ট এম' বলছি, তখন '৩৬ পয়েন্ট বর্গ বা স্কোয়ার' বোঝাচ্ছি ; যখন '৬৪ পয়েন্ট এম' বলছি, তখন বোঝাচ্ছি '৬৪ পয়েন্ট বর্গ বা স্কোয়ার'। এই 'এম'কে আবার লম্বালম্বিভাবে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ; সে-ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাগকে বলা হবে একটি ইউনিট।

ফোটোটাইপসেটিং ব্যবস্থায় এম-পিছু ইউনিটের সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। কেউ ইউনিটের সংখ্যা বেশি রাখেন, কেউ কম। তবে ১৮ ইউনিটের এম-ই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

হরীতকী। **'হরিতকি', 'হরিতকী'** লিখবেন না। মূল শব্দে দুটিই ঈ-কার, মনে রাখুন। (তুলনীয় : 'গরীয়সী', 'পটীয়সী', 'পাপীয়সী', 'মহীয়সী', 'সমীচীন'।)

হল। 'লাঙল' ও 'হইল' দুই অর্থেই এই বানান লিখুন। দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহারের সময় 'হলো' 'হোলো' ইত্যাদি বানান লিখবেন না।

হলদি। **'হলদী'** লিখবেন না।

হল্যান্ড। রাষ্ট্রের নাম লিখবার সময় 'হল্যান্ড' না লিখে **'নেদারল্যান্ডস'** লিখুন।

হাইফেন। 'বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য' দেখুন।

হাঙর। **'হাঙড়', 'হাঙ্গড়'** বা **'হাঙ্গর'** লিখবেন না।

হাড়ি। হিন্দু সমাজের বর্ণবিশেষ। 'হাড়ী', 'হাঁড়ি' কিংবা **'হাঁড়ী'** লিখবেন না।

হাঁড়ি। পাত্র বিশেষ। এই অর্থে 'চন্দ্রবিন্দু' লাগাতে হবে। তখন **'হাড়ি'** লিখবেন না।



হ

লিখুন	লিখবেন না
হাবসি	হাবসী
হাম্বির	হাম্বীর
হাসপাতাল	হাঁসপাতাল
হাঁসুলি	হাসুলি
হিন্দি	হিন্দী
হিরণ্ময়	হিরন্ময়
হিস্পানি (স্পেনদেশীয়)	হিস্পানী
হুড়কো	হুঁড়কো
হুঁকো	হুকো
হৃৎপিণ্ড	হৃদপিণ্ড
হৃৎস্পন্দন	হৃদস্পন্দন
হৃদ্‌রোগ	হৃৎরোগ
হেঁশেল	হেশেল, হেসেল, হেঁসেল
হোমরাচোমরা	হোমড়াচোমড়া
হোলি	হোলী

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের দৃষ্টান্ত

হাসছ (হাসিতেছ)	হাসছো
হাসছিল (হাসিতেছিল)	হাসছিলো
হাসত (হাসিত)	হাসতো
হাসব (হাসিব)	হাসবো
হাসল (হাসিল)	হাসলো
হাসাও (হাসাইয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে হাসাইয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/অনুরোধ)	—
হাসাচ্ছ (হাসাইতেছ)	হাসাচ্ছো

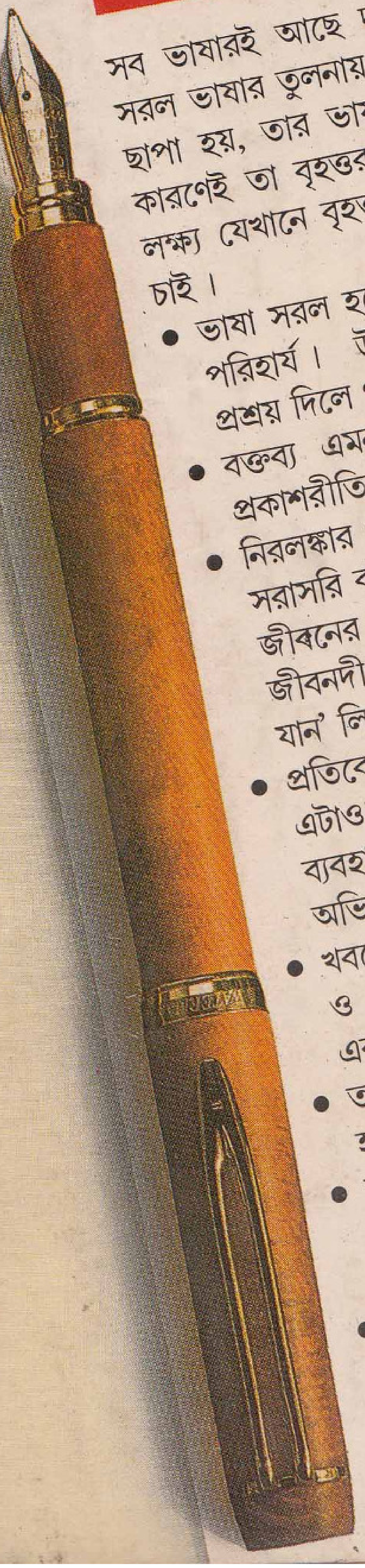
হ

লিখুন	লিখবেন না
হাসাচ্ছিল (হাসাইতেছিল)	হাসাচ্ছিলো
হাসাত (হাসাইত)	হাসাতো
হাসান (হাসাইয়া থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে হাসাইয়াছিলেন। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	—
হাসানো (হাসাইবার কাজ)	হাসান
হাসাব (হাসাইব)	হাসাবো
হাসাল (হাসাইল)	হাসালো
হাসিয়েছিল (হাসাইয়াছিল)	হাসিয়েছিলো
হাসিয়ো (হাসাইয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	হাসিও
হাসো (হাসিয়া থাকো, ক্ষেত্র বিশেষে হাসিয়াছিলে। বা বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	হাস
হেসেছিল (হাসিয়াছিল)	হেসেছিলো
হেসো (হাস্য করিয়ো। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা/ অনুরোধ)	হেস



নির্দেশিকা

যা মনে রাখা দরকার



সব ভাষারই আছে দুটি স্তর। একটি সরল, অন্যটি কঠিন। সরল ভাষার তুলনায় কঠিন ভাষার নাগাল অনেক সীমাবদ্ধ। যা ছাপা হয়, তার ভাষা যদি হয় কঠিন স্তরের, এই সীমাবদ্ধতার কারণেই তা বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছতে পারে না। লক্ষ্য যেখানে বৃহত্তর পাঠকসমাজ, ভাষা সেখানে সরল হওয়াই চাই।

- ভাষা সরল হবে, কিন্তু তরল হবে না। উচ্ছ্বাস ও কাব্যিকতা পরিহার্য। উচ্ছ্বাস ভাষাকে আবিল করে। কাব্যিকতাকে প্রশ্রয় দিলে গদ্যভাষা এলিয়ে যায়।
- বক্তব্য এমনভাবে প্রকাশ করুন, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশরীতির সঙ্গে যাতে তার কোনও বিরোধ না ঘটে।
- নিরলঙ্কার গদ্যই সংবাদপত্রের পক্ষে আদর্শ গদ্য। যা বলবার, সরাসরি বলুন, এবং এমন ভাষায় বলুন, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। মনে রাখুন, 'প্রত্যুষ পাঁচ ঘটিকায় তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়' না লিখে 'ভোর পাঁচটায় তিনি মারা যান' লিখলে মৃতের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা সূচিত হয় না।
- প্রতিবেদন বা রিপোর্ট মন্তব্যবর্জিত হবে। প্রতিবেদকের কাছে এটাও প্রত্যাশিত যে, পারতপক্ষে এমন কোনও শব্দ তিনি ব্যবহার করবেন না, তাঁর রচনাকে যার ফলে পক্ষপাতদুষ্ট বা অভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়।
- খবরের মুখপাত বা সূচনাংশ (ইনট্রো) হবে সহজ, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত। মনে রাখুন, এটির দ্বারা আকৃষ্ট হলে তবেই একজন পাঠক গোটা খবরটি পড়তে উৎসাহী হবেন।
- তর্জমার ভাষা পুষ্পিত হবে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হবে।
- কঠিন শব্দ পরিহার করুন। শার্দূলের গর্জনের চেয়ে বাঘের হালুম কিছু কম ভয়ঙ্কর নয়। কঠিন পরিভাষা ব্যবহার করবেন না। জার্গন পাঠককে দূরে ঠেলে দেয়।
- বাক্যগঠনে কর্তৃবাচ্যকে প্রাধান্য দিন।

কী লিখবেন • কেন লিখবেন

9 788172 150556